পুরবার্তা

নবপর্যায়, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২০২১

শিলিগুড়ি পুরনিগম

প্রকাশক ☐ শিলিগুড়ি পুরনিগম ২০২১

প্রচ্ছদ ☐ শুভেন্দু চক্রবর্তী
শিলিগুড়ি পুরনিগমের আলোকচিত্র ☐ মৃন্ময় নায়েক
বর্ণ সংস্থাপন ও বিন্যাস ☐ মাম কম্পুটার, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
☐ চলভাষ ঃ ৯৮৩২০৯৬৩৬১
মুদ্রক ☐ বিবাহেসু প্রকাশন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
চলভাষ ঃ ৯৮৩২৩৯৬৩৬১

বিগত দিনে আমরা যাঁদের হারিয়েছি

শিলিগুড়ি পুরনিগমের শেষ নির্বাচিত বোর্ডের সদস্য

কৃষ্ণচন্দ্র পাল

অরবিন্দ ঘোষ (অমু)

করোনা অতিমারিতে প্রয়াত পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর

শুভ্রা সরকার

ড. পার্থ চ্যাটার্জী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ,
তথ্য প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বিভাগ এবং
পরিষদীয় বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Dr. Partha Chatterjee
Minister-in-Charge
Departments of Industry, Commerce and Enterprises,
Information Technology & Electronics and
Parliamentary Affairs
Government of West Bengal

নং- এফ-ওয়ান/আই.সি.ই./এম.আই.সি./৬/২১-২২

শুভেচ্ছাবার্তা

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মুখপত্র 'পুরবার্তা'র বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যা আগামী ১৫ই আগষ্ট, ২০২১ নবরূপে প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। আমি পত্রিকাটির সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি পাশাপাশি পত্রিকাটি অচিরেই শহর শিলিগুড়ির দর্পন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশা রাখি।

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ,
তথ্য প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বিভাগ এবং পরিষদীয় বিভাগ

শ্রী গৌতম দেব
চেয়ারপার্সন, প্রশাসক মন্ডলী
শিলিগুড়ি পুরনিগম
বাঘাযতীন রোড, পোঃ - শিলিগুড়ি
দার্জিলিং - ৭৩৪০০১

ফিরহাদ হাকিম
ফিরহাদ হাকিম
فرہاد حکیم
FIRHAD HAKIM

MINISTER-IN-CHARGE
TRANSPORT DEPARTMENT &
HOUSING DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

নং- ০৫ /এম.আই.সি/ ২০২১(এম)

তাং : ২৯/ ০৭/ ২০২১

শুভেচ্ছা

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০২১ স্বাধীনতা দিবসের দিনে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন শ্রী গৌতম দেব মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ব্যাক্তিগত উদ্যোগে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকা 'পুরবার্তা' পুনরায় নিয়মিত প্রকাশের বিশেষ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে । পুরবার্তা কেবল একটি পত্রিকা নয় এটি শিলিগুড়ির মানুষজন, সমাজ, উন্নয়নের মুখ হিসাবেই নবরূপে উদ্ভাষিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি আশা রাখি পুরবার্তা শিলিগুড়ি শহর সহ উত্তরবঙ্গবাসীর জন্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্ষব্যাপী গৃহীত নানান জনকল্যানমুখী উদ্যোগ ও বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠান, সাহিত্য- সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুণীজনের লেখায় নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

আমি শিলিগুড়ি পুরনিগমের সকলকে এই ধরনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

(ফিরহাদ হাকিম)

প্রতি
শ্রী প্রণব কুমার ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক, সম্পাদকমন্ডলী
পুরবার্তা
শিলিগুড়ি পুরনিগম

Writers' Buildings, Kolkata - 700001
Phone : (033) 2214 - 5497, Fax : (033) 2214 - 3853, E-mail : mictptwb@gmail.com
Paribahan Bhawan, 12, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001
New Sectetariat Buildings, Block - C, 3rd Floor, 1, K. S. Roy Road, Kolkata - 700001

মলয় ঘটক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পূর্ত দপ্তর
এবং
আইন ও বিচার বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Moloy Ghatak
Minister-in-Charge
Public Works Department
and
Departments of Law & Judicial
Govt. of West Bengal

শুভেচ্ছাবার্তা

তাং ০৪.০৮.২০২১

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মুখপত্র 'পুরবার্তা' পত্রিকাটির আগামী ১৫ ই আগস্ট ২০২১ শে বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে নব কলেবরে প্রকাশিত হবার খবর জেনে আমি আনন্দিত

এই পত্রিকার সকল সহযগী ও সদস্যকে আমার হার্দিক ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,

(মলয় ঘটক)

শ্রী গৌতম দেব
চেয়ারপার্সন
প্রশাসকমন্ডলী
শিলিগুড়ি পুরনিগম
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০১

P.W.D. : Nabanna, 8th Floor, (Room No. - 801), 325 Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah - 711 102, Telephone No. : (033) 2214-3161 / Fax : (033) 2214-4788
Law : Nabanna, 3rd Floor, (Room No. - 308), 325 Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah - 711 102, Telephone No. : (033) 2253-5176 / Fax : (033) 2214-3010
& Judicial : Writers' Building, 1st Floor, Kolkata - 700 001, Telephone : (033) 2254-4490, 2214-5802, Fax : (033) 2214-4036
E-mail : micpwd@gmail.com • ghatak.moloy@gmail.com

অরূপ বিশ্বাস
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
বিদ্যুৎ দপ্তর, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবন
৩/সি, ব্লক - এল এ, ৭ম তল, সেক্টর - ৩
বিধাননগর, কোলকাতা - ৭০০ ১০৬
দূরভাষ ২৩৩৫ ০৭৬৮ ২৩৩৯ ৩২৬৯
দূরবার্তা ২৩৩৫ ৭৩৩১

নব মহাকরণ
১, কিরণ শঙ্কর রায় রোড
'এ' - ব্লক, সপ্তম তল,
কলকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ ২২৬২ ৪২৪২
দূরবার্তা ২২১৪ ৭৪৬২

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর ছুঁয়ে ফেলার পরেও আজ অনেকের মতো আমার কাছেও বড় প্রশ্ন, সত্যিকারের 'স্বাধীনতা' কী আমরা পেয়েছি? দেশের প্রতিটি মানুষ যেমন আজও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পায়নি একথা যেমন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন তেমনই মতামত প্রকাশের সার্বিক স্বাধীনতা কী ভাগ্যে জুটেছে? যদি তাই সঠিক না হয়, তবে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা কর্ণাটকে আজও কেন বাস্তব ঘটনা তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকরা খুন হন? কেন পেগাসাস ? কেন বিরোধী নেতানেত্রী, বিচারক সহ অন্যান্যদের ফোনে আড়িপাতা হয় ? কেন অসহিষ্ণুতার রোষে গেরুয়া সন্ত্রাসের শিকার হতে হয় বাঙালির গর্ব নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন থেকে গীতিকার জাভেদ আখতারকে। আমরা কে কি খাবার খাব, কোন পোশাক পরবো, কোনটা পরবো না তা কী রাষ্ট্রশক্তি ঠিক করে দিতে পারে? দেশবাসীর কী সত্যিই নিজের কোনও ইচ্ছাশক্তি না মনোবাসনা পূর্ণ করার নিজস্ব অধিকার নেই? সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ধারাগুলি কী বাস্তবে সোনার পাথর বাটি? তাই যদি না হয় তবে কেন দেশের মৌলিক ভাবনার আধার শিক্ষাঙ্গনে 'লেজহীন হনু'দের দাপট বাড়ছে? কেন উত্তরপ্রদেশের সিলেবাস থেকে জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিয়ে রামদেব আর ধর্মান্ধতার অন্যতম সেনাপতি যোগীর 'কীর্তিকলাপ' পাঠ্য বইয়ে ঢুকে পড়ছে? বাস্তব তথ্য হল, গেরুয়ারাজের দাপটে স্বাধীন দেশের নাগরিকরা ধর্মান্ধদের চাপে ফের 'শৃঙ্খলিত' হয়ে পড়ছে। দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় 'দেশে সুপার ইমার্জেন্সি' জারি করে সবার মুখ বন্ধ করে ভারতের মেধাশক্তিকে বুলডোজ করে কার্যত সবাইকে 'পরাধীন' করে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরের কাশ্মীরের ফারুখ আবদুল্লা থেকে শুরু করে করে দক্ষিণে তামিলনাড়ুর স্তালিন, বিহারের তেজস্বী, উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদবরা একবাক্যে স্বীকার করছেন, গোটা দেশের মুক্ত আকাশের নিচে শ্বাস নেওয়ার একটাই ঠিকানা–পশ্চিমবঙ্গ। কারণ, এখানে দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে টানা দশ বছরের বেশি সময় ধরে মা-মাটি-মানুষের সরকার চলছে। বাংলার মানুষ যে বামরাজত্বে টানা ৩৪ বছর কার্যত পরাধীন ছিলেন তা প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন খাটি কমিউনিষ্টরা। কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মাটির গন্ধ নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে অবশেষে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সালে বাংলায় প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছেন রাজ্যবাসী। এখন ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা যেমন কাজ পায় তেমনই ব্রেন ড্রেন বন্ধ করে ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় মেধার বিকাশ ঘটায়। দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে করোনাকালে রাজ্যের সমস্ত মানুষকেই বিনামূল্যে চাল-গম দেওয়া হয়। ভারতে প্রথম, একসঙ্গে বাংলার আট কোটি মানুষকেই পাঁচ লাখ টাকার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তুলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা দিলে তিনি যে কথা রাখেন তার প্রমাণ, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার ১০০দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই নিজের নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিটি প্রতিশ্রুতি কার্যকর করেছেন বাংলার অগ্নিকন্যা। কৃষকদের ভাতা দ্বিগুন, লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড চালু করে 'দিল্লিতেও খেলা হবে' স্লোগান তুলে ভারতবাসীর মন জিতেছেন জননেত্রী।

অরূপ বিশ্বাস

যোগাযোগ ঃ ৬/৪৫, বিজয়গড়, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২ চলভাষ ঃ ৯৮৩০০ ৫১৪৮৪, বৈদ্যুতিন বার্তা ঃ biswas.aroop@gmail.com

Shri Pulak Roy
শ্রী পুলক রায়

MINISTER-IN-CHARGE
Department of Public Health Engineering
Government of West Bengal
New Secretariat Building, 7th Floor,
1, K. S. Roy Road, Kolkata-700 001,
Tel. ☎ (033) 2248-2130, Fax- (033) 2248-9843

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবমহাকরণ, ৭ম তল
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ ঃ ☎ (০৩৩) ২২৪৮-২১৩০
দূরবার্তা ঃ (০৩৩) ২২৪৮-৯৮৪৩

D.O. No.:142/MIC/PHE/21 *22.07.2021*

শুভেচ্ছা বার্তা

শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে আগামী ১৫ই আগষ্ট, ২০২১ তারিখে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মুখপত্র 'পুরবার্তা'র বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যা দীর্ঘ সময় পর নব কলেবরে প্রকাশ হবে এবং এই পত্রিকার নতুন যাত্রা শুরু হবে জেনে খুশি হয়েছি।

এতদুপলক্ষে আমি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন, সদস্য এবং এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর আহ্বায়ক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী ও অন্যান্য সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রকাশনের সাফল্য কামনা করি।

পুলক রায়
শ্রী পুলক রায়
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী গৌতম দেব
চেয়ারপার্সন
প্রশাসকমণ্ডলী
শিলিগুড়ি পুরনিগম

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য
রাষ্ট্রমন্ত্রী
নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর,
ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু, ত্রান ও পুনর্বাসন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Chandrima Bhattacharya
Minister-of-State
Urban Development & Municipal Affairs
Department (Independent Charge),
Health & Family Welfare Department,
Department of L & L R and R R & R
Government of West Bengal

শুভেচ্ছা বার্তা

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্তমান প্রশাসকমন্ডলীর উদ্যোগে ঐ পুরনিগমের মুখপত্র **'পুরবার্তা'** দীর্ঘ সময় পর নব কলেবরে প্রকাশ হতে চলেছে এবং আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০২১ বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই পত্রিকার নতুন যাত্রা শুরু হবে । আমি আশা রাখি শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান হিসাবে এই পত্রিকা শিলিগুড়িবাসীর কাছে এক দর্পন হিসাবে কাজ করবে ।

আমি শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই মহতী উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে পুরনিগমের সকল প্রশাসকমন্ডলী এবং সদস্যদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই ।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য
(চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য)

শ্রী গৌতম দেব
চেয়ারপার্সন, প্রশাসকমন্ডলী
শিলিগুড়ি পুরনিগম ।

No. 29/MOS(IC)/UDMA/21 Dated - 28.07.2021.

UD&MA : Nagarayan Bhavan, DF-8, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata - 700 064.
Tel. : (033) 2358-3500 Email - mos.ic.udma@gmail.com
H & FW - Swasthya Bhavan, GN-29, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Tel - (033) 2333-0229 / 2357-3629 / 7929 (F)
L & LR and RR & R - Nabanna, 6th Floor (Room No. 605), 325, Sarat Chatterjee Road, Howrah. Tel - (033) 2253-5491 / 5492, 2214-0041 (F)

Dr. Subires Bhattacharyya
M.Sc, Ph.D.
Vice-Chancellor
University of North Benal

समानो मन्त्रः समितिः समानी

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Accredited by NAAC with Grade A
Website : http://www.nbu.ac.in
E.mail : nbuvc@nbu.ac.in
subires.bhattacharyya@gmail.com

Raja Rammohunpur, P.O. North Bengal University, Dist. Darjeeling, West Bengal, India, PIN - 734013
Phone : (0353) 2776366 (O), (0353) 2776308 (R), Fax : (0353) 2699001

তারিখ: ২৭।০৭।২০২১

শুভেচ্ছাবার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অবগত হলাম যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে আগামী ১৫ই আগষ্ট, ২০২১ তারিখে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মুখপত্র **'পুরবার্তা'** নতুন রূপে দীর্ঘ সময় পর পুনরায় প্রকাশিত হতে চলেছে। সারা বিশ্বে মহামারী তথা অতিমারীর দরুণ সামাজিক সংকটের পরিস্থিতির মধ্যেও শিলিগুড়ির পুরনিগমের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আশাকরি, জনমানসের সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে এবং সমাজজীবনে সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাগরিকদের মধ্যে জ্ঞান-বিকাশের সহায়তার জন্য ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই মুখপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে, আমি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, মুখপত্রের প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিদের এবং পুরনিগমের সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি এই 'পুরবার্তা'র সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সুবীরেশ ভট্টাচার্য
উপাচার্য
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী গৌতম দেব
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস
শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্‌ল কর্পোরেশন
শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১

শিলিগুড়ির ইউনিয়ন বোর্ড, পুরসভা, পুরনিগম এবং পৌরপ্রশাসক মণ্ডলীর প্রথম চেয়ারম্যান, মেয়র ও মুখ্য প্রশাসকবৃন্দ

শচীন্দ্রমোহন গুহ

জগদীশ ভট্টাচার্য

বিকাশ ঘোষ

অশোক ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির পুরনিগমের বর্তমান প্রশাসকমণ্ডলী

গৌতম দেব

চেয়ারম্যান

রঞ্জন সরকার

সদস্য

অলোক চক্রবর্তী

সদস্য

বিবেক বৈদ

সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলী ঃ

১) ডাঃ শেখর চক্রবর্তী
২) শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৩) শ্রী পার্থ চৌধুরী
৪) অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায়
৫) শ্রী সুদীপ্ত রায় (তাপু)

সম্পাদক মন্ডলী ঃ

১) অধ্যাপক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য (আহ্বায়ক)
২) শ্রী শুভময় সরকার
৩) শ্রী বিপুল দাস
৪) অধ্যাপক শেষাদ্রি বসু
৫) সুদীপ চৌধুরী
৬) শ্রী পলক চক্রবর্তী
৭) শ্রীমতী সেবন্তী ঘোষ
৮) অধ্যাপক জিনিয়া মিত্র
৯) শ্রী সুপ্রকাশ রায়
১০) শ্রী প্রবীর চক্রবর্তী
১১) শ্রীমতী অভয়া বসু
১২) ড. শান্তনু দাস
১৩) শ্রী শুভঙ্কর রায়, সচিব, শিলিগুড়ি পুরনিগম

স|ম্পা|দ|কী|য়

বাঙালির মতো শিলিগুড়িরও আছে ইতিহাসহীনতার আক্ষেপ। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাণিজ্যিক শহরের অকুলীন অভিধা নিয়ে পার্শ্ববর্তী গরীয়সী শহরের তুলনায় তাঁর কুণ্ঠিত সলজ্জ দিনযাপন। ঐতিহ্যের গরিমা তাঁর নেই, তাকে ঘিরে অধিবাসীদের আবেগও নাকি প্রায় নেই বললেই চলে। জীবিকার টানে জনস্রোত এ শহরে, থিতু হওয়া ক্রমে সেই সূত্রে। এ শহরকে ঘিরে তাই অধিকাংশেরই নেই শৈশব যাপনের স্মৃতি বা দামাল কৈশোরের 'দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা'। তবু এই জনপদের কিছু কিছু মানুষ, যাঁরা পূর্বপুরুষের কর্মসূত্রে বা শিকড়ছিন্নতার কারণে এই শহরকে পেয়েছেন জন্মভূমি তথা ধাত্রীভূমি হিসেবে, অথবা নিজের কর্মসূত্রে এসে থিতু হয়েছেন এখানে, দীর্ঘ গা-ঘেঁষাঘেঁষি সহাবস্থনের ফলে তাঁদের মধ্যে একটা ভালোবাসা বা কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি হয়েছে এই শহরের প্রতি। শহর এবং শহরের আত্মজরা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই জনপদেরও ঐতিহ্য না হোক, অন্তত আবছা ইতিহাসের একটা আদল ফুটে উঠতে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে সে ইতিহাসের পথরেখাকে স্পষ্ট করার প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে একাধিকবার। ঘটে যাওয়া অতীত বা ঘটমান বর্তমানকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রসে জারিত করে উপস্থাপিত করেছেন তাঁরা, কখনো উত্তর প্রজন্মের কাছে অতীতকে পৌঁছে দিতে, কখনো গবেষণার প্রয়োজনে, কখনো বা নিছকই খেয়ালবশে। এইসব ব্যক্তিগত কাজ উসকে দেয় সুপরিকল্পিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে জনপদ থেকে শহর হয়ে নগর গড়ে ওঠার ইতিকথা রচনার ভাবনাকে। সমমনস্ক মানুষের ব্যক্তিগত ভাবনার বাষ্পবিন্দু ইতস্তত বিচরণ করে, কিন্তু জমাট বেঁধে মেঘ হয়ে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় অনুকূল পরিস্থিতির। সেরমম এক পরিস্থিতিতেই শুরু হয়েছিল 'পুরবার্তা'-র যাত্রা। দীর্ঘ ছিল না সে যাত্রাপথ, কিন্তু সূচনাবিন্দু হিসেবে তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

শহরের অভিভাবকেরা যখন নৈমিত্তিক কাজ দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেও ভাবনাকে দিতে পারেন বিস্তার, পুরনিগমের দৈনন্দিন নাগরিক পরিষেবার অতিরিক্ত অতীত ও ভবিষ্যবিস্তারী চেতনায় অনুভব করেন প্রিয় জনপদের দলিল রচনার গুরুত্বটিও, তখন ভাবনার সেই বিচ্ছিন্ন বাষ্পবিন্দু আবার কাছাকাছি আসে জমাট বাঁধার লক্ষ্যে, স্বপ্ন দেখে বৃষ্টি হয়ে ঝরার। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্তমান প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন শ্রী গৌতম দেব এবং অন্য তিন সদস্য শ্রী রঞ্জন সরকার, শ্রী অলোক চক্রবর্তী এবং শ্রী বিবেক বৈদ 'পুরবার্তা' প্রকাশকেও অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে সেই অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। প্রাথমিক সভাতেই এই শহরের ইতিহাসকেন্দ্রিক গ্রন্থ নির্মাণের যে প্রস্তাব উঠে আসে, তাতেও সানন্দ সম্মতি জানান প্রশাসকমণ্ডলী। নিয়মিত 'পুরবার্তা' প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের দিন হিসেবে স্থির হয় স্বাধীনতা দিবস।

পুরবার্তা ২০২১

হাতে সময় খুব বেশি ছিল না, অতিমারি পরিস্থিতিতে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের 'মুখোমুখি বসিবার' সুযোগও ছিল কম, ফলে সম্পাদনার প্রাথমিক কাজ শুরু হয় অনলাইনেই। আমন্ত্রিত লেখা সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রুফ সংশোধন , সবক্ষেত্রেই মণ্ডলীর সদস্যরা নিজ নিজ সময় এবং সুযোগ অনুযায়ী সহায়তা করেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য এবং ব্যস্ত মানুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ে লেখা পাঠিয়ে নির্ধারিত সময়ে পত্রিকার প্রকাশ সুনিশ্চিত করেছেন।

পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলী প্রথম সভাতেই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মুক্তমনে সম্পাদনার কাজ করার ব্যাপারে যে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন তা সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়েছে, যে কোনো বিষয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত, ফলে দ্বিধাহীন চিত্তে কাজ করা সম্ভব হয়েছে। চেয়ারপার্সন শ্রী গৌতম দেব মহাশয় রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের শুভেচ্ছাবার্তা যথাসময়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন, প্রতিনিয়ত কাজের অগ্রগতির সংবাদ নিয়ে আমাদের সচল রেখেছেন, বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন এবং মাঝে মাঝেই 'স্বাধীনতা দিবস কিন্তু পেছোবে না' মনে করিয়ে দিয়ে 'পুরবার্তা' প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে সচেতন রেখেছেন।

শহরকে নিয়ে, শহরের ইতিহাস-ভূ গোল-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চিন্তাভাবনা করি, তাঁরা এই পত্রিকা প্রকাশের সুযোগে সামূহিকভাবে নিজেদের মত প্রকাশের, ভাবনা বিনিময়ের সুযোগ পেলাম, সেটাও বড় কম কথা নয়। এই মুখোমুখি বসা আমাদের অকুলীন শহরকে নিয়েও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ নির্মাণের সুপ্ত বাসনাকে আর একটু উসকে দিল।

'পুরবার্তা' সম্পাদনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি নির্দেশিত বানানবিধি রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুদ্রণপ্রমাদ সবটা এড়ানো গেছে এমন নয়, তবে চেষ্টা ছিল যথাসাধ্য। পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর কাছে আমাদের সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা এই কারণে যে, 'পুরবার্তা'কে তাঁরা শহরের দর্পণ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। পুরনিগমের মহাধ্যক্ষ, সচিব, বিত্ত আধিকারিক, প্রধান করণিকসহ যেসব আধিকারিক এই প্রকাশনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করেছেন, ব্যস্ততা সত্ত্বেও যাঁরা লেখা পাঠিয়েছেন শুধু নয়, সময় সংক্ষেপ করতে নিজেদের লেখা টাইপ করেও দিয়েছেন এবং কেউ কেউ নিজের লেখার প্রুফ সংযোধনও করে দিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, 'মাম কম্প্যুটার'-এর কর্ণধার সুব্রতদা দ্রুততার সঙ্গে কম্পোজ এবং ছাপার কাজ করে সময়কে ধরতে সহায়তা করছেন। ব্যবসার বাইরেও তাঁর কাজে ব্যক্তিগত স্পর্শ থাকে যা কাজের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করে। 'পুরবার্তা'কে কেন্দ্র করে সম্পাদকমণ্ডলীর অনেকেই বেশ কিছুটা সময় একসঙ্গে অতিবাহন করা গেল, এই অতিমারিকালে সেটাও একটা বড় প্রাপ্তি।

'পুরবার্তা'র প্রকাশনা নিয়মিত থাকবে, ভাবনার বিনিময়ে ক্রমশ সমৃদ্ধ হবে, প্রকৃত অর্থেই নগর-দর্পণ হয়ে উঠবে এই আশা নিয়ে আপাতত নিবৃত্ত হওয়া যাক।

B

সূ|চি|প|ত্র

১।	দিয়েছ আমার 'পরে ভার তোমার স্বর্গটি রচিবার	—	গৌতম দেব	১-১০
২।	যে কথা বলতে চাই	—	রঞ্জন সরকার	১১-১২
৩।	প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য অলোক চক্রবর্তীর কলমে	—	অলোক চক্রবর্তী	১৩-১৫
৪।	**सिलीगुड़ी नगर निगम : अतीत, वर्तमान और भविष्य चुनौतियां और समाधान**	—	**विवेक बैद**	১৭-২১
৫।	A Strategic Approach towards Sustaining the Himalayan Ecosystem -		Sonam Wangdi Bhutia	২৩-২৬
৬।	পূর্ব মোরঙ্গ - পশ্চিম বৈকুণ্ঠপুর-তরাই-শিলিগুড়ির স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত	—	আনন্দ গোপাল ঘোষ	২৭-৪২
৭।	কোভিড-১৯ অতিমারি — কিছু কথা	—	ডাঃ শেখর চক্রবর্তী	৪৩-৪৮
৮।	সেদিনের শিলিগুড়ি	—	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	৪৯-৫৪
৯।	কথামালা	—	বিপুল দাস	৫৫-৬৭
১০।	বৃহত্তর শিলিগুড়ি ও তার পৌর পরিসর ঃ প্রসঙ্গ বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিবর্তনের ধারা	—	শ্যামল গুহ রায়	৬৮-৭৭
১১।	সেই শিলিগুড়ি, আজ শিলিগুড়ি, কার শিলিগুড়ি?	—	সৌমেন নাগ	৭৮-৮৫
১২।	শিলিগুড়ি নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকে	—	নবেন্দু গুহ	৮৬-৮৭
১৩।	শিলিগুড়ি মহকুমার চা'শিল্প ও শ্রমিক (১৮৬২-১৯৬৭)	—	ড. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়	৮৮-৯৭
১৪।	শিলিগুড়ি মহকুমার হাট	—	অশেষ কুমার দাস	৯৮-১০২
১৫।	দুই তারে বাঁধা থাক...	—	প্রবীর চক্রবর্তী	১০৩-১০৬
১৬।	এই সময় ও শিলিগুড়ির থিয়েটার	—	পলক চক্রবর্তী	১০৭-১২১
১৭।	শিলিগুড়ির সিন্ধি সমাজ	—	সুজিত ঘোষ	১২২-১২৯
১৮।	ঔপনিবেশিক স্মৃতির সমাবেশে শিলিগুড়ি মহকুমা প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য	—	শেষাদ্রি বসু	১৩০-১৩৪
১৯।	বইমেলা এবং আমার শহর	—	শুভময় সরকার	১৩৫-১৩৬
২০।	আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার	—	প্রণব কুমার ভট্টাচার্য	১৩৭-১৩৮
২১।	বাঘাযতীন পার্ক	—	সেবন্তী ঘোষ	১৩৯-১৪২

সু|চি|প|ত্র

২২।	দেশভাগ, উদ্বাস্তু আগমন ও জনবিন্যাসের রূপরেখা ঃ প্রসঙ্গ শিলিগুড়ি	—	ড. সুপম বিশ্বাস	১৪৩-১৪৮
২৩।	মিত্রসম্মিলনী ঃ শিলিগুড়ির নাট্যপ্রবাহের শতাব্দীর স্রোতস্বিনী এক	—	পার্থপ্রতিম মিত্র	১৪৯-১৫৫
২৪।	শহর শিলিগুড়ির পরিবেশ ভাবনা	—	অনিমেষ বসু	১৫৬-১৬০
২৫।	শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগাজিন চর্চা অর্বাচীনের আউটলুক	—	পঙ্কজ ঘোষ, শুভ্রদীপ রায়, সন্দীপন দত্ত	১৬১-১৬৮
২৬।	সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রদান ঃ একটি পরিকল্পনা	—	ড. শান্তনু দাস	১৬৯-১৭৫
২৭।	শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি --শিলিগুড়ির সংস্কৃতি চর্চায় যেভাবে প্রতিশ্রুত	—	প্রদীপ নাগ	১৭৬-১৭৮
২৮।	শিক্ষা বিস্তারে চা উদ্যোগপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ঃ প্রসঙ্গ ঔপনিবেশিক শিলিগুড়ি	—	সুব্রত বাড়ই	১৭৯-১৮৭
২৯।	শিলিগুড়ির হরিপদ ভট্টাচার্য - এক বিস্মৃত দেশপ্রেমী ঃ An unsung Hero……	—	সুদীপ চৌধুরী	১৮৮-১৯১
৩০।	মহামারির আপনজন	—	প্রণব ঘোষ	১৯২-১৯৭
৩১।	শিলিগুড়ির সাম্প্রতিক খেলাধূলা নিয়ে দু'চার কথা	—	বিশ্বজিৎ গুহ	১৯৮-২০০
৩২।	GROWTH OF SILIGURI AS AN URBAN CENTRE: PAST, PRESENT AND FUTURE	—	Ranjan Roy	201-213
33|	Snapshots of a City : Claiming Spaces in Man's World	–	Zinia Mitra	214-221
34|	The impact of Growing Propensity of Threats to Rivers in Siliguri and its Redressal	—	Dr. Suprakash Roy	222-224
35|	LEGAL EDUCATION IN SILIGURI AND SURROUNDING AREAS : A LEGACY TO CARRY FORWARD	—	Soma Dey Sarkar	225-227
36|	सिलिगुड़ी: जिम्मेदार नागरिक समाज की आवश्यकता	-	ड. बिनय कुमार पटेल	228-230
37|	उत्तर बंगाल में हिंदी : बेहतर भविष्य की ओर	—	ड. अजय कुमार साव	231-133
41|	सिलगढी कलेजको नेपाली विभाग – अतीतदेखि वर्तमानसम्म	—	ड. राजकुमारी दाहाल	234-236

দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার

■ গৌতম দেব
চেয়ারম্যান, প্রশাসক মন্ডলী, শিলিগুড়ি পুরনিগম

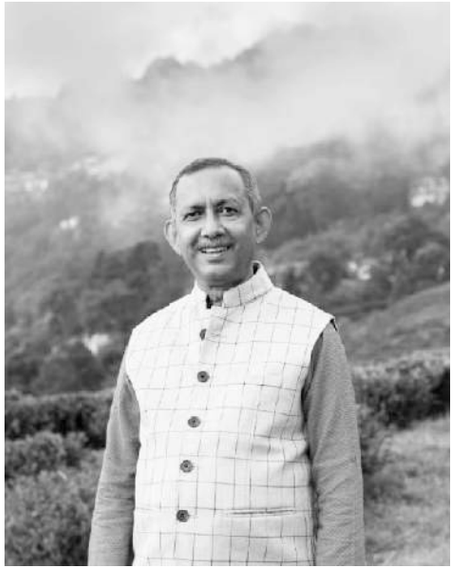

গত ৭ মে ২০২১ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক পরেই শিলিগুড়ি পুরনিগমে চার সদস্যের পুরপ্রশাসক বোর্ড তৈরি হয়। আমাকে মুখ্যপ্রশাসকের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জড়তা কাটিয়ে তোলার জন্য প্রথম থেকেই এই পুরপ্রশাসক বোর্ড সচেষ্ট হয়েছে এবং কতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রথমত, পুরনিগমের চারটি মূল বিষয় অনলাইন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাড়ির নকশা (বিল্ডিং প্ল্যান), জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র (বার্থ অ্যান্ড ডেথ সার্টিফিকেট), ব্যবসায়িক অনুজ্ঞাপত্র (ট্রেড লাইসেন্স) নতুন এবং পুনর্নবীকরণ করার বিষয়গুলি অনলাইন ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে। সম্পদ কর (প্রপার্টি ট্যাক্স)-কে অনলাইন করার প্রক্রিয়া চলছে এবং আশা করা যায় জুলাই মাসের মধ্যে এই বিষয়টিও অনলাইনে সংযোজিত হবে। এছাড়া, কাগজবিহীন প্রশাসন অর্থাৎ সমস্ত অফিসকে ই-অফিসে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলছে এবং খুব শীঘ্রই শিলিগুড়ি পুরনিগম ই-অফিসে পরিণত হবে। পুরনিগমের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত নথি ডিজিটাইজেশন করার প্রক্রিয়া চলছে।

শিলিগুড়ি শহরের সত্তর বছরের জমা আবর্জনা বায়ো-মাইনিং (BioMining) পদ্ধতির মাধ্যমে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ খুব দ্রুতগতিতে চলছে এবং আশা করা যায় এই বছরের মধ্যেই সমস্ত জমা জঞ্জাল সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব হবে এবং শিলিগুড়ির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রায় ত্রিশ একর জায়গাটি পরবর্তীতে বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বাজার এলাকাগুলোতে দিনে দু'বার করে জঞ্জাল সাফাই করা হবে।

জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management) সমস্ত ওয়ার্ডে নতুন করে শুরু করার লক্ষ্যে নতুন ১১৪টি টোটো কেনা হচ্ছে ; যার অধিকাংশই ইতিমধ্যে পুরনিগমে চলে এসেছে। ১০টি নতুন আধুনিক ট্রেলার সহ ট্রাক্টর কেনা হবে এবং এর টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এছাড়াও ১০টি জলের ট্যাঙ্ক ও সাফাইয়ের জন্য ৮টি নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত বাজারগুলো ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি।

এই পুরবোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শনিবার সম্পূর্ণ অফিস হবে এবং বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলায় রবিবার দিনও প্রতীকীভাবে অফিস চলছে। নতুন পুরপ্রশাসক বোর্ড দায়িত্ব নেবার ঠিক পরেই সারা রাজ্যে কোভিড নিয়ন্ত্রণবিধি লাগু হয়েছে ; যার দরুণ ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে রোটেশনের ভিত্তিতে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জুলাই মাস অবধি সারা রাজ্যে এই নিয়ন্ত্রণবিধি আপাতত চালু রয়েছে। এর মধ্যেই একদিকে যেমন কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলার জন্য জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুর-প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের কাজ চলছে। অপরদিকে বিভিন্ন পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে করোনা পরীক্ষা সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের কাজ চলছে। নিভৃতবাসে থাকা রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করা সহ প্রয়োজনবিশেষে পুরনিগমের নিজস্ব কোভিড অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তির ব্যবস্থা করার কাজ করছে পুরনিগম । এছাড়াও মৃত ব্যক্তিদের দাহকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পুরসভা তিনটি শববাহী গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি, অক্সিজেনের চাহিদা পূরণে অক্সিজেন পার্লার তৈরি করা হয়েছে এবং পুরসভা থেকে অক্সিজেন পার্লারের মাধ্যমে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও অক্সিমিটার সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় টিকাকরণের ব্যবস্থা করা — যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনের তুলনায় টিকার যোগান অপ্রতুল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিকাকরণের কাজ আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি আমরা বেশকিছু এনজিও-কে সঙ্গে নিয়েও টিকাকরণের কাজটি করে চলেছি।

পুরসভার উদ্যোগে ইতিমধ্যেই তিনটে সেফহোম চালু করা হয়েছে ডাবগ্রামের পলিটেকনিক কলেজে, কাওয়াখালিতে ও তিনবাত্তি মোড়ে। এই তিনটি সেফহোমই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যেমন - সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা, লিভার ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া, অমিত আগরওয়াল ফাউন্ডেশন, কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক, শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি, সিসিএন পরিবারসহ অন্যান্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মিলিত ভাবে পরিচালনা করছে। এছাড়াও শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও মাটিগাড়া যিশু আশ্রমে আরও ২টি সেফহোম চালু আছে। কোভিডের এই দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময় শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্লাব,

গণসংগঠন, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং বহু সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে পুরনিগমের সঙ্গে সমবেতভাবে মিলিত হয়ে কাজ করে চলেছেন। এইরূপ সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে পুরপ্রশাসনিক বোর্ড শিলিগুড়ি শহরের ১৭টি স্থানে গভীর নলকূপ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিটি ফিল্টারযুক্ত গভীর নলকূপ বসাতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হবে এবং কাজটি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (PHE) মাধ্যমে করা হবে। ইতিমধ্যেই পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই কাজ শুরু হয়েছে এবং এরপর ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে শুরু হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই প্রায় সাতানব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে শিলিগুড়ির সমস্ত হাইড্রেন পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছি। যে কাজটি বহু আগেই করা উচিত ছিল, সেটা হয়নি। তাই বর্ষার মধ্যেও আমাদের হাইড্রেন পরিষ্কার করার এই কাজ চলছে।

দীর্ঘদিন পর ৩০ জুন, ২০২১ শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকাকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত (ODF) এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর থেকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করলে ২০০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় খাটা-পায়খানাগুলোর জায়গায় শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং পাবলিক টয়লেট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত শহরের ১২টি স্থানে সুলভ শৌচালয় তৈরি করা হবে । যার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে 'সুলভ ইন্টারন্যাশনাল' নামক একটি সংস্থা। তাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আমরা চুক্তিবদ্ধ হবো। ইতিমধ্যেই আমরা দুটো মা ক্যান্টিন চালু করেছি , একটি ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ও আরেকটি ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে প্রত্যহ মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে রান্নাকরা খাবার মানুষের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে। এছাড়া শিলিগুড়ির জংশন এলাকায় আমরা তৃতীয় 'মা' ক্যান্টিনটি খোলার চেষ্টা করছি।

পূর্বে মিউটেশন ফি ছিল সম্পত্তি মূল্যের ২ শতাংশ। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে আমরা তা কমিয়ে ১ শতাংশ করে দিয়েছি।

সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে অনাদায়ী করের ওপর ৫০ শতাংশ সুদ মুকুবের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমারা অনুরোধ জানিয়েছি।

ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ড তৈরি করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আর্থিক সাহায্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল অবধি পুরনিগমের সদস্য থাকার দরুণ পুরনিগমের কাছে আমার ১ লক্ষ ৫৭

হাজার টাকা পাওনা ছিল। সেই টাকা এবং নিজের ব্যক্তিগত আয় থেকে আরো ১১ হাজার টাকা মিলিয়ে মোট ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা দিয়ে চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ড চালু করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বহু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি এই তহবিলে অর্থ সাহায্য করেছেন। এই তহবিলের মাধ্যমে পুরনিগম থেকে খুবই প্রয়োজনীয় কিছু ব্যক্তিকে মাসিক আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে। রিঙ্কিনি ঘটক (মাধ্যমিকে রাজ্য মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থানাধিকারী) মাসিক ২ হাজার টাকা করে পাচ্ছে। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দিতা রায় (যার বাবা ও মা অতিসম্প্রতি কোভিডে মারা গেছেন) তাকেও ২ হাজার টাকা করে মাসিক সাহায্য করা হচ্ছে। এছাড়া, তিন শহিদ পরিবার (প্রয়াত উদয় চক্রবর্তী, প্রয়াত টোকেন সাহা ও প্রয়াত তিলক বাহাদুর ছেত্রী) এই তহবিল থেকে মাসিক আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন।

পুরনিগমের সকল স্থায়ী কর্মচারীদের ২ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যার প্রিমিয়াম সম্পূর্ণভাবেই পুরনিগম বহন করবে। এর আগে, মোট স্থায়ী কর্মচারির ৯০ শতাংশের ২ লক্ষ টাকার বিমার প্রিমিয়ামের মাত্র ৫০ শতাংশ পুরসভা বহন করতো।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হয়েছে। অতীতে একই কাজের জন্য বহু লোককে নিয়োগ করে প্রায় বসিয়ে রেখে মাইনে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া চলছে।

সাফাই কর্মচারীদের বছরে দু'বার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু অসুবিধা থাকলে সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা পুরনিগম থেকে করা হবে।

পুরনিগমের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে দেশের অন্যতম স্থপতি শ্রী পি.আর. মেহেতা-কে কারিগরি উপদেষ্টা, আইনজীবী অরিন্দম মিত্র-কে আইনি উপদেষ্টা এবং আগরওয়াল মহেশ কুমার অ্যান্ড কোম্পানিকে আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে পুরনিগমকে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিচ্ছেন।

সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের মাসে ৫০০ টাকা করে আগে পুরনিগম থেকে দেওয়া হত। গত ১৮ মাস ধরে তা বকেয়া ছিল। বর্তমানে পুনরায় সেই অর্থ দেওয়া শুরু হয়েছে এবং প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দিয়ে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সেই সহায়তা মূল্য প্রেরণ করা হচ্ছে।

'হাউসিং ফর অল' প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত প্রান্তিক মানুষদের গৃহনির্মাণের কাজটি এতদিন থমকে ছিল। এই গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজ আবার নতুন করে আমরা শুরু করতে পেরেছি। পুরনিগমের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী অসীম কুমার মন্ডলের নেতৃত্বে শৌচাগার নির্মাণ এবং গৃহনির্মাণের জন্য দুটি পৃথক মনিটরিং কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

পুরবার্তা ২০২১

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় আমরা ১০ হাজার গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে সবুজায়ন বৃদ্ধি করা হবে।

গ্রিন সিটি মিশনের কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে এবং শহরের সৌন্দর্যায়নের কাজে গতি আনা হচ্ছে।

আমরা বাঘাযতীন পার্ক, শিলিগুড়ি কলেজ মোড় এবং হাসমিচক এলাকাকে ফ্রি-ওয়াইফাই জোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম স্থান শক্তিগড় রবীন্দ্রমঞ্চ -এর দায়ভার পুরনিগমের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (SJDA) অনুরোধ করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন স্থানে মনীষীদের মূর্তি রয়েছে। সেগুলি সপ্তাহে দুদিন করে পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়িতে দুটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। একটি শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে বিপ্লবী বাঘাযতীনের মূর্তি ও আরেকটি এয়ারভিউ মোড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি।

শিলিগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত ৩৪টি ছোট-বড়ো পার্ক আছে। প্রত্যেকটি পার্ককে নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে। এছাড়া সূর্যসেন পার্ককে নতুনভাবে তৈরি করা হচ্ছে।

ডি.আই ফান্ড মার্কেট হস্তান্তর প্রক্রিয়া দ্রুত চূড়ান্ত করার জন্য দার্জিলিং-এর জেলাশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে।

পুরনিগমের যত সম্পত্তি আছে তার তালিকা (Inventory List) তৈরি করা হচ্ছে এবং সমস্ত সম্পত্তি যাতে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তার জন্য সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে।

এয়ার ভিউ মোড় এবং হাসমিচক এলাকাকে হোর্ডিং-মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নতুন একটি শ্মশান তৈরি করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার থেকে ২.৫৭ একর জমি পুরনিগমে হস্তান্তরিত হয়েছে। এছাড়া, কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

রোড-নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য আমরা ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা করে দুটো পৃথক প্রকল্পে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে, যার প্রথম পর্যায়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

পুরনিগমের পক্ষ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে , ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে ও একটি ঘোঘোমালিতে।

পুরবার্তা ২০২১

বিধান মার্কেট ধাপে ধাপে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাজটি করবে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SJDA)। পুরনিগম এবিষয়ে পুরোপুরি সহায়তা করবে এবং প্রয়োজনে কিছু অর্থ পুরনিগম থেকে দেওয়া হবে।

পুরনিগমের মূল কার্যালয় ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী দুটো বিল্ডিং-এর কাজ যা আগেই শুরু হয়েছিল, তার নকশায় বেশকিছু ত্রুটি ছিল। ত্রুটিগুলি যথাযথ সংশোধন করে পুনরায় সেই কাজে গতি আনা হয়েছে।

পুরনিগমের পান্থনিবাস ঢেলে সাজানো হচ্ছে এবং আশ্রম পাড়ায় অবস্থিত কিরণচন্দ্র ভবনকে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের যে অতিথি আবাস আছে , সেটা সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে এবং তার পাশেই পুরনিগমের অব্যবহৃত খালি জায়গাতে আরেকটি নতুন ভবন তৈরির প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলছে।

'পুরবার্তা'- শিলিগুড়ি পুরনিগমের মুখপত্র; যা কয়েকটি সংখ্যা বের হবার পরই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে ছিল। সেটা আবার নতুন করে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ির লোকাল বাসস্ট্যান্ডটি বাগরাকোট থেকে তিনবাত্তি মোড়ে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং বিশদে আলোচনা হয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিলিগুড়িতে জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ইতিমধ্যেই আমি নিজে দু'বার কলকাতা গিয়ে পুর ও নগরান্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী, প্রধান সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছি। শিলিগুড়ি শহরে বৃহৎ জলপ্রকল্প তৈরির লক্ষ্যে গজলডোবার তিস্তা নদীর থেকে জল এনে তা ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধিত করে শহরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর দ্বারা ৪৭০.৪৫ কোটি টাকার DPR তৈরি করে আমরা পুর ও নগরান্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছি। এছাড়াও, এ বিষয়ে একাধিক পুর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্স সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রধান সচিব, নোডাল অফিসার, জয়েন্ট সেক্রেটারি, কেএমডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, সুডা'র ডাইরেক্টর সহ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা ছিলেন। এছাড়াও, গজলডোবার তিস্তা-মহানন্দা লিঙ্ক ক্যানেল থেকে ফুলবাড়ি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে জল সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পুর ও নগরান্নয়ন দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বকেয়া অর্থের সিংহভাগই ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ধীরে ধীরে রিলিজ করছে এবং

আমরা আশাবাদী যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুযায়ী আমরা অর্থ বরাদ্দ পাবো।

ডাবগ্রামে মাতৃসদনের আরেকটি নতুন ভবন তৈরি করা হবে। ডনবস্কো মোড়ের অর্ধসমাপ্ত ভবনটি নতুনরূপে তৈরি করে সেটিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে কোন বৃহৎ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ভবনটি ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও, সেবক রোডের দেশবন্ধু চেস্ট ক্লিনিকে পুরনিগমের যে জায়গাটি আছে সেটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির জেলাশাসক, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা, পুরনিগমের আধিকারিক এবং প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে ডন বস্কো মোড়ের অর্ধসমাপ্ত ভবন এবং দেশবন্ধু চেস্ট ক্লিনিক পরিদর্শন করা হয়েছে।

বিভিন্ন জল প্রকল্পের এলাকাগুলিসহ আগে যেখানে বর্জ্য পদার্থ জমা করা হতো সেই সকল এলাকাগুলিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এবং সেই কাজ শুরু হয়েছে। ফুলবাড়ির পুঁটিমারি এলাকাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের একটি ১৯.৫৮ একর জমি রয়েছে যা বর্জ্য পদার্থ জমা করার জন্য বেশ কিছু বছর আগে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, দীর্ঘদিন যাবৎ জায়গাটি খালি পড়ে থাকায় আমরা এই জায়গাটিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

চম্পাসারি রেগুলেটেড মার্কেটের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management) আমরা কম্প্রেশন সিস্টেমের দ্বারা নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছি।

হিলকার্ট রোডের সমান্তরাল রাস্তা এবং হিলকার্ট রোড ও সেবক রোড সংযোগকারী সেতু তৈরি করার জন্য রাইটসকে (RITES) নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে এসেছেন এবং সার্ভের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এছাড়া, শিলিগুড়ির ড্রেনেজ সিস্টেমকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

চতুর্থ এবং পঞ্চম মহানন্দা সেতুর সংযোগকারী রাস্তাগুলো চওড়া ও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই কাজটি মূলত শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করবে। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত দার্জিলিং মোড়ের ভীষণ যানজট থেকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা মুক্তি দিতে বিকল্প পথ হিসেবে পুরনো মাটিগাড়ার রাস্তাটিকে চওড়া ও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১ নম্বর ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগকারী সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে ওই পথ দিয়ে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম মহানন্দা সেতু দিয়ে বেশকিছু গাড়িকে ডাইভার্ট করে শহরের ভেতরকার যানজট কিছুটা কমানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এছাড়া ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গ্রিনপার্কে খেলার মাঠ এবং

নিউ-পোকাইজোতে হাইড্রেন নির্মিত হবে। তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) -এর জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত বৈদ্যুতিক বাতি এলইডি-তে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দেশ অথবা বিদেশের প্রতিষ্ঠিত নামী এলইডি প্রস্তুতকারী সংস্থা থেকে সরাসরি ক্রয় করা হবে। সেক্ষেত্রে প্রায় ৬০-৬৫ শতাংশ ব্যয় কম হবে। শিলিগুড়ি শহর জুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ কেবল বসানো হবে। শহরের পথবাতিগুলোর জন্য প্রায় ২২ হাজার বিদ্যুতের খুঁটি রয়েছে যার একটিতেও আর্থিং ব্যবস্থা নেই। এই কারণে পথবাতিগুলো তাড়াতাড়ি খারাপ হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক এই বৈদ্যুতিক পোলগুলোকে আর্থিং ব্যবস্থার মধ্যে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এবং এবিষয়ে বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলছে। শহরের বেশকিছু জায়গায় এখনো স্ট্রিট-ফেজ বসানো হয়নি, যার দরুণ সেসমস্ত এলাকায় সারাদিন পথবাতি জ্বলে থাকে আবার কিছু স্থান অন্ধকারে থাকে। সেসমস্ত এলাকাগুলোতে দ্রুত স্ট্রিট-ফেজ বসানোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ।

এছাড়াও, ইস্টার্ন বাইপাস যেখানে ফোর লেনিং-এর কাজ বর্তমানে চলছে সেখানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিকরণের কাজ করানোর প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি।

শিলিগুড়ি পুরনিগম ধীরে ধীরে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই সমস্ত ভাড়া করা গাড়িগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভাড়া গাড়ির পরিবর্তে সমস্ত গাড়ি নিজেরাই কিনে নিয়ে পুরনিগমের নিজস্ব গাড়িতে নিজ কর্মীদের মাধ্যমে জঞ্জাল অপসারণের কাজ করানো হবে।

সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা ইতিমধ্যেই বেশকিছু প্রশাসনিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর আগে পুরনিগমে ৯০টি গাড়ির জন্য বছরে প্রায় ৬ কোটি টাকার জ্বালানি লাগতো এবং গাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের খরচও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ইতিমধ্যেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি গাড়িগুলোর তেল খরচের ঊর্ধ্বসীমা পরীক্ষামূলকভাবে ৩০ শতাংশ কমানো হবে এবং প্রত্যেকটি গাড়ির ফুয়েল অডিট ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচের অডিট করা হবে। এই কাজের জন্য সিএ ফার্ম 'আগরওয়াল মহেশ কুমার অ্যান্ড কোম্পানি'-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গাড়িকে উন্নতমানের জিপিএস ব্যবস্থার মধ্যে আনা হচ্ছে। পুরনিগমের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ওয়েইং-মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে কোন গাড়ি কতখানি বর্জ্য কতবার বহন করছে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

এই সামান্য দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যেই আমরা বেশকিছু স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আগামী ৫ বছরের জন্য পুরসভার একটি রূপরেখা আমরা তৈরি করতে চাই। বর্তমানে জরুরি ভিত্তিতে আপাতত এই কাজগুলো আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং ছোট-বড়ো সবমিলিয়ে প্রায় ১০০

কোটি টাকার পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে আমরা আছি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেমন- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পূর্ত দপ্তর, সেচ দপ্তর, মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেট, শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, পরিবহন দপ্তর -এদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে পুরসভা ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।

শহরের নদীগুলোর সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নদীর ধারগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। মহানন্দা, জোড়াপানি এবং ফুলেশ্বরী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য বেশকিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ হল উন্মুক্ত শৌচকর্ম বন্ধ করা ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন তৈরি করা। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেচ দপ্তর, এমইডি, এসজেডিএ এবং পুরনিগম যৌথভাবে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের সরকারি বাসস্ট্যান্ড, তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আরেকটি নতুন বাস টার্মিনাস তৈরির প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবিত বাস টার্মিনাসটি তৈরির জন্য হিমুল ক্যাটল ফিড-এর জায়গা থেকে ৮.২২ একর জমি ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হবে।

শিলিগুড়িতে ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা দ্রুত চালু করতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মুখ্য আধিকারিকসহ ইঞ্জিনিয়ার এবং পুরনিগমের আধিকারিকদের নিয়ে একটি সমন্বয় সভা সংগঠিত হয়েছে। এছাড়া, শিলিগুড়ি শহরের মানুষকে উন্নততর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে সম্প্রতি সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার নর্থ জোনের জোনাল ম্যানেজার এবং দার্জিলিং-এর জেলাশাসককে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সভা সম্পূর্ণ হয়েছে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির জেলাশাসক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব তথা পুরনিগমের প্রাক্তন প্রশাসক সুরেন্দ্র গুপ্তা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে আমাদের ক্রমাগত বৈঠক হয়েছে। এই কর্মযজ্ঞে সাধারণ মানুষকে ব্যপকভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্লাব, গণসংগঠন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে প্রতিনিয়তই আমাদের বৈঠক চলছে।

শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার জন্য ইতিমধ্যেই ক্রীড়া মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন

নতুন করে তৈরির ব্যাপারে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং তারা নীতিগতভাবে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও শিলিগুড়িতে অন্ততপক্ষে পাঁচটি খেলার মাঠ নতুন করে তৈরি করা হবে সমস্ত মুক্তমঞ্চ গুলোকে আধুনিকভাবে নতুনরূপে সাজানো হবে।

এই সমস্ত কর্মসূচিগুলোকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রাথমিক পর্যায়ে দু'বার আলোচনা হয়েছে এবং তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

সবমিলিয়ে শিলিগুড়ি শহরকে প্রাণবন্ত, সবুজ, পরিচ্ছন্ন এবং গতিশীল শহরে পরিণত করতে যে সকল পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তার প্রাথমিক খসড়া আমরা তৈরি করেছি এবং সেই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য আমরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছি । শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রিয় শহর শিলিগুড়িকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলি।

পরিশেষে বলতে চাই -

''অহংকারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে
রাখো আমায় যেথা আমার স্থান।''

যে কথা বলতে চাই

রঞ্জন সরকার
সদস্য, প্রশাসক মন্ডলী, শিলিগুড়ি পুরনিগম

অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের মুখপত্র হিসেবে 'পুরবার্তা' নব কলেবরে প্রকাশিত হল। এই 'পুরবার্তা' বিচ্ছিন্নভাবে বিগত সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমেই আমি এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আমার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক মন্ডলী গঠিত হয়েছে ৬ই মে ২০২১। সেই প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়ভার গ্রহণ করে আমরা প্রথমেই সচেষ্ট হয়েছি এই শহরের সার্বিক উন্নতি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে। আমরা ৭মে ২০২১ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। সুতরাং খুব অল্প দিন হল আমাদের এই সময়। ইতিমধ্যেই আমরা সচেষ্ট হয়েছি বিদায়ী বোর্ড শিলিগুড়ি নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানে যে সকল ক্ষেত্রে অসফল হয়েছেন সেগুলো সফল করা। সেই উদ্দেশ্যে নব গঠিত প্রশাসক মন্ডলীর মাধ্যমে আমরা একটি রূপরেখা তৈরি করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করবার উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা লক্ষ্য করেছি পৌর নিগমের যে সকল কর্মীরা পরিষেবা দেন তাঁদের ঘরগুলো দীর্ঘদিন ধরে অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিকল্পিতভাবে রয়েছে। তাই আমরা যথাসাধ্য পৌর নিগমের দপ্তরগুলোকে সাজিয়ে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছি। এতে পৌরকর্মীরা নিঃসন্দেহে কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন।

উন্নত নাগরিক পরিষেবা প্রদানের স্বার্থে রাস্তাঘাট নিকাশি ব্যবস্থা ও নর্দমা পরিষ্কার ও উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই খুব গুরুত্বসহ শুরু হয়ে গেছে। পরিশোধিত বিশুদ্ধ পানীয় জল আরও অধিক সংখ্যক নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। এ অভিযোগ আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি যে অনেক স্থানে জল প্রবাহের চাপ যথোপযুক্ত না হওয়ার জন্য নাগরিকরা জল কর দেওয়া সত্ত্বেও এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সমস্যার দ্রুত সমাধান করার চেষ্ট আমরা করব। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সহায়তায় প্রবীণ নাগরিকদের বাড়িতে বাড়িতে সরাসরি বিভিন্ন পরিষেবা আমরা প্রদান করছি। ইতিমধ্যেই গরীব মানুষের স্বার্থে মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে আমরা একটি 'মা ক্যানটিন' চালু করেছি এবং এ ধরণের ক্যানটিন শহরের আরো বিভিন্ন স্থানে চালু করবার প্রয়াস আমরা নিয়েছি। ২টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে শহরের মানুষকে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান করা হবে। শহরের রাস্তাঘাট

আলোকিতকরণের উদ্দেশ্যে 3 phase supply এর মাধ্যমে 200 no. P.C.C. Poles and Steel Tubler Poles প্রতিস্থাপন করা হবে। এ ছাড়া বেশ কিছু স্থানে High Mast লাইটও স্থাপন করা হবে। প্রতিটি লাইট পোস্টে অটোমেটিক টাইমার সুইচ বসিয়ে বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করা হবে। এছাড়া U.G. Cable এর প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে।

আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য জলের গাড়ির সংখ্যা ৫টি বাড়ানো হয়েছে। মৃতদেহ বহনের জন্য একটি ভ্যান গাড়ির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পরিবহন দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ হিসাবে প্রথম পর্বে জ্বালানি তেলের অপচয় বন্ধ করতে গাড়িতে জি.পি.এস সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। ১০টি ট্র্যাকটর, ২টি ফোর হুইল জেসিপি এবং ১০০টি জঞ্জাল অপসারণের গাড়ি ক্রয় করা হবে। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য সেখানে খুব শীঘ্র Organic Waste Management চালু করা হবে। নাগরিকদের আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য কনজারভেন্সি দপ্তরের প্রয়োজনে ২টি সেসপোল কেনা হবে। বাড়ি-ঘরের মিউটেশন ফি-এর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে মিউটেশন ফি ২শতাংশ থেকে কমিয়ে ১শতাংশ করা হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরে একটি মাত্র শ্মশান হওয়ায় এর উপর চাপ বেশি। তাই আমরা ঠিক করেছি, আরও একটা আধুনিক শ্মশান নির্মাণ করা হবে।

শিলিগুড়ি শহরে ঢুকতেই মাল্লাগুড়ি মোড়-এর দীর্ঘ দিনের যানবাহনজনিত যন্ত্রণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তৈরী হচ্ছে ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা ও সেতু। শিলিগুড়ির নাগরিকদের এ দাবী দীর্ঘ দিনের। এই শহরের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে শিলিগুড়ির সংস্কৃতিকে সজীব করে তোলার উদ্দেশ্য আমরা বিভিন্ন গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করব। রবীন্দ্র মিউজিয়াম নির্মিত হবে সূর্যসেন উদ্যানে। শক্তিগড়ে নির্মিত রবীন্দ্র ভবন কর্পোরেশনের অধীনে পরিচালিত হবে। শহর শিলিগুড়ির সৌন্দর্যায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। দার্জিলিং মোড়ে তেনজিং নোরগে মূর্তিটির সঠিক পরিচর্যাসহ তার সন্নিকটস্থ উদ্যানটির নবরূপায়ণ শুরু হয়েছে। এভাবে শিলিগুড়ির বুকে প্রতিস্থাপিত প্রতিটি মনীষীর মূর্তির যথাযোগ্য সম্মান ও যথাযথ রক্ষাণাবেক্ষণ করা হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ঘটা করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেই হয়না। সেগুলি নিয়মিত রক্ষাণাবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদান করতে হয়।

আমরা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী। তাই বোরো অফিসগুলোতে স্থায়ীপদে বোরো অফিসার নিয়োগ করে আরও ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক নাগরিকদের আরও সুষ্ঠ ও সরলতম পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে একটি উচ্চ পর্যায়ের রূপরেখা আমরা তৈরি করতে চলেছি। এক কথায় আমাদের এই প্রশাসক মন্ডলীর একমাত্র উদ্দেশ্য আরও বেশী করে উন্নত নাগরিক পরিষেবা প্রদান। বিগত বোর্ডের শাসনকালে শিলিগুড়ির নাগরিকবৃন্দ তাঁদের যে সকল ন্যায্য নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেগুলো যাতে তারা ভোগ করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। আমরা আনন্দিত যে মাত্র ক'এক মাসে আমরা যে সকল কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে তার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে চলেছি তা দেখে শিলিগুড়ির সুধী নাগরিকবৃন্দ আমাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। তবে আমরা আত্মতুষ্টিতে বিশ্বাসী নই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি - "A dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep."

-x-

প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য অলোক চক্রবর্তীর কলমে

দু'হাজার একুশের ৭ মে থেকে আজ, মাত্র আড়াই মাস।

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রিয়নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে রাজ্য সরকারের নির্দেশনামায় শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 'বোর্ড অব এডমিনিস্ট্রেটর-এর একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নিই।

আমার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর 'জল বিভাগ', 'হাউজিং ফর অল', 'গেস্ট হাউস' ইত্যাদি।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর জল বিভাগ-এর দায়িত্ব নিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিষ্ণুতা এবং অসহিষ্ণুতার সঙ্গী হয়ে উঠি। জল বিশেষজ্ঞ না হলেও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে জলসংকট ও তার সমাধানের পথ হাতড়ে অল্প কিছু জানার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি যে, মানুষের জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণে যতটা গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন ছিল তা না করে যথেচ্ছ পরিমাণ শিথিলতার দরুণ বর্তমানে নির্দ্বিধায় দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, অতীতে জল সরবরাহ বিষয়ে যথাযথ নজর দেওয়া হয়নি। বিগত প্রশাসনিক গাফিলতির দোহাই দিয়ে এড়িয়ে চলার মানসিকতা আমার নেই। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা ও দিশায় মানুষের সেবার সংকল্প নিয়ে স্থায়ীভাবে জলসংকট দূরীকরণের দিকে নজর দিই।

সহযোগী বোর্ড-চেয়ারম্যান ও বোর্ড-সদস্যদের, জলবিভাগের সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দের সহযোগিতা, পি.এইচ.ই বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের ও পুর কমিশনারের পরামর্শে কয়েকটি প্রকল্প বোর্ড সভায় গৃহীত হয়।

ভবিষ্যতে শিলিগুড়ি ও সন্নিবেশিত এলাকার বিরাট চাহিদা পূরণে 'মেগা জল প্রকল্প' অর্থৎে গজলডোবা থেকে জল এনে পরিশোধনের মাধ্যমে বৃহত্তর এলাকায় সরবরাহের জন্য মোট ৪৭০ কোটি টাকার প্রকল্প। উক্ত প্রকল্প রূপায়ণে সময়সীমা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় চার পছর।

ইত্যবসরে জনগণের জলের চাহিদা মেটাতে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট ১৭টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ পর্যায়ক্রমিকভাবে শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেকেটি ডিপ টিউবওয়েল থেকে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় জল সরবরাহ করা যাবে এবং এর জন্য আয়রণ প্ল্যান্টসহ প্রায় আড়াই কাঠা জমি এবং এক একটির জন্য প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ফুলবাড়িতে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট।

মহানন্দা ব্যারেজ থেকে ইনটেক গেট দিয়ে জল টেনে নিয়ে পরিশোধিত করা হয়। প্রায় ৩০/৩২ বছর আগে তৈরী মহানন্দা ব্যারেজ নিয়মিত দেখভালের (মেইনটেইন্যান্সের) অভাবে যে কোনো সময় লাগাতার জল বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল (পি.এইচ, ই-ইঞ্জিনিয়ারদের ও জল বিশেষজ্ঞদের অভিমত)। এছাড়া জলাশয়ের বালুস্তর জমা হয়ে থাকায় জলস্তর ক্রমশ কমছে।

পাহাড়ি নদী বলে তিস্তা ও মহানন্দা দিয়ে বর্ষায় বড় বড় কাঠের লগ (গুড়ি) ও পাথরের চাঁই ব্যারেজ লকগেটে আটকে আছে। গত বছর পরিষ্কার করতে গিয়ে চেইনসহ ক্রেন ভেঙে গেটে বালুস্তরের নিচে আটকে আছে। চেষ্টা করেও লকগেট পরিষ্কার করা যায়নি, কারণ ড্রাই করে কাজ করতে হলে জলসরবরাহ বন্ধ করতে হবে কয়েকটি দিন। তাহলে উপায় কি!!!

একটাই উপায়, যদি বর্তমান ইনটেক পয়েন্ট থেকে প্রায় আটশ মিটার দূরে তিস্তায় লকগেটে নতুন করে আরও ইনটেক গেট তৈরী করে ঐ পন্ড থেকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এ অল্টারনেটিভ (সমান্তরাল) জল নেবার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঐ অল্টারনেট গেট তৈরিতে খরচ পড়বে আনুমানিক ছয় কোটি নয় লক্ষ টাকা। পুর প্রশাসনিক বোর্ড সভায় উক্ত প্রোজেক্ট পাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্য দুইজন বোর্ড সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

উক্ত দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্যে ইতিমধ্যে রাজ্যের পুর প্রশাসনিক দপ্তর ও ভারপ্রাপ্ত মাননীয়া মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পি.এইচ.ই কর্তৃপক্ষের তৈরি ডি.পি.আর (ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট) রাজ্যের পুর দপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

উক্ত দুটি প্রোজেক্ট যথাযথভাবে রূপায়িত করার আবেদন জানিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এবার শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মাননীয় ও মাননীয়া নাগরিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানিয়ে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে একটি বাস্তব সম্মত বিষয় তুলে ধরছি —

পুর এলাকায় কোথাও অনিচ্ছাকৃত বিভিন্ন কারণে জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে পুর কর্পোরেশনকে দোষারাপ করা হয়ে থাকে, কিংবা কোথাও কর্পোরেশন কর্মীদের রোষাণলের শিকার হতে হয়।

জল না পাওয়ার কষ্ট বা অসুবিধার কথা মেনে নিয়ে সকলকেই জানাতে চাই যে, সুচারুভাবে পুর এলাকায় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইরিগেশন দপ্তর, পি.এইচ.ই দপ্তর, পি.ডব্লু.ডি., বিদ্যুৎ দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভা-র যৌথ পরামর্শ ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সেই কারণে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির যোগ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে। বিগত দিনে এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই।

রাস্তায় কিছু কিছু জলের কল থেকে দুষ্কৃতী কর্তৃক ট্যাপ চুরি হয়ে যাওয়ায় অনবরত জলের অপচয় বন্ধ করতে ওইসব এলাকায় সুধী নাগরিকদের আরো বেশী নজরদারি রাখার অনুরোধ রাখছি। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ন্যাফ' এর নজরদারি সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছে যেন কোন অবস্থাতেই নাগরিক পরিসেবা বিঘ্নিত না হয় । 'হাউজিং ফর অল' বিভাগ হাতে নেবার পর দেখলাম ২০১৬-২০১৭ থেকে প্রতি বছর বছর বিলো প্রভার্টি গৃহহীন মানুষকে সরকারীভাবে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা চার কিস্তিতে দেবার কথা থাকলেও প্রায় প্রতি বছর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপভোক্তাদের কাজের যথাযথ তদারকির অভাবে পাহাড় প্রমাণ কেস জমে ছিল। আমাদের পুরবোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে পৌরকমিশনার ও সুপারেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এক তদন্ত কমিশন গঠন করে ঐসব জমে থাকা কেসগুলোর বেনিফিসারিদের টাকা দিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি আবেদনকারীদের ও পর্যায়ভিত্তিক টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে মিটিয়ে দেবার কাজ তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে সুডা-র কাছ থেকেও বিগত বছরগুলোর জন্যে আরো প্রায় আট কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এ ব্যাপারে বোর্ড চেয়ারম্যান ও অন্যান্যদের সহযোগিতা প্রশংসার দাবী রাখে।

গেস্ট হাউস প্রসঙ্গে —

শিলিগুড়ির মানুষদের জন্য কলকাতার বেলেঘাটায় যে গেস্টহাউস রয়েছে তার পাশে আরো একটি গেস্টহাউস তৈরির পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত করা হয়নি। এই মাস দুয়েকের সময়সীমায় আমাদের পুরবোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারম্যানের বিশেষ উদ্যোগে ঐ গেষ্ট হাউস নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। শিলিগুড়িতেও কিরণচন্দ্র ভবনের সংস্কার চলছে।

কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগের কাজে সেভাবে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে উন্নততর পরিষেবার দিকে নজর রেখে বর্তমান পুরবোর্ড সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। এক কথায় বলতে হয়, রাজ্য সরকারের নির্দেশিত পথে মানুষের সেবার কাজ তরান্বিত করতে বর্তমান পৌর প্রশাসনিক বোর্ড ও সর্বস্তরের পৌর কর্মচারিবৃন্দ বদ্ধপরিকর।

চলার পথে শিলিগুড়ির মানুষের গ্রহণযোগ্য উন্নয়নমূলক প্রস্তাবের আশা করে আজকের লেখায় ইতি টানছি।

सिलीगुड़ी नगर निगम : अतीत, वर्तमान और भविष्य चुनौतियां और समाधान

० विवेक बैद

- सदस्य, प्रशासक बोर्डसिलीगुड़ी नगर निगम

टी, टूरिज्म, टिम्बर के साथ ट्रांसपोर्टेशन (आवागमन) के लिए प्रसिद्ध सिलीगुड़ी की अवस्थिति इसे खास बनाती है। हिमालय की तलहटी में दार्जिलिंग जिले में महानंदा नदी के किनारे बसा सिलीगुड़ी शहर जहां एक ओर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जाने हेतु प्रवेश द्वार है, वहीं बंगलादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों की अन्तराष्ट्रीय सीमाएं भी इसके नजदीक हैं। अशांत भारत-चीन सीमा भी इससे अधिक दूर नहीं है। साथ ही यह बिहार, झारखंड और असम राज्यों की सीमाओं से भी नजदीक है। ऐसे में देश के मानचित्र पर यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के नाम से प्रसिद्ध है जो इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। यही कारण है कि शहर के आस-पास के बाहरी इलाकों में कई सेना छावनियां स्थापित हैं। सिलीगुड़ी की अवस्थिति ऐसी खास है कि यहां से एक घंटे में घने जंगलों में तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी जाया जा सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह नगर काफी विकसित हुआ है और हो रहा है। साथ ही अनुकूल जलवायु

भी इसे रिहाईश के लिए लोगों का पसंदीदा बनाती है। दार्जिलिंग पहाड़ तथा विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) की परिचालन तथा आस-पास के पहाड़ी एवं डुआर्स के जंगलों के अनगिनत पर्यटन स्थल पर जाने के लिए सिलीगुड़ी से होकर ही गुजरना पड़ता है। यही खूबियां इसे राज्य की राजधानी कोलकाता के बाद दूसरा बड़ा शहर बनाती है।

1950 में सिलीगुड़ी नगरपालिका की स्थापना हुई। तब इसका क्षेत्रफल 15.54 वर्ग किमी. था और जनसंख्या का घनत्व भी यहां कम था। धीरे-धीरे सिलीगुड़ी शहर का स्वरूप बढ़ा और 1994 में सिलीगुड़ी नगर निगम की स्थापना हुई। आज सिलीगुड़ी नगर निगम का क्षेत्रफल 41.90 वर्ग किमी. है। कुल 47 वार्डों वाले सिलीगुड़ी नगर निगम में दार्जिलिंग के अलावा जलपाईगुड़ी जिले के 14 वार्ड भी शामिल हैं। वहीं समूचे सिलीगुड़ी महकमे में चार प्रखंड-माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, फांसीदेवा और खोरीबाड़ी-शामिल हैं। सिलीगुड़ी महकमे में सिलीगुड़ी नगर निगम के अलावा कई ग्राम पंचायत आते हैं। वर्तमान में सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कई थाने हैं। देश की आजादी के बाद से ही लोगों ने सिलीगुड़ी क्षेत्र के महत्व को समझा और यहां बसावट में वृद्धि होने लगी। उसके बाद भारत-चीन युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध और बंगलादेश के अस्तित्व में आने के बाद काफी संख्या में लोग यहां आये। पिछले दो दशकों में सिलीगुड़ी की जनसंख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। आज इस शहर में 10 लाख से ज्यादा लोगों का निवास है। इसमें इस क्षेत्र के मूल निवासियों के साथ ही बाहर, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से आकर बसे लोगों की अच्छी-खासी संख्या है। समय के साथ-साथ जनसंख्या के दबाव के कारण सिलीगुड़ी का काफी विस्तार हो गया है। समयकाल में अनियोजित रूप से शहर के बढऩे से कई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई

हैं। इसमें यातायात, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य परिसेवाओं की सुचारू व्यवस्था शामिल हैं।

ऐसे में महानगरी का स्वरूप ले रहे सिलीगुड़ी नगर को अब व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सिलीगुड़ी को नगरपालिका से नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुए 27 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान नगर निकाय प्रशासन द्वारा नागरिक परिसेवा और शहरी प्रशासनिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जाते रहे हैं। लेकिन सिलीगुड़ी नगर निगम एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में अभी भी विकास की व्यापक सम्भावनाएं हैं। इसे देखते हुए वृहत्तर सिलीगुड़ी की अवधारणा को केन्द्रित करते हुए दीर्घावधि सुव्यस्थित योजना पर काम करने की जरूरत है।

किसी भी शहर के विस्तार या उसके वृहत्तर शहरीकरण में आम तौर पर हम देखते हैं कि पुराने शहर के विकल्प के साथ उसके आस-पास के छोटे एवं सम्भावना वाले स्थानों को शामिल किया जाता है। पुरानी और नयी दिल्ली, कोलकाता के पास नये उपनगर, मुम्बई और नवी मुम्बई इसके उदाहरण हैं। वर्तमान में सिलीगुड़ी शहर की स्थिति भी कमोवेश यही है। पिछले दो दशकों के दौरान हम देखते हैं कि शहर में हुए तेज विस्तार में कृषि योग्य एवं वन भूमि का भारी उपयोग हुआ है और यह अभी भी हो रहा है। कहना न होगा कि इससे पर्यावरण संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार तेज शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण 2025 तक सिलीगुड़ी की जनसंख्या 20 लाख और 2040 तक शहर का क्षेत्रफल 98 वर्ग किमी. तक हो सकता है। ऐसे में व्यवस्थित शहरीकरण हेतु एक प्रभावी एवं सतत योजना की आवश्कता है। इस दिशा में सिलीगुड़ी शहर के आस-पास के पंचायत इलाकों जैसे माटीगाड़ा, बागडोगरा, डाबग्राम-फुलबाड़ी, चम्पासारी, बिन्नागुड़ी आदि को भी नगर निगम इलाकों में

शामिल कर यहां व्यवस्थित विकास कार्य किये जा सकते हैं। ऐसा करने से जहां सिलीगुड़ी शहर का व्यवस्थित विस्तार होगा, वहीं नगर निकाय प्रशासन के अंतर्गत आने से नये-नये इलाकों का भी तेजी से विकास होगा। इसके लिए आगामी 10-20 वर्षों की वृहद् विकास योजना बनाकर आगे बढना होगा।

वर्तमान में सिलीगुड़ी शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण यातायात की समस्या प्रमुख है। जनसंख्या की अपेक्षा खुली व चौड़ी सड़कों की कमी, वाहन पार्किंग की अव्यवस्था व अवैध पार्किंग और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण इसका मुख्य कारण हैं। व्यवसायिक गतिविधियों की अधिकता, सघन बसावट, निजी दोपहिया-चारपहिया तथा धीमी गति से चलने वाले वाहनों की अधिकता से सड़क परिवहन को धीमा कर दिया है। इसके विकल्प के तौर पर नये सड़क बनाने की आवश्यकता है। वहीं कृषि योग्य एवं वन भूमि के अंधाधुंध उपयोग रोकने हेतु भी योजनाबद्ध कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन, नदियों का सुधार, स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी, उन्नत नागरिक परिसेवा मुहैया कराने की दिशा में भी कार्य किया जाना है। साथ ही शहर को साफ-सुथरा और प्रदूषण कम करने हेतु आमलोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। इस दिशा में शहर की सड़कों को जहां एक ओर अधिक से अधिक पैदल चलने लायक बनाना होगा, जिससे कि छोटी दूरी तय करने के लिए लोग पैदल ही जा सकें। इसके अंतर्गत अधिक दूरी हेतु निजी वाहनों के अधिक उपयोग की अपेक्षा लोगों को सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा वृहत्तर सिलीगुड़ी शहर को कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने से बचाने हेतु अव्यवस्थित रूप से भवन निर्माण को रोकना की दिशा में भी कार्य करना होगा।

राज्य के पूर्व पर्यटन मंत्री श्री गौतम देव के नेतृत्व में सिलीगुड़ी नगर निगम का मौजूदा

प्रशासक बोर्ड इस दिशा में कार्यरत है। शहर की सड़कों पर से यातायात का दबाव कम करने के लिए नये वैकल्पिक सड़क तैयार करने की पहल की गयी है। इसके लिए महानंदा नदी के किनारे से एक नयी सड़क बनाये जाने हेतु सर्वे कराये जाने की घोषणा की गयी है। वहीं यातायात की समस्या से निजात हेतु शहर के बीचोंबीच स्थित बस अड्डो को शहर के बाहर स्थानान्तरित करने, वेस्ट मैनेजमेंट हेतु डम्पिंग ग्राउंड में कचरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ नगर निगम से प्राप्त होने वाली नागरिक सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के कार्य किये जा रहे हैं। इसमें नये ट्रेड लाइसेंस तैयार करने, भवन निर्माण सम्बंधी नक्शे तैयार करवाने, जन्म-मुत्यु प्रमाणपत्र की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गयी है। इसके अलावा सम्पत्ति कर जमा करने, जमीनों का म्यूटेशन आदि नागरिक परिसेवाओं को भी ऑनलाइन करने का काम प्रस्तावित है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि सिलीगुड़ी शहर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में इतनी सम्भावनाएं हैं कि यह उत्तर बंगाल में राज्य की अघोषित राजधानी मानी जाती है। बस अब जरूरत 'वृहत्तर सिलीगुड़ी' को मूर्त रूप लेने की है।

"If Ganges is the mother, Himalayas is the father. One nurtures and nourishes, the other provides and protects."

A Strategic Approach towards Sustaining the Himalayan Ecosystem

Sonam Wangdi Bhutia
Commissioner, S.M.C[1]

As awe-inspiring as the Himalayas may seem, they are also very fragile owing to their complex topography, climatology and tectonic activities. In recent years, attention to mountains as a key area of the planet has grown rapidly because of spectacular and dramatic indicators of climate change, such as receding glaciers and overflowing glacial lakes. Mountains are very fragile environments subject to adverse and harsh climatic conditions and natural disasters. Their ecosystems are highly vulnerable to human and natural ecological imbalances, which are faster, larger and more difficult to correct than imbalances in plain regions. For example, over the last 50 years, the average temperature increase per decade on the Tibetan Plateau has been in the range $0.2^0$to 0.6^0. Another example would be the cloudburst on 6th August 2010 in the Leh district which flooded many villages, killing 233 persons and washing away thousands of houses and hectares of irrigated land and dispersing livestock. The catastrophe was due to the longest winters ever witnessed in the region. Just like other parts of this great mountain range, the Darjeeling Himalayan region is also experiencing unusual climatic phenomena. The West Bengal State Action Plan for Climate Change has observed that over the last 50 years the average minimum temperature has increased by 1.5^0C in Darjeeling Himalayas. This is dangerous because it indicates that days are getting hotter as the years roll on. Consequently, it is expected that a decline in size and quality of citrus fruits such as mandarin oranges will be observed due to rising minimum temperature during the flowering season of citrus trees. It is also expected that the increase of temperatures during the winter season will affect the cultivation of potatoes and wheat. On the other hand, maximum rainfall is expected to increase by 1 mm per day. This will lead to catastrophic damages to the area in the form of landslides and erosions.

The vulnerability of the region is expected to increase in the event of climate change induced by unregulated anthropogenic activities. The Darjeeling Himalayas not only harbor

forests and biodiversity but also regulate water flow for the entire North Bengal region. However, climate change is acting as the deterrent which is negatively affecting the water balance of the region. Greenhouse gas emissions and air pollution from the Terai Plains and surrounding regions makes the situation worse by depositing black carbon and dust in the ecosystem which does not allow the environmental systems to operate properly. It is projected that reductions in the pre-monsoon river flows and changes in the monsoon will hit hardest, throwing regional water systems, food and energy production off kilter[2]. Impacts on people in the region, already one of the world's most fragile and hazard-prone mountain regions, will become beyond manageable if the situation is allowed to progress without any sort of management. The impacts that the scientists are worried about will not only adversely affect those living in the mountains, but also the people living in the river valleys and plains below, who are vulnerable to flooding and the destruction of crops. As emissions rise, thereby intensifying climate change, insect proliferations which damages the tea plant have increased. Lack of precipitation during dryer winters and unseasonal inundations during plucking seasons have drastically changed the harvesting window, reducing an eight month harvest period to just six. Prolonged droughts and erratic rainfall have resulted in shrinking yields where within a span of 30 years production has fallen from 16 million kilograms to about 8 million kilograms[3].

The Himalayas is one great entity. This implies that activities which negatively affect one part of the Himalayas will eventually spread to other parts and thereby increase the adverse impacts exponentially. On the other hand, activities which help the sustainability cause of the Himalayas, will also similarly spread from one part to another and thereby, help maintain the ecosystem balance. With this principle in mind, Siliguri Municipal Corporation (SMC) has initiated small and targeted initiatives to combat climate change, which aims to reduce the region's vulnerability of sporadic climatic events, and to make the region ecologically resilient. These initiatives of SMC are a small part of a much larger programme of the Government of West Bengal for combating the adverse impacts of climate change on the infrastructure in the region. Towards this special attention needs to be spared to the fact that Siliguri is the first city in India to prepare a comprehensive climate change mitigation and adaptation plan for Siliguri, called the Climate Resilient City Action Plan. At the same time, the city has advocated the case of Darjeeling Himalayan ecosystem at different national and international workshops. Chief among such workshops was the ASEAN-India Workshop on Urban Biodiversity, organized in Singapore by the National Biodiversity Authority in collaboration with the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Ministry of External Affairs (GoI), ASEAN Centre for Biodiversity,

Manila, and ASEAN Secretariat, Jakarta. The theme of the workshop was "Capacity building towards implementing the Nagoya Protocol and Access and Benefit Sharing, the City Biodiversity Index, and the Strategic Plan on Biodiversity". Apart from advocating the case of sustainable development in the region, as a learning the City Biodiversity Index was prepared for Siliguri, and enhanced importance has been emphasized in various State government missions regarding the importance and value of biodiversity thriving in the Darjeeling Himalayan region.

It should be noted that sustainability is the set of relations between human activities with their fast dynamics and the biosphere with its generally slower dynamics. These relations must be such as to permit human life to continue in time, for individuals to satisfy their needs and for the different human cultures to develop, but in such a way that changes to nature caused by human activities remain within limits and do not destroy the biophysical context. The process of environmental degradation can only be slowed down by re-establishing an agreement with biological equilibrium and with the complexity of natural systems. From a biological point of view, many agree that increased complexity and diversity of genetic information increases ecosystem stability. In the global climate change context, the entire Himalayan range continues to be a region about which little is known in the scientific domain and remains largely understudied. This has made it difficult to understand the current situation and also to try and project what the future holds. To understand these things, disciplines must be combined. A general integration of scientific disciplines, humanities, social sciences, economics and law is the need of the hour. Even more important is adequate representation of the indigenous dwellers in policy making. Short term considerations, insensitivity to the limitations of the local resource base, and a mismatch between mountain features and human driving forces is causing widespread environmental degradation and long term unsustainability in the region. For instance, soil formation and plant growth are very slow in high mountains and if any damage occurs, it may only be reversible over a very long period or in some cases irreversible. Coupled with limited access, many mountain regions have remained protected areas of cultural integrity (like religion, festivals, language, local food etc) and natural heritage (like biological diversity and high degrees of endemism etc) that can become target areas for recreation and tourism, leading to opportunities for off-farm income and economic growth.

However, this increased and accelerated contact with the outside is eroding the social and cultural integrity of mountain societies and causing environmental impact. Thus, all three components, economic, social and environmental, are extremely important in mountain areas where imbalances in any one can have significant impact on the others. Sustainable development policy, hence, must consider the so called "mountain specificities", which can only be achieved

through adequate representation of the indigenous population in policy making and decision making bodies.

In conclusion, it can be said that despite increased documentation of climate change and its impacts at the global level, urban and rural, very little is known about the regional vulnerabilities in the Darjeeling Himalayan context. Given the data scarcity in this region, all the stakeholders should attempt collective research to comprehensively synergize to maximize utility of various available information, knowledge, and datasets developed in the region. With the amalgamation of newer scientific approaches based on empirical evidences, along with traditional knowledge from different communities, an integrated multi-disciplinary and multisector approach should be initiated. This will ultimately allow us to better inform and execute conservation and adaptation planning throughout the mountain belt. Although, climate change is considered for planning initiatives in the context of the whole region, however, they remain at the gross macro level based systems approach, missing out on the localized context of the issues. The failure of such approaches are often associated with lack of integration of ecosystem services of local planning in the adaptation processes. Adopting flexible adaptation policies, with adjustment from different stakeholders, is imperative to continuously benefit from the various goods and services provided by this region. In this regard institutional arrangements with support from regional bodies and local communities would guarantee judicious as well as sustainable environmental and biodiversity resource management. These efforts will help the decision makers to strategically plan and delegate adaptation and mitigation measures for managing forest resources and dependent livelihood options across the Himalayan region under different climate change scenarios.

---

1. The author is the Commissioner, Siliguri Municipal Corporation, and the Special Secretary to the Government of West Bengal

2. BBC. 2019. “Climate change: Warming threatens Himalayan glaciers”. Article by Matt McGrath Url: https://www.bbc.com/news/science-environment-47122641 Date accessed: July 16, 2021

3. The Economic Times. 2021. “Brewing Sustainability: How to safeguard India's Darjeeling tea industry from climate change”. Article by Rajah Banerjee. Url: https://economictimes.indiatimes.com/news/et-evoke/brewing sustainability-how-to-safeguard-indias-darjeeling-tea-industry-from-climate change/articleshow/84272572.cms?from=mdr Date accessed: July 16, 2021

পূর্ব মোরঙ্গ - পশ্চিম বৈকুন্ঠপুর-তরাই-শিলিগুড়ির স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত

আনন্দ গোপাল ঘোষ

লেখার দীর্ঘকায় শিরোনাম দেখে মনস্ক পাঠকদের একাংশ ভ্রূ কুঞ্চিত করবেন অনুমান করছি! এটি-ই স্বাভাবিক। সত্যি তো এতো দীর্ঘকায় শিরোনাম হয় না কি? আমি তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সুবিনীতভাবে জানাই যে, দরদির কাঁচি ব্যবহার করেও শিরোনামকে ছাঁটকাট করতে পারিনি। এটি আমারই অপরাগতা। তবু সহৃদয় পাঠককে জানাতে চাই যে, যা বলতে চাই তা সুস্পষ্টভাবে পাঠক সমাজের নিকট তুলে ধরার জন্য আমার অন্য কোন বিকল্প ছিল না। শিরোনামে ব্যবহৃত ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির পরিচয় তুলে ধরলে পাঠক বুঝতে পারবেন কেন এই দীর্ঘকার শিরোনাম। এই পরিচয় জানার জন্য আমাদেরকে একটুখানি ইতিহাসের উজানে পাড়ি দিয়েও ছ'শো বছরের বেশি এগোতে পারবনা! অর্থাৎ পূর্ব মোরঙ্গ তার খোলনলচে পাল্টে আজকের শিলিগুড়ির রূপ নিয়েছে। তবে বৃহত্তর শিলিগুড়ি শব্দদ্বয় গত শতকের আটের দশক থেকে প্রবুদ্ধ সমাজের একাংশ ব্যবহার শুরু করেছেন। Greater Siliguri Plan শীর্ষক একটি Brochure দেখেছিলাম। মানচিত্র সহ বৃহত্তর শিলিগুড়ির উন্নয়নের একটি রূপরেখা তাতে তুলে ধরা হয়েছিল। যাইহোক মোরঙ্গ-এর পূর্বে শিলিগুড়ি কী নামে পরিচিত ছিল সে ব্যাপারে পুরাণ-প্রত্ন-ইতিহাস সবই নীরব। এমনটি কেন হয়েছিল, তা অব্যাখ্যাত এখনও! যাই হোক পূর্ব মোরঙ্গের পরে বৈকুন্ঠুপুর রায়কত রাজবংশ অঞ্চলটি শাসন করেছিল। কিন্তু রায়কত রাজাদের রাজ্যের পূর্বাংশ জলপাইগুড়ি নামে পরিচিতি পেয়েছিল। আর পশ্চিমাংশ শিলিগুড়ির অংশ হয়ে পড়েছিল। রায়কতদের পরে অঞ্চলটি তরাই নামে পরিচিতি পেয়েছিল। শব্দতত্ত্ববিদ্‌দের মতে তরাই শব্দটি ফার্সী ভাষার। অর্থাৎ ভাষা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, ইতিহাসের একটি পর্বে তরাই মুসলিম তথা মোঘল শাসকের অধীনে ছিল। তবে সেটি নিম্নতরাই কিনা (Lower) বলা যাচ্ছে না। এখানে নিম্ন তরাই অর্থ মহানন্দা-মেচির মধ্যভূমি। তবে তরাই ভৌগোলিক নামটি সর্বভারতীয়। অর্থাৎ হিমালয়ের তলই হলো তরাই। এই তরাই নামকে পেছনে ফেলে অখ্যাত গ্রাম-নাম শিলিগুড়ি হয়ে গেল তরাইয়ের নাম। তবে তরাই বৈকুন্ঠপুরের মতন ইতিহাসের পাতায় চলে যায়নি। তরাই নামের বহু সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, ক্লাবই তার প্রমাণ। আর বৈকুন্ঠপুর থেকে গেল বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশন নামে। ইতিহাসের গ্রীক দেবী ক্লিওর (Clio) এই পরিহাস বেদনাবহ হলেও আমাদেরকে মেনে নিতে হচ্ছে। বৈকুন্ঠপুর রাজ্য মুছে গেল! আর তাকে মুছে এগিয়ে এলো শিলিয়াগুড়ি, শালিগ্রি, শিলয়াগুড়ি, শিলগড়ি নামের এক গ্রাম আজ শিলিগুড়ি মহানগর নামে পরিচিত। স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে সে মহকুমার সদর প্রশাসনিক দপ্তর হলেও সে ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। এই ইউনিয়ন বোর্ডের স্বাধীনতা

আন্দোলনের ইতিবৃত্ত-ই এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করবো। স্বাধীনতা আগামী বছরে অমৃত জয়ন্তী বর্ষে অর্থাৎ পাঁচাত্তর বছরে বা তিনকুড়ি পনেরো বছরে পদার্পণ করবে। স্বাধীনতার অমৃত জয়ন্তী মহাসমারোহর প্রাক্কালে এই ইতিবৃত্ত রচনা করছি উত্তরসূরীরা যাতে তথ্যভিত্তিক স্বাধীনতার মহাকাব্য রচনা করতে পারে।

(দুই)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমার্থক ভাবাটা অনৈতিহাসিক। কারণ জাতীয় কংগ্রেস যাত্রার আদিপর্বে স্বাধীনতা বা ইংরেজ শাসনের বিরোধিতার লক্ষ্য ছিল না। কালক্রমে জাতীয় কংগ্রেসের গঠন, আদর্শ, কর্মপ্রণালী পরিবর্তিত হয়ে সে স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপত্র ও মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ সময়ের ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কংগ্রেস নিজেকে ভেঙে ভেঙে তৈরি করেছিল। এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই ভারতীয় ইতিহাসজ্ঞরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বর্ষকেই ভারত-চেতনার আরম্ভিক পর্ব হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। এই সাধারণ সূত্রকে মেনে নিয়েই আমরা অবিভাজিত ভারতীয় উপমাহাদেশের এক অখ্যাত ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলের রক্তে লেখা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত রচনার প্রয়াস নিয়েছি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে স্থাপিত হলেও হিমালয় সানুদেশেস্থিত দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলের তরাই-শিলিগুড়িতে এর শাখা কবে স্থাপিত হয়েছিল তার সুনির্দিষ্ট বছর ও তারিখ এখন পর্যন্ত মেলেনি। তবে দার্জিলিং জেলার কংগ্রেসের প্রথম শাখা স্থাপিত হয়েছিল কালিম্পং শহরে এবং ১৯২৫ সালের শেষ নাগাদ। প্রবীণ আইনজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার বসু ১৯৩১ সালে 'Liberty' পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে এই কথাগুলি লিখেছিলেন। এ সম্পর্কে অন্য কোন বিকল্প তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে আসেনি। কোনো অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি এ ব্যাপারে নতুন তথ্যের সন্ধান দিতে পারেন তাহলে প্রদ্যোৎ বসুর লেখার উপর তর্ক-বিতর্ক- প্রতর্ক হতে পারে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাখা শিলিগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড - মহকুমায় অনেক দেরিতে স্থাপিত হলেও এখানকার লোকেরা রাজনৈতিকমনস্ক ছিল না; একথা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। অবশ্য বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও সাংসদ শ্রী সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে শিলিগুড়িকে 'অরাজনৈতিক শহর' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করবো। শিলিগুড়ির মানুষ অরাজনৈতিক ছিল না, তার পক্ষে কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত Indian Association নামীয় রাজনৈতিক সংগঠনের শাখা স্থাপিত হয়েছিল দার্জিলিঙে। এই সংগঠনের নেতৃদ্বয় বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ ও বাবু দ্বারাকানাথ গাঙ্গুলি ১৮৮৩ সালে

দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন প্রচারের কাজে। কিন্তু মজার কথা হলো এ বছরেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত National Conference এর অধিবেশনে শিলিগুড়ির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এটি National Conference-র কার্যবিবরণীতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে কারা প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বা তাঁদের নাম সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন একটু দেরিতে শুরু হলেও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, তা মনে হচ্ছে National Conference-এর অধিবেশনে অংশগ্রহণ থেকে।

এবারে প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের মন্তব্য প্রসঙ্গে আসছি। তাঁর মন্তব্যের উত্তর খোঁজার জন্য শিলিগুড়ির জনবিন্যাসের আলোচনা জরুরি। সেটি হলো শিলিগুড়ি মহকুমার সদর দপ্তর ফাঁসিদেওয়া হওয়ার সময় থেকেই পূর্ববঙ্গীয় বাঙালিদের আগমন ঘটে। আর রেললাইনের সূত্রে উত্তর বিহারের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগসূত্র স্থাপিত হলে বহু বিহারি শিলিগুড়িতে কর্মের সন্ধানে এসেছিলেন। আর চা-বাগান সূত্রে তরাই অঞ্চলে এসেছিল আদিবাসীরা। নেপালিরা চা-বাগানের কাজের জন্য দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন, তরাই অঞ্চলে নয়। শিলিগুড়ি তরাই অঞ্চলে নেপালিদের বসতি গড়ে উঠেছিল ১৯২০ সালের পরে। আর বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত রাজবংশের শাসনের সময় শিলিগুড়ি-বৈকুণ্ঠপুর অংশে ও তরাইয়ে গ্রামাঞ্চলে রাজবংশীদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এরূপ একটি বিভিন্ন ভাষীর বিভিন্ন অভিবাসী ও বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অঞ্চলে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠা সহজ ছিল না। এটি ঠিক জলপাইগুড়িও অভিবাসী নগর, কিন্তু এই অভিবাসীদের আশি শতাংশই ছিলেন এক ভাষার ও এক ধর্মের। জাতীয় চেতনা গড়ার ক্ষেত্রে ভাষা ও ধর্মকে কোনোভাবে লঘু করে দেখেননি সমাজবিজ্ঞানীরা। আর ভারতের মতন উপ-মহাদেশে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আজও কিন্তু শিলিগুড়ি মহানগর এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। Cosmopolitisation শিলিগুড়ির আর্থিক উন্নতির সহায়ক হলেও সংস্কৃতি-সংহতি- বাঙালিয়ানার ক্ষেত্রে একটি মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ মহানগরটিকে যাঁরা আপন করে নিয়েছিলেন তাঁরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলেছেন। নিকট ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করবে বলে প্রবুদ্ধ সমাজ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এমনতরো সমস্যা অবশ্য পরিশ্চমবঙ্গ ছাড়া কোন রাজ্যের কোন নগর-মহানগরে আছে, সে তথ্য এখনও পাইনি। অনেকটা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছি, তবে সমস্যা যেহেতু জ্বলন্ত, তাই এড়াতে পারছি না।

(তিন)

শিলিগুড়িতে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে। এই শাখা স্থাপিত হওয়ার পিছনে যার উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল তিন হলেন বরিশাল জেলার জননন্দিত ব্যক্তিত্ব সতীশ সেন।

পুরবার্তা ২০২১

শিলিগুড়ি কংগ্রেস কমিটি সতীশ সেনকে শিলিগুড়ি শহরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি দার্জিলিং জেলা থেকে মুক্ত হয়ে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে এলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। শিলিগুড়ির কংগ্রেস দপ্তর স্থাপনের জন্য দেও নারায়ণ সিং ও শিউনারায়ণ সিং অর্থ প্রদান করেছিলেন। আর সতীশ সেন মহাশয় কংগ্রেস ভবনটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি একটি জনসভায় ভাষণও দিয়েছিলেন। সতীশ সেন মহাশয়ের আগমনের এক সপ্তাহ পরেই ৯ এপ্রিল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করেছিল। তিনি উপস্থিত কংগ্রেস কর্মীদের করাচি কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সমূহ ব্যক্ত করেন। কংগ্রেস কর্মীরা তামাক ও সিগারেট বিক্রি বন্ধ করার জন্য প্রচার করেছিলেন। অনেক ব্যবসায়ী তাঁদের তামাকজাত দ্রব্য শিউমঙ্গল সিং-এর নিকট জমা দেন। বিদেশী বস্ত্র যাতে ব্যবসায়ীরা বিক্রি না করেন তার জন্য দোকানদার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। কংগ্রেস কর্মীরা শুধু শিলিগুড়ির অভ্যন্তরে প্রচার করেন নি। তাঁরা তরাইয়ের গ্রামাঞ্চলেও প্রচার করেছিলেন। আঠারখাই গ্রামে তাঁরা একটি সভার আয়োজন চালিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় দু'শো লোক জমায়েত হয়েছিল। ভাবা যায়! ১৯৩১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি আঠারোখাইয়ের মতন গ্রামে দু'শো লোক জড়ো হওয়া কম কথা নয়। এর পরেই গান্ধীজি এসেছিলেন শিলিগুড়িতে দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে। ১৯২৫ সালের ৯ জুন গান্ধীজি যখন দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলেন তখন শিউমঙ্গল সিং তাঁকে একদিন শিলিগুড়ি অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। গান্ধীজি সে অনুরোধ রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে গান্ধীজির সচিব মহাদেব দেশাই একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন তাঁর Diary-তে। তিনি লিখেছেন 'In Siliguri also we came accross another solitary friend working away with the quite faith and dogged zeal. He was a Behari. When we were going to Darjeeling, he had ... from Gandhiji a promise to give him an hour on our return journey. He was simply mad with joy. He has pre-arranged two lovely meeting for Gandhiji. The frame of the house he was building was ready by then and he had fixed wooden boards in it for Gandhiji's halt. He had also kept ready with him a purse of rupees 450/- collected from his village."

শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের শাখা দেরিতে স্থাপিত হলেও ছাত্র সংগঠন কিন্তু পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে শিলিগুড়িতে Darjeeling District Students Association একটি সংগঠনের খবর পাচ্ছি। কিন্তু উৎসাহী কর্মীর অভাবে এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩১ সালে All Bengal Students Association-র সভ্য সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার সংগঠনটি পুনরায় চালু করেছিলেন। ক্ষিরোদনাথ চট্টোপাধ্যায় (K.N.

Chatterjee) এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে এখনও কিছু জানতে পারিনি।

যাইহোক গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন দার্জিলিং শহর, কার্সিয়াঙ ও কালিম্পঙে দলবাহাদুর গিরির প্রভাবে শুরু হলেও শিলিগুড়িতে এই আন্দোলনের দুটো প্রক্ষিপ্ত ঘটনা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম খবরটি মাটিগাড়া হাট লুঠের। গত ২৪ জুন ২০২১ সালের The Statesman পত্রিকার 100 years Ago কলামে মাটিগাড়া হাট লুঠের খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ খবরটি ১৯২১ সালের ২৪ জুন The Statesman সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই হাট লুঠের প্রসঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় যুবক লবণ সিং-এর নাম জানা যায়। সে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত। স্থানীয় লোকেরা লবণ সিংকে 'স্বদেশী ডাকাত' বলতেন। লবণ সিং অবশ্যই শিউমঙ্গল সিং-র দেশ ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে দুজনের পথ আলাদা ছিল। একজন গান্ধীবাদী অহিংস আর একজন বিপ্লববাদী সহিংস। ইংরেজ সরকার লবণ সিংকে পরে অবশ্য জেলে পুরেছিলেন। যে দিন শিলিগুড়ির আদালতে লবণের বিচার ও শাস্তি হয়; সেদিন আদালত প্রাঙ্গণে বহু লোক জড়ো হয়ে এর প্রতিবাদ করেছিল। এ প্রসঙ্গে মানে হাট প্রসঙ্গে একটি কথা এ প্রজন্মের পাঠককে জানানো দরকার। তরাই, ডুয়ার্সের চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সাপ্তাহিক হাট বসতো। এই হাটে চা-শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ সকলেই সওদা করতে আসতেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক রণজিৎ দাশগুপ্তের 'Economy, Society, Politics in Bengal : Jalpaiguri 1869-1947' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। এই সব হাট শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল না, রাজনৈতিক কর্মকান্ডেরও অভিকেন্দ্র ছিল। তরাইয়ের গ্রামগুলি পূর্ববঙ্গের গ্রামের মতন সংহত (integrated) গ্রামে নয়। এখানে জোতদার ও গিরিকে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট গ্রাম, যা এখানে জোত নামে পরিচিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও প্রাকৃতিক কারণে লোকের যাতায়াত কম ছিল। তাই রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তি সকলেই হাটের টিনের চোঙায় তাঁদের প্রচার কার্য চালাতেন। এই অঞ্চলে দুটো ঋতুর মেজাজ অনুভব করা যেত। শীত ও বর্ষা। তবে মাটিগাড়া হাটের লুঠের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের কোন দল বা গোষ্ঠী যুক্ত ছিল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে একশো বছর পূর্বের Police records-এ হদিশ মিলবে। কিন্তু সেটি এখনও করে উঠতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। আশা করি স্বাধীনতার অমৃত জয়ন্তী বর্ষে মনস্ক পাঠককে জানাতে পারবো এই ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যের কথা।

তবে অসহযোগ আন্দোলনের পরে শিলিগুড়িতে 'দেশবন্ধু ভান্ডার' নামে একটি স্বদেশি দোকান স্থাপিত হয়েছিল। শিলিগুড়ির শিক্ষিত অধিবাসীদের উদ্যোগেই এটি গড়ে উঠেছিল এবং পরিচালিত হতো।

অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি অধ্যায়ে শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলে এক অভিনব প্রতিবাদ করেছিলেন ছাত্রদের কয়েকজন। বর্ষীয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামী সমরেন্দ্র দত্ত রায় এই প্রতিবাদী ঘটনার কথা লিখেছিলেন এবং বর্তমান

লেখককে বলেছিলেন। ১৯৮১-৮২ সালে তাঁর নক্সালবাড়ির আলয়ে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি ঘটনাটি বলেছিলেন। তবে এটিও সত্যি কথা আমার উচিত ছিল শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের তথ্যভান্ডার দেখা। কারণ এসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের ছাত্র Cross-verification পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অর্থাৎ একজন স্মৃতি থেকে বা শুনে বা জেনে যা বলছেন ও লিখছেন তার যথার্থতা প্রমাণে মূল তথ্য দেখা আবশ্যিক কর্তব্য। এটি সাম্প্রতিক বা স্বাধীনতা বা গণ আন্দোলনের ইতিহাস নির্মাণের একটি তথ্য যাচাই পদ্ধতি। প্রশ্নটি বিশ্বাস বা বয়সের নয়। সদুঃখে বলতে হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাস নির্মাণের তথ্য বাছাইয়ের এই নূন্যতম পদ্ধতি অনুসরণ না করেই স্থানিক পর্যায়ে অনেকে সৌখিন ইতিহাস চর্চা করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা জনমানসকে প্রভাবিত করছে। এমনকি সরকারকেও প্রভাবিত করছে। ইতিহাস নির্মাণে এর চেয়ে ক্ষতিকর কিছু হয় না। শুধু ক্ষতি বললেও শেষ হয় না, নানা ধরনের অসুস্থ অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে এদের নির্মিত ইতিহাস। সকলেই বলতে ব্যস্ত তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাহলে ইংরেজ সরকার এই উপমহাদেশ কাদের নিয়ে শাসন করতেন? ইতিহাসের কাঠগড়া আইনের কাঠগড়া থেকেও নিষ্ঠুর। মেধাবী আইনজীবী তাঁর মেধার প্রয়োগ করে খুনিকে মুক্ত করতে, আবার নিরাপরাধীকেও খুনী প্রমাণ করতে পারেন। আইনের বিচারে এরূপ অজস্র উদাহরণ রয়েছে। সে অন্য কথা।

ইংরেজ সরকারবিরোধী ও স্বাধীনতা অন্দোলনের অভ্যন্তরে অভিনিবেশের পূর্বে অরাজনৈতিক শিলিগুড়ির একটি ঘটনা বলি যা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবল আলোড়ন-বিলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনাটির কথা বলেই স্বাধীনতা কান্ডে প্রবেশ করব।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন দার্জিলিং এসেছিলেন সরকারি চাকুরি সূত্রে। দার্জিলিং শহরে তিনি বিপ্লবী যুবকদের নিয়ে 'বান্ধব সমিতি' গঠন করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে 'গীতা' পাঠের আসর বসাতেন। বাঘাযতীন সরকারি কাজের সুত্রে প্রায়ই কলকাতায় যেতেন। এরূপ একবার যাওয়ার সময় ১৯০৮ সালে শিলিগুড়ি স্টেশনে একটি রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল বাঘাযতীনকে নিয়ে। ঘটনাটি নিম্নরূপ ছিল —

শিলিগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থামলে তিনি কল থেকে এক ঘটি জল নিয়ে কামরায় ফিরছিলেন। এমন সময় ক্যাপ্টেন মারফি সহ চারজন গোরা সেনা ধাক্কা দিয়ে বাঘাযতীনের ঘটিটি ফেলে দেয়। সাহসী বাঘাযতীন বুক ফুলিয়ে গিয়ে বললেন — 'What nuisance is this? ক্যাপ্টেন মারফি চীৎকার করে বললেন, 'Go, off, I shall kick you off.' রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য বাঘাযতীন বক্সিং-এর প্যাঁচে চারজন গোরা সৈন্যকে ধরাশায়ী করলেন। গোরাদের ক্যপ্টেন দার্জিলিঙে পৌঁছে বাঘাযতীনের নামে একটি ফৌজদারি মামলা করলেন।

বাঘাযতীন জেলা সমাহর্তার সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা শুনে ক্যাপ্টেন মারফিকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'It is not shame on your part to attack a

single Bengalee in a body of all four and be over powered by him and is it grace for you now to seek court justice against him?

এদিকে আদালতে ফৌজদারি মামলা চলছে। বিচারক বাঘাযতীনকে বলেছিলেন, 'behave properly to give assurance that he would refrain in self-defence on in the vindication of the rights of his countrymen'.

সে সময় বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ থেকে শুরু করে উচ্চ-নীচ বহু দার্জিলিংবাসী বাঙালি বাঘাযতীনকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। ১৯০৮ সালের এই ঘটনা রাজনৈতিকভাবে নিস্তরঙ্গ দার্জিলিং শহরসহ সমগ্র বঙ্গদেশে এক বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজদের বাহুবল সম্পর্কে যে 'মিথ' তৈরী হয়েছিল মানুষের মধ্যে তাতে চিড় ধরতে শুরু করেছিল এই ঘটনার পর। ইংরেজরা অপরাজেয় নয় - এই ভাবনা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল জনমানসে।

(চার)

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল, সমতলের তরাই-শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ইংরেজ বিরোধী চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলন অন্য অঞ্চলের চেয়ে শ্লথ গতিতে প্রসারের অন্য একটি কারণ হলো প্রশাসনিক বিধি। দার্জিলিং অঞ্চল ও পরবর্তীকালের জেলা 'Non-Regulation' অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। 'Non-Regulation'- এর অর্থ হলো বঙ্গদেশের আইনবিধি এখানে প্রয়োগ হবে না। 'Non-Regulation' অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশাসন পরিচালনা করবেন। এই ব্যবস্থার ফলে যে কোন ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসন চব্বিশ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বহিষ্কার করতে পারতেন। এইরূপ কঠোর বিধির জন্যই শিলিগুড়ি 'অরাজনৈতিক শহরে' বিবর্তিত হয়েছিল। তবে ১৯১৯ সালের শাসন আইনে দার্জিলিঙ জেলার সমতল অঞ্চল অর্থাৎ তরাই-শিলিগুড়িকে এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছিল। সে সময় দার্জিলিঙে পার্বত্য অঞ্চলকে বলা হতো 'Excluded Area'। এই 'Excluded Area' আর কিছুই নয় Non-regulation-এরই পোশাকী নাম। অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন হয় বা হতে হয়। মানুষ যত সভ্যতার শিখরে উঠবে ততই তার ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের মধ্যে পরিশীলিত ভাব ফুটে উঠবে। যাইহোক তরাই-শিলিগুড়ির লোক Regulated Area হল। অর্থাৎ মালদহ ও বর্ধমানে যে অআইন প্রচলিত আছে, তা তরাই-শিলিগুড়িতেও হবে, কিন্তু দার্জিলিঙে নয়। দার্জিলিঙকে Excluded Area করে রাখা হলো। সে অন্য কথা। আমরা তরাই-শিলিগুড়ির কথা আলোচনা করছি। আসলে এসব ক্ষেত্রে আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে স্থানীয় বা বাইরের যেখানকার লেখক-ই হন, তাঁরা সচেতন,

অচেতন ও অবচেতনভাবে তরাইয়ের আলোচনা করেন দায়সারা ভাবে। দার্জিলিঙের চাপে তরাই-শিলিগুড়ির সে কালের কথা অনেকেই লেখনীতে আসে না।

যাইহোক ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব শিলিগুড়িতে খুব বেশি পড়েনি। তবে গান্ধীজির 'ডান্ডি মার্চ' তথা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ৬৫ জনের একটি দল দার্জিলিং জেলা থেকে গিয়েছিলেন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সমরেন্দ্র নাথ দত্ত রায় লিখেছেন এদের মধ্যে ৫৭-৫৮ জনই কালিম্পঙের লোক ছিলেন। এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিউমঙ্গল সিং, আশু ঘোষ ও রাজ নারায়ণ শুক্লা। অনুমান করা যেতে পারে যে ৬৫ সনের মধ্যে অন্তত ৭-৮জন শিলিগুড়ি-তরাই অঞ্চলের লোক ছিলেন। তারবান্ধা গ্রামের নগেন্দ্রনাথ রায় জেলা কংগ্রেস গঠিত হওয়ার সময় থেকে জেলা শাখার সদস্য ছিলেন। গান্ধীর আদর্শকে তরাইয়ের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য লোকে তাঁকে 'তারবান্ধার গান্ধী' বলতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দার্জিলিং জেলায় তিনজন 'গান্ধী' শিরোপা পেয়েছিলেন। এক জন পার্বত্য গান্ধী দলবাহাদুর গিরি, তার একজন তারবান্ধার গান্ধী নগেন্দ্রনাথ রায়, তৃতীয় জন শিলিগুড়ি টাউনের শিউমঙ্গল সিং। তাঁকে লোকে 'শিলিগুড়ি গান্ধী' বলতেন। কোন জেলাতে তিন জন 'গান্ধী' শিরোপা পান নি। এছাড়া ফাঁসিদেওয়া থানার রানীডাঙ্গার ভাদ্রু সিং, পাথাল সিং, হর্ষবর্ধন দাস প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। এছাড়া শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার নরেন রয়, ধীরেন রায়, মনোমোহন রায়, রাঙাপানির পবন সাহা, খড়িবাড়ির অবনী কুমার সিং জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যেক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। যাইহোক, আইন অমান্য আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি তথ্য উত্থাপন করছি। সেটি হচ্ছে ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে যাঁরা দন্ডিত হয়েছিলেন — তার একটি হিসেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Bengal Legislative Council) পেশ করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাতে দার্জিলিং জেলার পাঁচ জনের কথা আছে। কিন্তু নাম নেই। এই পাঁচজনের কজন তরাই-শিলিগুড়ির, ক'জন দার্জিলিং পাহাড়ের, তা জানা যায়নি। বঙ্গীয় আইন সভার কার্যবিবরণীতে অবশ্য নাম পাওয়া যাবে।

জাতীয় কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অন্যান্য স্থানের মতন শিলিগুড়িতেও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। যেমন ১৯৩১ সালের ২৪ এপ্রিল কংগ্রেস কর্মীরা একটি সভায় মিলিত হয়ে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ পেডীর উপর আক্রমনের নিন্দা করেছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার। কালিম্পঙের দু'জন নেপালি বক্তাও এই সভায় বক্তৃতা করেছিলেন।

১৯৩১ সালে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে শিলিগুড়ি থেকে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ মজুমদার, সহ-সভাপতি শ্রী শিউমঙ্গল সিং এবং জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক বাবু হরিদাস মজুমদার ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৩১ সালের ১৬ জুন শিলিগুড়ি শহরে একটি মিছিল বেরিয়েছিল।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে শিলিগুড়ির বাঙালি ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা এক সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁরা পুজোর সময় বিদেশি কাপড়ের Indent তুলবেন না। কারণ শিলিগুড়ির নগরবাসীরা পুজোর সময় বিদেশি বস্ত্র না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

চট্টগ্রাম ও হিজলির নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ১৬ নভেম্বর শিলিগুড়িতে সাধারণ হরতাল পালিত হয়েছিল। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ইতিপূর্বে জাতীয় আন্দোলনের সমর্থনে এ ধরণের হরতাল কখনও পালিত হয়নি। শিউমঙ্গল সিং-এর নেতৃত্বে বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল এবং কংগ্রেস অফিসের সামনে একটি জনসভা করেছিল। এই সভায় বিভিন্ন বক্তা পুলিশি অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। উল্লেখ্য বিষয় হল যে, কোনো কোনো বক্তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও নিন্দা করেছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের পরে ১৯৩২ সালে শিউমঙ্গল সিং ও ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ বসু রায় চৌধুরী গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কলিকাতায় কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দলের প্রভাব শিলিগুড়িতেও পড়েছিল। এই উপদলীয় কোন্দলের সূত্রপাত ঘটেছিল দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণের পরে। এই কোন্দলের এক পক্ষ হল সুভাষচন্দ্র বসু, অপর পক্ষ হলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। শিলিগুড়িতে এই উপদলীয় কোন্দল দেখা দিয়েছিল শিউমঙ্গল সিং বনাম ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরীর মধ্যে। শিউমঙ্গল সিং ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তথা গান্ধী গোষ্ঠীর লোক। ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ বসু রায় চৌধুরী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর গোষ্ঠীর লোক। এই যে উপদলীয় কোন্দল শিলিগুড়িতে শুরু হয়েছিল তা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তীব্রভাবে প্রকটিত হয়েছিল। সে কথা অন্যত্র বলবো। তবে শিলিগুড়ি ক্রমশ যে তার 'অরাজনৈতিক' খোলস ছেড়ে আসছিল তার প্রমাণ এই রাজনৈতিক সচেতনতা।

তবে শিলিগুড়ি 'অরাজনৈতিক শহর' থেকে রাজনীতি সচেতন জনপদ তৈরী হওয়ার পশ্চাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান অনেকখানি। এর কারণ অবশ্যই দার্জিলিং পার্বত্য শহর। জাতীয়, রাজ্যস্তরের যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দার্জিলিং যাওয়া আসার পথে তাঁদের শিলিগুড়িতে নামতেই হত ট্রেন পরিবর্তন করার জন্য। যেমন সতীশ সেন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, গান্ধী, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে দার্জিলিং, কালিম্পঙ, কার্সিয়াঙ যাওয়ার পথে শিলিগুড়ি নেমেছেন ও সভা করেছেন। তবে সুভাষচন্দ্র বসু কোন সভা করেছিলেন বলে এখনও জানতে পারিনি। অথচ তিনি ও তাঁর অগ্রজ কার্সিয়াঙের গিদ্দা পাহাড়ে বেশ কয়েক বার গিয়েছিলেন। তবে বিষয়টির অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

(পাঁচ)

শিলিগুড়ির নয় তবে দার্জিলিং শহরের যে ঘটনা বঙ্গদেশের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল, সেটি হলো গভর্ণর স্যার জন এ্যান্ডারসনের হত্যা। ১৯৩৪ সালের ৮ মে দার্জিলিঙের লেবং রেসকোর্স মাঠে দুঃসাহসিক বিপ্লবীরা এ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যর্থও হয়েছিলেন। ব্যর্থ হলেও এই ঘটনার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী এবং বহুমুখী। সুদূরপ্রসারী এই জন্য বলছি যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে এ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টাই সব চেয়ে বড় আকারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যর্থতার পরে ইংরেজ সরকার ভেবেছিলেন এবার বোধ হয় বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে। তাছাড়া আয়ারল্যান্ডের কুখ্যাত 'ব্ল্যাক এ্যান্ড ট্যান' বাহিনীর নেতা এ্যান্ডারসন এখন বঙ্গদেশের গভর্ণর। যাইহোক এই ঘটনা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আনুগত্যপূর্ণ নেপালি এবং সরল ধার্মিক লেপচারা ভাবতেন এই বাঙালীবাবুরা লাটসাহেবকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন! এটা তাঁদের কাছে এক বিস্ময়কর ঘটনা ছিল! লাট সাহেবকে কী হত্যা করা যায়? এ সম্পর্কে দার্জিলিং জেলের কারাধ্যক্ষ শ্রী অপূর্ব মৈত্রেয় তাঁর 'We cried together' গ্রন্থে সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন - "In day to day that when they went upto court or came down the hill to jail, large number of Nepalis used to stand by the side of public roads. This could be prevented. The Nepalis .... woke from their slumber after countries and tried to find out what was happening. There Baboos wanted to kill 'Lat Sahib', why? They did not understand then. This attempt on the life of Anderson acted some what life a distant arm clock to wake sleeping Nepali Indians.'

যাইহোক, এ্যান্ডারসনকে লেবং রেসকোর্সের মাঠে হত্যার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবানী ভট্টাচার্যসহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কুড়িজন। ট্রাইবিউনালের বিচারে ভবানী, রবীন্দ্র ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি মুকুব করে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত শুধু ভবানী ভট্টাচার্যেরই ফাঁসি হয়েছিল। এই ঘটনাটি দার্জিলিঙের। তবু এখানে আলোচনা করলাম। কেন করলাম সেই কথায় আসছি।

দার্জিলিঙে এ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা কিন্তু সেদিনের শিলিগুড়ি শহরের লোকেরা তীব্রভাবে নিন্দা করেছিল। ৮ মে গভর্ণরকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। ১৪ মে-তে শিলিগুড়ি বার এ্যাসোসিয়েশন (Bar

Association), শিলিগুড়ির রাজবংশী, মুসলমান, মোদক ও যোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা এক সভায় মিলিত হযে গভর্ণরকে আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তরাই জোতদার সমিতির সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ রায় সরকারও গভর্ণর হত্যার নিন্দা করেছিলেন। তবে সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন শিলিগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মী নারায়ণ মজুমদার, অন্নদাচরণ বাগচী, ভগবতী লাল আগরওয়াল, শিউমঙ্গল সিং। এদের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিলো। এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন। এই সংস্থা তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করেছিল। এই অধিবেশনে বঙ্গদেশের সমস্ত জেলার প্রতিনিধি, ভারতের কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধি এসেছিলেন। এদের সংখ্যা চারশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল বলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, কুমিল্লার আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, লীলা রায়, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী সহ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চল থেকে একটি দল এসেছিলেন। কারণ এরা সুভাষচন্দ্রকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু শিলিগুড়ি-তরাই মহকুমা থেকে কারা এসেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ও নাম পাচ্ছি না। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই অধিবেশন নিয়ে শিলিগুড়ির প্রতিনিধিরা তাঁদের স্মৃতিকথায় কিছুই উল্লেখ করেন নি। অনেকের সঙ্গে ১৯৮১-৮২ সালে দেখাও করেছিলাম। কিন্তু জানতে পারিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামী বরদাকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বিয়াল্লিশের আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছিল, কিন্তু জলপাইগুড়ির অধিবেশন নিয়ে কথা হয়নি। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী প্রদ্যোৎ বসুর বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর স্ত্রী, শিক্ষিকা উমা বসু আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রদ্যোৎ বাবু Liberty পত্রিকার শিলিগুড়ির সংবাদদাতা ছিলেন। সখের বা দেশপ্রেমের সংবাদদাতা। কারণ তিনি ছিলেন এম.এ.বি.এল। আর বহুবার গিয়েছি নৃপেন বসুর বাসভবনে তথ্য সংগ্রহের তাগিদে। আপাদমস্তক ভদ্রলোক। যাইহোক মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসছি।

শিলিগুড়ির কংগ্রেস কমিটি ও কম্যুনিস্ট পার্টির কমিটি সূচনাপর্বে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটি ও জলপাইগুড়ির কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। এ সম্পর্কে জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও গবেষক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন, 'শিলিগুড়ির শ্রী ব্রজেন বসু চৌধুরী ও শিউ মঙ্গল সিং-এর সঙ্গে জলপাইগুড়ির কংগ্রেসের যোগাযোগ ছিল। রাতের আঁধারে শিউ মঙ্গল সিং আসতেন শিলিগুড়ি থেকে; এখান থেকে বে-আইনি কাগজপত্র ব্যাগের নিচে নিয়ে ভোর হবার আগেই সরে পড়তেন।' অন্যদিকে বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার তাঁর 'পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৯৩৪ সালে দার্জিলিং শহরে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির অধীনে একটি 'সেল' ছিল। তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত।' বর্তমান প্রবন্ধের লেখক এ ব্যাপারে ডাঃ শচীন দাশগুপ্তের সঙ্গে

আলোচনা করে ঐ একই কথাই জেনেছেন। সবিনয়ে জানিয়ে রাখি যে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে শ্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের ফ্লাটেও গিয়েছিলাম। ১৯৮১-৮২ সালের কথা। তখন তিনি কোলকাতাতেই থাকতেন। আমাকে অনেক পুরনো পত্রিকা ও প্রচারপত্র দিয়েছিলেন। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসছি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সাল থেকে ২৬ জানুয়ারিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন শুরু করেছিল। কারণ ঐ দিনই লাহোরের রাভি নদীর তীরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। সেই সূত্রেই প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন করতেন জাতীয় কংগ্রেস। ১৯৩৯ সালের ২৬ জানুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমা কংগ্রেস কমিটি একটি মিছিল ও সভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় শিউ মঙ্গল সিং, ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ বসু রায়চৌধুরী, মনোমোহন রায়, বরদাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গান্ধীজির অন্যতম সচিব মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে একটি মৌন মিছিল বেরিয়েছিল। এ ব্যাপারে পুলিশ শিউ মঙ্গল সিং-কে গ্রেপ্তার করেছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গান্ধীজি ও তাঁর সচিব মহাদেব দেশাই ১৯২৫ সালের জুন মাসে দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে একরাত্রি শিউ মঙ্গল সিং-এর গৃহে অবস্থান করেছিলেন।

(ছয়)

এই অধ্যায়ে শিলিগুড়ি-তরাইয়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির বিবরণ উপস্থাপিত করছি। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হলো ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের তিনটি অঞ্চলের নাম 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পর্বে সমগ্র বঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই তিনটি অঞ্চল হলো মেদিনীপুর, দিনাজপুরের বালুরঘাট ও দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি। গুরুত্বে অবশ্যই মেদিনীপুরের স্থান প্রথম, শিলিগুড়ির স্থান তৃতীয়। গবেষকদের নিকট 'অরাজনৈতিক' শিলিগুড়িতে এরূপ ঘটনা বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হতো। বিস্ময়কর হলেও ঘটনা ঘটেছিল। এটি-ই এই পর্বের আলোচনার মূল বিষয়।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, ভারত ছাড়ো আন্দোলন ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট মধ্যরাতে শুরু হলেও শিলিগুড়িতে তা শুরু হয়েছিল ৫ সেপ্টেম্বর। শিলিগুড়িতে এই আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে নানা ধরনের কাহিনি প্রচলিত আছে। সে সব কাহিনি সব সত্য নয়, আবার একেবারে মিথ্যাও নয়। তবে আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের হাতে এখনও আসেনি। তাই শেষ কথা বলার সময় আসেনি। শুধুমাত্র পর্যালোচনা করব।

আগস্ট আন্দোলন শিলিগুড়িতে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। আইনজীবী প্রদ্যোৎ কুমার বসু তাঁর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপিতে লিখেছেন, মিছিলে প্রায় হাজার খানেক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য আন্দোলনের পূর্বেই প্রশাসন শিউমঙ্গল সিং ও ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ বসু রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। ফলে আগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব এসে বর্তেছিল বীরেশ্বর মজুমদার,প্রতুল মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের হাতে। মিছিলের অন্যভাগে ছিলেন ডাঃ

ব্রজেন্দ্র নাথ বসু রায়চৌধুরীর কন্যা গীতা বসু রায়চৌধুরী ও কালিদাস সেনগুপ্ত। কংগ্রেস কর্মী ছাড়া ছাত্ররাও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। মিছিলের স্লোগান ছিল 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ও 'ইউনিয়ন জ্যাক নিপাত যাক'। মিছিল শহর পরিক্রমা করে থানার দিকে এগোচ্ছিল। থানা আক্রমণ বা কোনো ধরণের প্ররোচনামূলক কাজে জড়িয়ে পড়া উদ্দেশ্য আন্দোলনকদের ছিল না। আন্দোলকদের অন্যতম দেশবন্ধুপাড়ার বরদাকান্ত ভট্টাচার্য এই কথাগুলি বর্তমান লেখককে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও আন্দোলনে গুলি চলেছিল। কিন্তু কেন ? তার উত্তর আজও মেলেনি।

আগস্ট আন্দোলনের সময় শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক ছিলেন একজন কুখ্যাত বাঙালি - কে. কে. ঘোষ। জেলাশাসক মিঃ স্টুয়ার্ট সাহেব। পুলিশ কেন গুলি করেছিল তার উত্তর পাওয়া যাবে না। তবে আন্দোলকদের মন্তব্য মিছিল থেকে কেউ কেউ থানায় ঢিল ছুঁড়ে থাকতে পারে। শুধু এই কারণেই কি পুলিশ গুলি চালিয়ে পাঁচটি তাজা প্রাণ ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ? সমসময়ের অনেকের বিশ্বাস মহকুমা শাসক কে. কে. ঘোষের দমনমূলক প্রতিশোধের বলি হয়েছিলেন পাঁচজন মিছিলে অংশগ্রহণকারী। পাঁচজনের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র দু'জন শহিদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি। একজন ছাবিলা সিং, অপরজন মহাবীর সিং। যাঁরা গুলি বা অন্যভাবে আহত হয়েছিলেন তাঁদেরও সব নাম সংগ্রহ করতে পারিনি। যাঁদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি তাঁরা হলেন কার্তিক ঘোষ, মহাদেব কানোড়িয়াল, হাজারি বেনিয়া। মোট পাঁচজন মারা গিয়েছিলেন কি না, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। সুকুমার রায় ও অজিত বসু মল্লিক তাঁদের 'আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের জাতীয় সরকার' গ্রন্থে লিখেছেন শিলিগুড়িতে পুলিশের গুলিতে চারজন মারা গিয়েছেন। এই গ্রন্থকারদ্বয় ঘটনার তারিখ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা লিখেছেন ১১ সেপ্টেম্বর গুলি চলেছিল। অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার বর্তমান লেখককে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন গুলি চলেছিল ৯ সেপ্টেম্বর। আশ্চর্যের বিষয় হল শিলিগুড়ির এত বড় একটি ঘটনা সম্পর্কে কোন খবর তৎকালীন Amrita Bazar পত্রিকায় স্থান পায়নি। তবে ১৬ আগস্টের অমৃতবাজার পত্রিকায় শিলিগুড়ি সম্পর্কে যে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ —

'The president of the Sadar Sub-divisional Congress Comittee and other Congress men were arrested. সম্ভবত মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে মৌন মিছিল বেরিয়েছিল, এ খবর তাদের সম্পর্কে, আবার ১৩ সেপ্টেম্বর Amrita Bazar Patrika শিলিগুড়ি সম্পর্কে লিখেছিল —

Hartal was observed at Siliguri on 1st September.

তবে ৫ সেপ্টেম্বর গুলি চলেছিল এই খবরটি শুধুমাত্র বিজয় ঘটক মহাশয়ের 'শিলিগুড়ি শহরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ২ নভেম্বর Amrita Bazar পত্রিকা অবশ্য ৯ সেপ্টেম্বর গুলি চলেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

অতএব শ্রী বিজয় ঘটক বা অন্যদের লেখা বা মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক।

যাই হোক, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কিছু নাম সংগ্রহ করেছিলাম - এরা হলেন হরিদাস মজুমদার, মনোমোহন রায়, সন্তোষ কুমার দাস (বাবুপাড়া), আশুতোষ বিশ্বাস (দেশবন্ধু পাড়া), সুনীল কুমার মুখার্জী (মিলনপল্লী), সাবিত্রী সেনগুপ্ত (দেশবন্ধু পাড়া), বরদাকান্ত ভট্টাচার্য (দেশবন্ধু পাড়া), অধীর কুমার সান্যাল (মহানন্দা পাড়া), নির্মলভূষণ কর (মহানন্দা পাড়া), চিত্তদয়াল চক্রবর্তী (হাকিমপাড়া), বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ (দেশবন্ধু পাড়া), কে. এন. চ্যাটার্জী (বাবুপাড়া), ডাঃ গোপাল চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। এরা সকলেই কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই আন্দোলনে ছাত্রদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সব ছাত্রের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি এখনও। নির্মল চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়' গ্রন্থে কয়েকজন রাজবংশী ছাত্রের অংশগ্রহণের কথা লিখেছেন। এরা হলেন শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের দিলীপ কুমার রায় সরকার, উপেন্দ্র নাথ দাস, দীপেন্দ্র নাথ সরকার প্রমুখ। এতক্ষণ যাঁদের কথা বললাম এঁরা সকলেই শিলিগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলের অধিবাসী। এবার তরাইয়ের গ্রামাঞ্চলের আন্দোলকদের কথা আলোচনা করব।

পূর্বেই বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রক্ষিপ্তভাবে তরাইয়ের বিশেষতঃ ফাঁসিদেওয়া থানার গ্রামাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা উল্লেখ করেছি। ভাদ্রু-সিং ও পাথর সিং-এর কথা পূর্বেই বলেছি। মাল্লাগুড়ির চৈতন্য সন্ন্যাসী ও তাঁর স্ত্রী আবুশ্বরীও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। এছাড়া আঠারোখাইয়েরর রামকৃষ্ণ জোতের কুঞ্জলাল মালাকার এবং বিধান নগরের ডিমপুর জোতের গোবিন্দচন্দ্র দাসও কারাবরণ করেছিলেন। খড়িবাড়ির তারকচন্দ্র রায় সরকার, বলেন্দ্রনাথ রায় সরকার, অমৃতলাল রায় সরকার, চন্দ্রকান্ত সিংহ, উদানু সিং ও অবনী কুমার সিং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শেষোক্ত জন অর্থাৎ অবনীকুমার সিং ছয়মাস কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মামলায় আদালত ২৪ জনকে দন্ড দিয়েছিলেন। আদালতের রায় বেরিয়েছিল ২৫ ডিসেম্বর। এই ২৪ জনের তালিকাও সংগ্রহ করতে পারিনি এখনও। আসলে শিলিগুড়ির ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গুরুত্ব সমসময়ের সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পায়নি। ফলে তথ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়েছে। সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণার ওপরই বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে এ দুটিরই গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি এই উপাদানদ্বয়ের উপর নির্ভর করে ইতিহাস নির্মাণ করতে গেলে অনেকটা ত্রুটি থেকেই যাবে এবং এটা এ লেখার ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

(সাত)

ভারতছাড়ো আন্দোলনের পরে রাজনৈতিক আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হতে শুরু করেছিল। আর এই শুরুর

প্রাক্কালেই বঙ্গদেশের মহা মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হল মন্বন্তর শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে দেশবিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে দেশব্যাপী উৎকণ্ঠা উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। আর এর সঙ্গে যুক্ত হল দাঙ্গা। এই সময়ের আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল হিন্দু মহাসভার আন্দোলন। ১৯৪৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল। এই অধিবেশনে উপস্থিত All India Hindu Mahasabha-র সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, বি.এস. মুঞ্জে, বি.জি. খাপারদে, এন. সি. চ্যাটার্জী (নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) প্রমুখ। এই সভায় শিলিগুড়ি থেকে বহু লোক এসেছিলেন। কারণ প্রাদেশিক সম্মেলনের পূর্বে হিন্দু মহাসভা দার্জিলিং, কালিম্পঙে জনসভা করেছেন।

যাইহোক ইতিমধ্যে ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ সালে শুরু হয়েছিল Great Calcutta Killing. বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী (তখন তাই বলা হত) হোসেন শহীদ সোহরাবর্দ্দীর Direct Action Day-র ফলে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। তবে এই দাঙ্গার প্রভাব শিলিগুড়িতে পড়েনি। উত্তেজনা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল ঠিকই, কিন্তু দাঙ্গা বাঁধেনি। এই ঘটনার তিনশো বাষট্টি দিন পরেই এসেছিল যমজ সন্তানের মতন দেশভাগ ও স্বাধীনতা। ভেবেছিলাম আলোচনার সমাপ্তি এখানেই করবো। কিন্তু তা পারলাম না আর মনও চাইল না। যদি শুধু স্বাধীনতা হত তাহলে এখানেই শেষ করতাম। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে এল তো দেশ বিভাগ। ফলে সব হিসেব পাল্টে গেল। পাল্টে গেল জীবনবোধ, মূল্যবোধ, নৈতিকতাবোধ। এই মহাসঙ্কটে অথবা সঙ্কটের ত্র্যহস্পর্শে বঙ্গের অন্য জনপদগুলির মতো শিলিগুড়ির জীবনে নেমে এসেছিল মহাদুর্যোগ। আর প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী মহাদুর্যোগের পাশাপাশি এসেছিল দুর্যোগ ত্রাতাকারীরাও। তাঁদের কথা না বলে তরাই-শিলিগুড়ির স্বাধীনতার মহাকাব্য কাব্য হয়ে থাকবে, মহাকাব্য নয়।

(আট)

এই মহাসঙ্কটের সময়কালে শিলিগুড়িতে এলেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী যিনি আলো চৌধুরী নামে সমধিক পরিচিত। এলেন জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আর এলেন অরুণ মৈত্র। আর বীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার নগরেই ছিলেন। শুরু হল নতুন শিলিগুড়ির যাত্রা। যে যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। এই যাত্রার 'পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা' থাকলেও যাত্রা কিন্তু থেমে থাকেনি। শিলগড়ির 'শিল'কে সরিয়ে রাজপথ তৈরি করলেন এই 'চার আরোহী'। আর এই চলার পথে পেয়েছেন তাঁরা অনুসরক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নতুন শিলিগুড়ির 'চার আরোহীর' তিন জন-ই ছিন্নমূল। শুধু বীরেন রায় সরকার মহাশয় বাদে। ছিন্নমূল বা অনিকেত হয়েও কখনও ছিন্নমূলবোধ দ্বারা আক্রান্ত হননি। তিন জন এসেছেন পূর্ববঙ্গের তিন জেলা থেকে। কেউ নাটোর, কেউ পাবনা, কেউ ময়মনসিং। দেশ বিভাজন ও স্বাধীনতার পূর্বে কেউ কাউকে চিনতেন না। চেনা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু দেশবিভাজন তাঁদেরকে নতুন 'দেশবোধে' উদ্বোধিত করেছিল।

ইউনিয়ন বোর্ড শিলিগুড়ির মহানগর হিসেবে গড়ে উঠার বীজ সচেতনভাবে না হলেও অচেতনভাবে বপন করেছিলেন এঁরাই।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তর-পর্ব হিসেবে এই অনুচ্ছেদটি লিখলাম। কোনো নবীন এসে উত্তর-পর্ব লিখেবেন, এই আশা নিয়েই ইতিবৃত্ত রচনার পরিসমাপ্তি ঘটালাম।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ঃ বাংলা

১) পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা — সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
২) জনমত পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৩৭২ - সম্পাদক মুকুলেশ সান্যাল, জলপাইগুড়ি
৩) উত্তরবঙ্গ - ইতিহাস ও সমাজ - ২ - আনন্দ গোপাল ঘোষ, সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা, সংবেদন, মালদহ
৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট উত্তরবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ, ১৯৯২
৫) উত্তরবঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন - স্মারক গ্রন্থ, ৯ই-১০ই মার্চ, ১৯৭৬, মিত্র সম্মিলনী মঞ্চ, শিলিগুড়ি, সম্পাদক - সমরেন্দ্র দত্ত রায়
৬) উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনালেখ্য — প্রথম খন্ড - ক্ষুদিরাম স্মৃতি রক্ষা কমিটি, কোচবিহার, ২০১৪
৭) স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায় — নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, জলপাইগুড়ি
৮) মধুপর্ণী বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা — ১৯৯৬
৯) একটি জনপদের কাহিনী - প্রদ্যোৎ কুমার বসু
১০) শিলিগুড়ি শহরের ইতিবৃত্ত — বিজয় চন্দ্র ঘটক
১১) বঙ্গবাণী জুন, ১৯৩১, কলকাতা, প্রাসঙ্গিক সংখ্যা

English Books :

1. Day to Day with Gandhiji - Vol.VII, Mahadev Desai
2. Amrita Bazar Patrika, 16.8.42; 10.8.1942, 2.11.1942
3. Studies in Microhistory - M.S. Bhattacharya.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
ঁবসন্ত কুমার ঘোষ,ঁ প্রদ্যোৎ কুমার সরকার,ঁ নৃপেন বসু,ঁউদয় দুবে, ডঃ সুজিত ঘোষ (অধ্যক্ষ)

পুঃ পরম স্নেহাস্পদ প্রফেসর প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের নিরন্তর তাগিদেই এ লেখা সম্ভব হল। মঙ্গলময় তাঁর মঙ্গল করুন।

—০—

কোভিড-১৯ অতিমারি — কিছু কথা

ডাঃ শেখর চক্রবর্তী

প্রতি সপ্তাহেই কেউ না কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, ডাক্তারবাবু, এই অতিমারি আর কতদিন চলবে। ঠিকভাবে বলতে গেলে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ অতিমারির অভিজ্ঞতা কারুরই প্রায় নেই।

স্প্যানিস ফ্লু যা শতাব্দী প্রাচীন, তা প্রায় আড়াই বছর চলেছিল। সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। স্প্যানিস ফ্লু অতিমারির স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে কোভিড-১৯ অতিমারি আড়াই বছরের মতোই চলবে। চিন দেশের উহান প্রদেশে ২০১৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যে অতিমারির সূত্রপাত সেই অতিমারি খুব সম্ভবত ২০২২ এর মার্চ এপ্রিল মাসে গিয়ে শেষ হবে।

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রথম ঢেউ এর পর দ্বিতীয় ঢেউ এখনো খুব ধীরগতিতে চলছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন আগস্ট-সেপ্টেম্বর-এ তৃতীয় ঢেউ আসবে এবং আসন্ন শীতকালে চতুর্থ ঢেউ আসবে। তারপরে হয়ত শীতের বিদায়কালে অতিমারির অবসান হবে। সবটাই অনুমান নির্ভর, কারণ ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি আগাম আঁচ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য, তবে কিছুটা অনুমান অবশ্যই করা যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ এর আঘাত শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুবই ব্যাপক ও সংহারকারী ছিল। তবে মেট্রোপলিটান সিটিগুলিতে এর তীব্রতা ছিল আরও মারাত্মক। প্রথম ঢেউ-এর তুলনায় দ্বিতীয় ঢেউএর তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরও ভয়ঙ্কর ছিল। দ্বিতীয় ঢেউ এ রোগী মৃত্যুর হার প্রায় প্রথম ঢেউর মতো থাকলেও (১-৩ শতাংশ) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার ফলেও বহুসংখ্যক মানুষ একসঙ্গে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সার্বিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় ঢেউ এর সক্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন পরিষ্কারভাবে অনুভূত হয় যে ভারতবর্ষের চিকিৎসা পরিষেবা অতিমারিকে প্রতিরোধ করতে অপ্রতুল। শিলিগুড়িও তার ব্যতিক্রম নয়। যখন রোগীকে ভর্তি করতে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যার অভাব দেখা যায়, আই-সি-ইউর শয্যা সংখ্যাও অপ্রতুল হয়ে যায়, অক্সিজেনের অভাব, জীবনদায়ী ওষুধের অভাব, চিকিৎসক ও সেবিকারা অনেকে একসাথে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব ইত্যাদি সংকট দেখা দেয়, তখনই মনে হয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে শিলিগুড়ি ও তার লাগোয়া এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামো আরও ব্যাপক ও উন্নততর করার প্রয়োজন আছে।

পুরবার্তা ২০২১

ডেল্টা রুখতে টিকা ও মাস্ক মাস্ট

যখন দ্বিতীয় ঢেউ যাবে যাবে করছে, ঠিক তখনই তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অল্পবিস্তর তৃতীয় ঢেউ শুরুও হয়ে গিয়েছে। তার ওপর সম্প্রতি সিকিমে ৯৭ জনের শরীরে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ মেলায় সকলেই উদ্বিগ্ন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা একান্ত জরুরি।

কীভাবে এল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট

উহান থেকে যখন প্রথম ভাইরাস বেরোয়, সেটা ছিল অরিজিনাল কোভিড-১৯ বা সারস-কোভ-২ ভাইরাস। কিছুদিন পর সেই ভাইরাসের মিউটেশন শুরু হল। প্রথমদিকে যে মিউটেশন হল তা আলফা মিউটেশন বা আলফা ভ্যারিয়েন্ট। পরবর্তীকালে আলফা ভ্যারিয়েন্টই প্রধানত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রথম ঢেউয়ের শেষের দিকে ভাইরাসের নতুন করে মিউটেশন শুরু হয়েছে। সাধারণত কোভিড-১৯ ভাইরাস শ্বাসনালীর উপরের দিকে থাকে। তারপর সেটা ধীরে ধীরে যখন নিম্ন শ্বাসনালীতে আসে, তার বেশ কিছুদিন পরে রোগীর নিউমোনিয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ভাইরাস নিজের বাঁচার জন্য মিউটেশন শুরু করল। স্পাইক প্রোটিনের মধ্যে যে এন টার্মিনাল রয়েছে, সেখানে গ্লাইকোপ্রোটিনের পরিবর্তন করতে শুরু করল। এই পরিবর্তনটাই ছিল ডেল্টা মিউটেশন।

এতে কী পরিবর্তন হয়।

ডেল্টা মিউটেশনের ফলে ভাইরাসের কিছু সুবিধা হল। যেমন, ভাইরাসটা উচ্চ শ্বাসনালীতে আর বেশিক্ষণ থাকে না, সরাসরি উচ্চ থেকে নিম্ন শ্বাসনালীতে চলে আসে। ফলে নিম্ন শ্বাসনালীতে যে সব এপিথেলিয়াম রয়েছে, সহজেই তার গায়ে আটকে থাকার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে যেদিন সর্দি-জ্বর শুরু হয়, তার থেকে দু'তিনদিনের মধ্যে নিউমোনিয়া শুরু হয়। পাশাপাশি ইমিউন সিস্টেম বিশেষ করে নিউট্রিলাইজিং অ্যান্টিবডি যে স্পাইক প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাইরাসকে আটকাবে, সেই সুযোগও কমে যায়। ফলে এই ভাইরাস

সহজেই ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং মারাত্মক নিউমোনিয়া হয়, যে কারণে অক্সিজেনও বেশি লাগে। এই যে স্পাইক প্রোটিনের এন টার্মিনালে পরিবর্তন করে নতুন ভ্যারিয়েন্ট এল, এতে কিন্তু ভাইরাসের বেঁচে থাকার এবং ছড়ানোর ক্ষমতা বেড়ে গেল।

ডেল্টায় সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতের অধিকাংশ জায়গায় ডেল্টা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় ঢেউয়ের চরিত্র দেখে বিশেষজ্ঞরা একে ডেল্টা ভ্যারিয়ান্টই বলছেন। সুতরাং, যেখানে যেখানে কোভিড হয়েছে, ধরে নিতে পারেন সেখানে ডেল্টা রয়েছে। বলা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় যত মানুষ কোভিডে সংক্রামিত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই কিন্তু ডেল্টা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়েছেন। পাশাপাশি তৃতীয় ঢেউ যদি আসে, তাতেও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট থাকারই সম্ভাবনা। এটা এমন একটা ভাইরাস যেটা মানুষের শরীরে এবং বাতাসে থাকার চেষ্টা করবে। সেইসঙ্গে ডেল্টা প্লাস, যা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের থেকে এক ধাপ এগিয়ে সেটাও কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

টিকায় কতটা সুরক্ষা

আমরা দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে দেখেছি, কেউ টিকার একটা ডোজ নিয়ে সংক্রামিত হয়েছেন, কেউ বা দুটো টিকা নেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছেন। কিন্তু টিকা নেওয়ার জন্যই তাদের রোগের তীব্রতা কম ছিল। অতএব টিকা সুরক্ষা দিচ্ছে। টিকা নেওয়া জরুরি। মনে রাখবেন, যদি তৃতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে ডেল্টা বা ডেল্টা প্লাস ভ্যারিয়েন্ট আসে এবং যাঁদের দুটো ডোজ নেওয়ার পর ১৫ দিন পার হয়ে গিয়েছে, তাঁদের সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা ৮৫-৯০ শতাংশ বেশি। এটাই টিকা নেওয়ার উপযোগিতা।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা

- অবশ্যই নাক-মুখ ঢেকে মাস্ক পরতে হবে
- অপ্রয়োজনে ঘোরাঘুরি থেকে বিরত থাকুন।
- শারীরিক দূরত্ব মেনে চলুন।
- বারবার হাত ধোয়া, স্যানিটাইজ করতে ভুলবেন না
- যাঁরা টিকা নেননি, তারা দ্রুত টিকা নিন।
- অল্পবিস্তর জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খাবেন।
- তাপমাত্রা মাপুন, জল বেশি করে খান, অক্সিজেন স্যাচুরেশন চেক করুন
- সুগার ও প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

প্রশ্ন- সোশ্যাল মিডিয়াতে ইতিমধ্যেই কোভিডের টিকা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। জানতে চাইছি কোন টিকাটি সবচেয়ে ভালো? কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন না স্পুটনিক?

উত্তর - এই তিনটে টিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা হয়েছে কোভিশিল্ড নিয়ে। কোভিশিল্ড টিকাটি মূলত ইউরোপের দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোভ্যাক্সিন ভারতীয় টিকা। এটা নিয়েও পরীক্ষা হয়েছে তবে কোভিশিল্ডের তুলনায় কম। আর স্পুটনিক এর পরীক্ষা হয়েছে মূলত রাশিয়াতে। প্রত্যেকটা টিকার ক্রিয়াশীলতা মোটামুটি ভাবে ৭৫ থেকে ৮৫ শতাংশের মধ্যে পাওয়া গেছে। কিন্তু এই তিনটি টিকার সরাসরি তুল্যমূল্য বিচার করে যে পরীক্ষা (হেড টু হেড) তা এখনও হয় নি। ফলে কোন টিকাটি অন্য টিকার থেকে বেশি উন্নত বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম সে ব্যপারে কোনও নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এদের সকলের ক্রিয়াশীলতা প্রায় সমান। সুতরাং যে কোনও একটা টিকা নিলেই হবে।

প্রশ্ন-অনেকের টিকা নেবার পর কোনও উপসর্গ হচ্ছে না। তার মানে কী টিকা কোনও কাজ করছে না?

উত্তর- এই ধরনের কোভিড টিকা নিলে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যেমন- জ্বর, গলাব্যাথা, গিঁটে

গিঁটে যন্ত্রণা, শুকনো কাশি, বমি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ হতে পারে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে কোনও উপসর্গই হয় না। কোন ব্যক্তির কতটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে তা নির্ভর করে ইমিউনিটি সিস্টেমের উপরে। অন্যান্য আরও কিছু বিষয় কাজ করে। তবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না হলেই যে টিকা কাজ করবে না এটা ঠিক নয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও টিকার ক্রিয়াশীলতার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন -কেন শুধুমাত্র বাহুতেই টিকা দেওয়া হচ্ছে? আমরা কি পায়ে বা নিতম্বে টিকা নিতে পারি?

উত্তর- প্রাপ্ত বয়স্কদের হাতের বাহুতেই টিকা দেওয়া হয়, কারণ বাহুর পেশীতে রক্ত চলাচল ভালো হয়। যেহেতু ডান বাহুতে দিলে কাজের অসুবিধা হতে পারে কারণ টিকা নেবার পর ব্যথা হতে পারে তাই বাম বাহুতেই টিকা নেবার চল আছে। ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে উরুতে টিকা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন- কোন ধরনের অ্যালার্জি থাকলে একজন মানুষ টিকা নিতে পারবে না?

উত্তর- সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যালার্জি থাকে। বিভিন্ন ওষুধে অ্যালার্জি, খাবার দ্রব্য যেমন - ইলিশ, চিংড়ি, বোয়াল মাছ, বেগুন, হাঁসের ডিম, সুগন্ধি দ্রব্য, মশা মারার ধূপ, ত্বকে বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি, হেয়ার কালার ইত্যাদিতে অ্যালার্জি থাকতে পারে। আবার কিছু কিছু মানুষের হাঁপানি জাতীয় অসুখ থাকে যা কখনও কখনও অ্যালার্জি থেকে হয়। এই বিভিন্ন বিষয়ে অ্যালার্জি থাকলেও টিকা নিতে কোনও অসুবিধা নেই। যদি না তার অতীত কালে টিকা নিয়ে কোনও অ্যালার্জি না হয়ে থাকে। যেমন কারোর কোভিডের প্রথম ডোজ টিকা নেবার পর অ্যালার্জি হয় তবে তিনি দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারবেন না।

প্রশ্ন- টিকা নেবার কতদিন পরে শরীরে কোভিডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে? কোনও টেস্ট বা পরীক্ষা করে কি শরীরের অ্যান্টিবডি জানতে পারি?

উত্তর- দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেবার ১৫দিন পর থেকে শরীরে যথাযোগ্য প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। হ্যাঁ, দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেবার ২৮দিন পরে রক্তে অ্যান্টিবডি টেস্ট করালে প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা জন্মাল সেটা জানা যেতে পারে। তবে দ্বিতীয় ডোজ টিকা নিলেও অনেকের শরীরে প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরি নাও হতে পারে। আবার শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যান্টিবডি থাকলেও তার যে ভবিষ্যতে কোভিড হবে না সে রকম নিশ্চয়তা কিছু নেই। ফলে কোভিডের অ্যান্টিবডি টেস্ট খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।

প্রশ্ন- দ্বিতীয় টিকা নেবার কতদিন পর্যন্ত শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে? টিকার তৃতীয় ডোজ নেবার কী প্রয়োজন পড়বে?

উত্তর - কোভিড ১৯ অসুখটা এতটাই সাম্প্রতিক এবং টিকাকরণের পরবর্তী অতিবাহিত সময় এতটাই কম যে এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট মন্তব্য করার সময় এখনও আসে নি। দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেবার কতদিন পর প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে সেটা একান্তই ব্যক্তিগত ও শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত পরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে কোভিডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা ৬ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। তৃতীয় ডোজ লাগবে কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না, এই নিয়ে গবেষণা চলছে। সেক্ষেত্রে একটা বুস্টার ডোজ দেবার প্রয়োজন হতে পারে।

প্রশ্ন- কোভিড টিকাকরণ সম্পূর্ণ করলে কি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ হয় না?

উত্তর- সরাসরি কোভিড টিকাকরণের সঙ্গে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমণের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে যেহেতু টিকাকরণ করলে কোভিড হবার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং স্টেরয়েডের ব্যবহারও কমে। এবং সেই সঙ্গে রক্তে উচ্চ শর্করাজনিত রোগের প্রার্দুভাবও কমে। এটা জানা আছে যে, স্টেরয়েডের ব্যবহার এবং ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমণের জন্য উত্তম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফলে কোভিডের টিকা নিলে পরোক্ষভাবে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমণের সম্ভবনা কমতে পারে।

প্রশ্ন- কোভিড অতিমারির তৃতীয় ঢেউ কেন শিশুদের বেশি আক্রমণ করবে?

উত্তর- কোভিডের তৃতীয় ঢেউ ও শিশুদের সংক্রমণ নিয়ে গবেষণা, আলোচনা চলছে। কিন্তু এর সত্যাসত্য নিয়ে ঠিক জানা নেই। দুটি সম্ভাবনার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রথমত যেহেতু ১৮ বছরের নিচে শিশুদের টিকাকরণ হয় নি এবং আগামী ৩ মাসে সব শিশুর টিকাকরণের সম্ভাবনা কম তাই শিশুরা বেশি সংক্রমিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত নতুন স্ট্রেন (লন্ডন স্ট্রেন) এর শিশুদের প্রতি বেশি আকর্ষণ থাকতে পারে।

প্রশ্ন- শিশুদের টিকাকরণ কবে নাগাদ শুরু হতে পারে?

উত্তর- চিন ও কানাডায় শিশুদের (১৮বছরের নীচে) টিকাকরণ শুরু হয়ে গেছে। আমার ধারণা যেহেতু ১৮-৪৫ বছরের টিকাকরণ এখনও অনেক বাকি আছে, শিশুদের টিকাকরণ শুরু হতে আরও দু'তিনমাস লাগবে।

প্রশ্ন- দ্বিতীয় ডোজ টিকাকরণের পরেও কেন মানুষ মারা যাচ্ছে?

উত্তর- যে কোনও টিকার ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা পাওয়া যায় না। কোভিড টিকার নিরাপত্তার হার ৯০-৯৫ শতাংশ। কমপক্ষে ৫ শতাংশ মানুষ টিকা নিলেও সংক্রমণের আওতায় থাকবে এবং তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ বা কো মর্বিডিটি যাদের আছে, যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি ও লিভারের অসুখ তাদের দ্রুত সংকটজনক হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিকাকরণের পরেও মারা যাচ্ছেন।

প্রশ্ন- যেহেতু তৃতীয় ঢেউতে শিশুদের সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি বলা হচ্ছে এবং টিকাকরণও হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তাদের কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে?

উত্তর- প্রথমত স্কুল বন্ধ রাখতে হবে। পড়াশোনা অনলাইনেই চালিয়ে যেতে হবে। বাইরে বেশি না বের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাড়ির মধ্যেই তাদের উপযুক্ত মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষ কারণে বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। বারবার হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা উচিত। ২ গজের দূরত্ব মানা অবশ্যই জরুরি। বিশেষ করে ভিড়ের মধ্যে বা কোনও অনুষ্ঠান শিশুদের না নিয়ে যাওয়াই উচিত। জল, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি খেলাধূলা, শরীরচর্চা করতে হবে। অভিভাবকেরা বা শিশুদের বাড়ির লোকেরা বাইরে থেকে এসে সাবান দিয়ে হাত না ধুয়ে, পোষাক না বদলে শিশুদের কাছাকাছি যাবেন না বা তাদেরকে স্পর্শ করবেন না। বাড়িতে প্রাপ্ত বয়স্কদের কারোর সর্দি কাশি বা জ্বর হলে তাকে আইসোলেশনে রাখতে হবে। তার কাছাকাছি গেলে শিশুটিকেও মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

সেদিনের শিলিগুড়ি

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে প্রকাশিত পুরাতন একটি গ্রন্থ কলেজস্ট্রিট ফুটপাত থেকে সংগ্রহ করি। দুর্ভাগ্য, প্রথম কয়েকটা পৃষ্ঠা উধাও। লেখকের নাম তাই অজানা। বইটির নাম ''ভগবান দুর্জয়লিঙ্গ দর্শন যাত্রা''। তাঁর লেখায় পাই 'শিলিগুড়িতে অবতরণ করিয়া, বিশ্রামস্থান অভাবে আমরা মহাবিপদগ্রস্ত হইলাম। মহানন্দা নামক এক স্রোতগামী নদী দেখিতে পাইয়া তথায় গমন করতঃ অবগাহন করিয়া তৃপ্তিলাভ পূর্বক বন্ধুর সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...বহু সন্ধানের পর পূর্ব পরিচিত বন্ধু বিনোদবিহারী লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম' ... 'উক্ত বাসায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেদিনকার জন্য বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহাদের যত্নে আমরা সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।''

সুলেখক পরিমল গোস্বামী তার 'স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে শিলিগুড়ি প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গিয়েছেন। সম্ভবতঃ ১৯১৩ সালে দার্জিলিং যাওয়ার পথে দামুকদিয়া ঘাট পেরিয়ে সান্তাহারে ট্রেন বদল করে হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি আসেন তিনি। সেইসময় বর্তমান টাউনস্টেশনের নাম ছিল শিলিগুড়ি স্টেশন। দু'খানা ট্রেন ছেড়ে যেত শেয়ালদা যাওয়ার জন্য। একটি দার্জিলিং মেল অপরটি নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস। যাই হোক পরিমলবাবু রসিকতা করে লিখছেন, তখন প্ল্যাটফর্মে লাগেজ রেখে অনায়াসে খাবারের সন্ধানে যাওয়া যেত। চোর ছ্যাঁচোড় ছিল না। আর রাইমোহন চক্রবর্তী ১৯৪২ সালে 'ভ্রমণে দর্শন' নামক বইটিতে লেখেন, শিলিগুড়ি স্টেশনে নেমে ক্ষীরের শিঙাড়া কিনে খেয়েছিলেন এবং শিলিগুড়ি থেকে প্রেমের হীরক পেয়ে যান। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। আসলে শিলিগুড়ির গুরুত্ব ছিল এ রকম, 'টেক রেস্ট অ্যান্ড গেট ফ্রেশ। এখান থেকে খেলনা ট্রেনে চেপে সবাই যেতেন দার্জিলিং কালিংপঙ। দু'দণ্ড বিশ্রামের জন্য শিলিগুড়িতে নামা ও অপেক্ষা করা। ১৮৭৮-এ শিলিগুড়ি স্টেশন তৈরি হলে ১৮৮০ থেকে খেলনা ট্রেনের ছোটাছুটি। শিলিগুড়ি স্টেশন এখন টাউনস্টেশন নামে পরিচিত। হেরিটেজ তকমা জুটলেও জরাজীর্ণ, পলেস্তরা খসা ভগ্নদশা দেখে সত্যি চোখে জল আসে। তিস্তা ভ্যালি রেলপথ ছিল গেলখোলো পর্যন্ত। তারপর কালিম্পং। এখন আর কিছু নেই। শিলিগুড়ির প্রাচীনত্ব বিষয়ে সঠিক বলা কঠিন, তবে শতবর্ষ পেরিয়ে তার বয়স এখন ১১১। সেদিনের শিলিগুড়ি নিয়ে গর্ব করার মতো কিছুই ছিল না। মুষ্টিমেয় লোকজন বসবাস করত। চারিপাশে ঘন জঙ্গল। হিংস্র শ্বাপদসংকুল, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের ডিপো। ভয়ে অনেকে পালিয়ে যেত। কারণ, কী নিয়ে বসবাস করবে? যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অতীব করুণ। পালকি, ডুলি, ঘোড়া, গোযান, ভইষাগাড়ি, না হলে

ভরসা পদযুগল। হিলকার্ট রোডের জন্মের আগে এবং পরেও বাঘ, হাতি, লেপার্ড দিনেদুপুরে ঘুরে বেড়াত। বাঘের গর্জন শোনা যেত। এখন এ কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। শিলিগুড়ি সম্পর্কে দু'চার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্, লেখক ও পরিব্রাজক ডঃ জোসেফ ডালটন হুকার। তারই লেখা মূল্যবান বই (বর্তমানে দু'খণ্ডে পাওয়া যায়) Himalayan Journals-এর কয়েকটি পাতায়। স্বচ্ছসলিলা বালুপাথরে মিশ্রিত মহানন্দার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৪৯ সালে তিনি লেখেন, 'I rested an hour at Siligoree Bunglow. Wooden Terai at Siligoree Bamboo– Pepul Betel Village', হুকারের বর্ণনা যখন পড়ি রীতিমতো রোমাঞ্চ জাগায়। হুকারের মতনই সুখপাঠ্য ডাঃ ডেভিড ফিল্ড রেনীর অতীব দুষ্প্রাপ্য বই The Story of Bhotan and the Doars War. ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিস্তা পাড়ে তাবু খাটিয়ে রাত্রি যাপন ক্ষণে ক্ষণে বিঘ্নিত হতে থাকে শেয়ালের হুক্কাহুয়া রবে। তাবুর চারপাশে শিয়ালেরা ঘুরঘুর করছিল। অতিষ্ট হয়ে রেনী তাবু গুটিয়ে দলবল নিয়ে Siligoree-র দিকে রওনা দেন। কারাগোলা থেকে দূরত্ব ১২২ মাইল। দার্জিলিং ৪০ মাইল। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন মহানন্দার কাকচক্ষু জল এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে লেডি ক্যানিং-এর মৃত্যুর ঘটনা। রেনীর বই শুধু শিলিগুড়ি নয়, ডুয়ার্স এবং লেপচাদের ডালিম ডামসাঙ দুর্গ, যুদ্ধ বহু ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ।

১৯২২ সালে দার্জিলিং-সহ তিনটি মহকুমার মজাদার চমৎকার তথ্যনির্ভর বিবরণ পাই ই. সি. ডোজির 'কনসাইজ হিস্ট্রি অফ দার্জিলিং' গ্রন্থটিতে। ডোজি মহাশয় শিলিগুড়ি প্রসঙ্গে অনেক কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন– The tourist must halt at Siliguri if he does the Tista Valley Trip. The Town Siliguri came into being in the year of.....when the metregauge line was completed from Saraghat to this station. সে সময় তিনটি ন্যারোগেজ শিলিগুড়ি থেকে তিনটি দিকে ছেড়ে যেত। (ক) ডি. এইচ. আর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (খ) তিস্তা ভ্যালি রেলওয়ে (গ) বাগডোগরা নকশালবাড়ি হয়ে কিষানগঞ্জ পঞ্চনই জংশন থেকে আলাদা হত এবং তিস্তা ভ্যালি রেলপথ রোড স্টেশন থেকে আলাদা হয়ে...বিধান রোড হয়ে সেবকের দিকে পাড়ি দিত। রোড স্টেশনের চিহ্নমাত্র নেই। জায়গাটা এখন হাশমিচক (ভেনাস মোড়) নামে পরিচিত। প্রতিবাদ আন্দোলনের বেদী বা মঞ্চ বলা যায়। উত্তরে মহানন্দা নদী, দক্ষিণে শহর শেষ বাবুপাড়ায়। এখনকার হাকিমপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, লেকটাউন তখন জনবসতির চিহ্নমাত্র নেই। সব ছিল জলাভূমি, ধানক্ষেত, প্রায় সব একতলা টিনের চালের বাড়ি ... অনেক বাড়ি হত বনবাংলোর মতো। ... কেরোসিনের আলো জ্বলত রাস্তার ধারে সন্ধ্যার পরে। সেই টিমটিম আলো অন্ধকারকেই যেন ঘনতর করত। একজন সন্ধ্যাবেলায় মই নিয়ে এসে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দিতেন। অক্টোবর থেকে শীত জাঁকিয়ে পড়ত। বৃষ্টি শুরু হলে সেই ধারাপতন চলত পাঁচ-ছয় দিন ধরে একটানা। গাছপালা, ঘাস একেবারে ঘনসবুজ হয়ে যেত। টিনের চালের উপর অবিরাম বৃষ্টিপতনের ধ্বনি খুবই রমণীয় ছিল।..." অনবদ্য স্মৃতি কথন সুলেখক শিলিগুড়ির প্রবীণ সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার তাঁর 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসায়" লিখেছেন

পুরবার্তা ২০২১

— 'সন্ধ্যার পর প্রধান সড়ক হিলকার্ট রোডে নিশুতি আঁধার নেমে আসে। স্টেশন রোড, রোডস্টেশনের কাছে একলা যেতে গা ছমছম করত। বর্ধমান রোড দিনের বেলাতে জনবিরল ছিল। ৫০/৬০ এর দশকের শিলিগুড়ির চমৎকার জলছবি কবিবন্ধু সমীর চট্টোপাধ্যায়ের চোখে — সরকারি করাত কলের সস্তা কাঠের বাড়ী, খেলনা ট্রেন, ল্যান্ডরোভার পাশাপাশি ছুটে যায় হিলকার্ট রোডে। কালু ডাক্তারের চেম্বারে রোগীদের ভিড় .... নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কাকা উঠে যাচ্ছে দোতালা ঘরে। মহানন্দার জলে তিনধারিয়ার আলোকমালার ছবি।...

শিলিগুড়ির পুরোনো চালচিত্র আর মজাদার গল্প শোনাতেন নানুদা ওরফে নারায়ণ মিত্র। ''বুঝলে গৌরী তখনকার শিলিগুড়ি প্রায় বিস্তীর্ণ ধু ধু মাঠ ঝোপঝাড় ছিল। সরু মেঠো পথ। ..মহানন্দা পুলটি ছিল ট্রেনের পাতের রেলিং এবং হারমোনিয়াম রিডের মতো ফালি ফালি কাঠের পাটাতনের তৈরি রেল কাম মোটর ব্রিজ। পুলে ট্রেন উঠলেই শহর জুড়ে শোনা যেত 'গুম গুম' বিকট শব্দ। শাল খুঁটিতে গ্যাস লাইট চালু হল, দেখাশোনা করতেন ললিতমোহনধ্বনি। সবার কাছে পরিচিত ছিলেন 'খ্যাপাদা' নামে। গ্যাসলাইটের ব্যবস্থা করেছিল ইউনিয়ন বোর্ড। তখনও পৌরসভা গঠিত হয়নি।'' পুরোনো শিলিগুড়ির কত শত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন সুরসিক সাংবাদিক নৃপেন বসু। পেশায় ছিলেন যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিক। বাটাগলিতে নৃপেনদার আদ্যিকালের কাঠের দোতালা যেমন ছিল সে রকমই আছে। খুবই আড্ডাবাজ ছিলেন। নৃপেনদার বাড়ির কাছেই থাকতেন সমাজসেবী কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিপ্লবী চারু মজুমদার। নৃপেনদার আড্ডার চমৎকার স্মৃতিচিত্রণ ফুটিয়ে তুলেছেন অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় তার উত্তরবঙ্গ ফিরে দেখা' বইটিতে। ;তিন বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছিল শিলিগুড়ি শহর;হিলকার্ট রোড, সেভোক রোডের দুপাশে ঘরবাড়ি আর আমাদের এই মহানন্দাপাড়া, দ্বারভাঙাটোলা, ডাঙিপাড়া, শিলিগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন রেল কলোনিটি, টিকিয়াপাড়া নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯১৬-১৮ সালে বাবুপাড়ার সূচনা। ক্ষুদিরাম পল্লির দু'একটি বাড়ির উপর থেকে আরম্ভ করে সোজা পূর্বদিকে বর্তমান হাকিমপাড়া, বিবেকানন্দ পল্লী, রবীন্দ্রনগর ছাড়িয়ে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল পর্যন্ত ছিল চাষের জমি। এস.ডি.ও. কোয়ার্টার্সের পূর্বদিকে কয়েকটি কাঠের বসতবাড়ি তৈরি হলে নামকরণ হয় ... হাকিমপাড়া। শিলিগুড়ির উপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ ''একটি জনপদের কাহিনিতে প্রদ্যোৎকুমার বসু মহাশয় লিখেছেন;১৯২৩ সাল। শিলিগুড়ি তখন একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র। টাউন বা শহর বলা চলে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক শিলিগুড়ি জনপদের চেহারা ছিল। এইরূপ 'উত্তর ও পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে বর্ধমান রোড থেকে ... স্টেশন ফিডার বা বাজার থেকে উত্তরমুখী হয়ে মহানন্দা পুল পার হয়ে হিলকার্ট রোড নামে পরিচিত থানা ও বাবুপাড়া ও কৈরীপাড়া। পূর্বে পোস্টাপিস, হাসপাতাল, আদালত, পুরাতন জেলখানা ও রেলওয়ে স্টেশন এবং ন্যারোগেজ ও তিস্তা ভ্যালি, মিলিটারি ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড এস.ডি.ও.-র খড়ের বাংলো, আদালতের কাজকর্ম, মিত্র সম্মিলনী, সংস্কৃতির

কর্মকাণ্ড, রাজনীতিক বিষয় ইত্যাদি অনেক তথ্য রয়েছে বইটিতে। 'শিলিগুড়ির ইতিবৃত্ত'র রচয়িতা বিজয়চন্দ্র ঘটক মহাশয় শিলিগুড়ির পুরোনো দিনের বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর গ্রন্থটিতে। সেবক রোডে ঘটক ম্যানশন আজও মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান। এই শহরের বহু অজানা তথ্য সমাজ, সংস্কৃতি, বিনোদন, শিক্ষা-দীক্ষা প্রাচীন মানুষজনদের পরিচয় তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থটিতে। বিজয়বাবু তরাইয়ের বুকে শতবর্ষপ্রাচীন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। 'শিলিগুড়ির উত্তরণ'র লেখক বকুল দে লিখেছেন, অজস্র ইতিহাস লুকোনো আছে শিলিগুড়ির আনাচে কানাচে। প্রতিটি বাড়িতে, রাস্তায়। 'শিলিগুড়ি ইতিবৃত্ত'র ইতিহাসের লেখক শিবপ্রসাদবাবুর বই পড়ে জানতে পারি গত চল্লিশের দশকে বিয়ের বাজার, পুজোর বাজার, ডাব ছোটখাটো তাজা মাছ কিনতে ছুটতে হত জলপাইগুড়িতে। ১৯২৫ সালে শিলিগুড়িতে প্রথম বাস চালু করেন হুজুর সিং, পরে ফোর্ড কোম্পানির বাস চালায়। শিলিগুড়ি থেকে ইসলামপুর, কিষানগঞ্জ, তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাস চলত।

প্রয়াত চোমং লামা ওরফে বিমল ঘোষের 'চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ'-এ লিখেছিলেন শিলিগুড়ির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বলতে তেমন কিছু নেই। একশো বছর আগে শিলিগুড়িতে মাত্র চারটি পরিবার আর সেই চারজনের মধ্যে একজন ছিলেন হরসুন্দর মজুমদার। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখাপোধ্যায়। বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

শিলিগুড়ির পুরাতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'চলিত কথা' থেকে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক সংবাদ পাঠকের কাছে তুলে ধরছি। হারানো অতীত মনে হবে আবার বুঝি ফিরে এল। প্রথমটি শিলিগুড়ি থানা প্রসঙ্গে। ''... বাঁশের বেড়ায় ঘেরা শিলিগুড়ি থানা গৃহটি অতীদের স্মৃতি বহন করিতেছে। থানায় একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ অফিস, সাক্ষাৎকার। লকআপটি যেন অন্ধকূপ। বাতি বলতে একটি হ্যাজাক ... তাও আবার হাপানি রুগীর ন্যায় একেবারে চলিতে পারে না। মাঝে মাঝে দম লইতে হয়। অধিক রাত্রে যখন ডিউটি বদল হইয়া হ্যাজাকের পরিবর্তে লণ্ঠন আসে, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলা দিয়া অন্ধকারের মধ্যে থানার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা এভারেষ্ট বিজয়ের ন্যায় দুঃসাহসিক হইয়া পড়ে। ('চলতি কথা', সম্পাদক নৃপেন বসু, বৃহস্পতিবার, ৬ই আগষ্ট, ১৯৫৩)

দ্বিতীয় সংবাদটি এভারেষ্ট বিজয়ের পর তেনজিং নোরগের শিলিগুড়ি আগমন এবং অভিবাদন জ্ঞাপন।

৬ই আগষ্ট বৈকাল ৩.৩০ মিঃ-এ এভারেষ্ট বিজয়ী শ্রী তেনজিং গোরগে স্ত্রী-কন্যাদ্বয় সহ বাগডোগরা বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেন। মহকুমা শাসক শ্রীরামপ্রসাদ গাঙ্গুলী এবং বাগডোগরার পক্ষ হইতে পি চৌধুরী শ্রীতেনজিংকে মাল্যদান করেন। তিলক ময়দানে শিলিগুড়ির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে অর্পণা মজুমদার অভিনন্দনপত্র দেন। পৌরসভার সহ-সভাপতি ব্রজেন বসু রায় চৌধুরী একখানি মানপত্র ও স্বর্ণপদক অর্পণ করেন। শিউমঙ্গল সিং স্বাগত জানাইয়া বক্তৃতা দেন। (৬ই আগষ্ট, ১৯৫৩)

বন্ধুবর সৌমেন নাগ একাধারে শিক্ষক, সাংবাদিক এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তার 'কাঞ্চনজঙ্ঘার অশান্তির আগুন'

নামক বইয়ে শিলিগুড়ি প্রসঙ্গে লিখেছেন - শিলিগুড়ি ছিল বৈকুণ্ঠপুরের অংশ ... লেপচা ভাষায় 'শিলি' শব্দের অর্থ প্রচুর বৃষ্টি। অতীতে লেপচা জাতির পশুপালকেরা শীতের সময় মেষ-ছাগল নিয়ে মহানন্দা উপত্যকায় নেমে আসত। এখানে শুকনার কাছে রংটং যেটি লেপচা ভাষার অন্তর্গত পরবর্তীকালে রাজবংশীরা যখন এলেন তখন 'গুড়ি' শব্দটা যুক্ত করেন, যার অর্থ স্থান। যেমন ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি ইত্যাদি। বন্ধুবরের বক্তব্য সবাই মেনে নেবেন কিনা জানি না, তর্কের অবকাশ আছে।

'শিলিগুড়ির কড়চা' লিখে বিখ্যাত হয়েছেন প্রয়াত দুলাল চন্দ্র দাস। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দোতালায় নিজস্ব কুঠুরিতে বসে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে যেমন আলোচনা করতেন তেমনি শিলিগুড়ির অতীত, হারানো মণিমাণিক্য খুঁজে বেড়াতেন ভালোবাসতেন। যথেষ্ট যত্ন পরিশ্রম গভীর অনুসন্ধিৎসার ফসল শিলিগুড়ির কড়চা। যেমন বন্ধুবৎসল আড্ডাবাজ, সংস্কৃতিমনস্ক। আমার সহপাঠী সুহৃদ দেবাশিস চক্রবর্তীর ''বিবর্ত শিলিগুড়ি'' মূলত স্মৃতিনির্ভর লেখা। তবে কর্মময় সংগ্রামশীল জীবন সমস্যা সংস্কৃতির রাজনীতির প্রেক্ষাপট আলোচনা করছেন নিঃসন্দেহে কৌতূহল জাগায়। দেবাশিস নিজেই বলেছেন 'বিবর্ত শিলিগুড়ি সঠিক অর্থে ইতিহাস নয়।' লেখকের দেখা শিলিগুড়ি শহরের বিবর্তনের একটি ধারাবিবরণী বলাই ভালো...। সম্প্রতি বন্ধুবর অশোক গঙ্গোপাধ্যায় 'শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমাপরিষদ' (ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী) ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সুচারু ভাবে বর্ণনা করেছেন।

শিলিগুড়ির একঝলক

১। ১৮৬৪-১৮৭৭, ফাঁসিদেওয়াতে ছিল শিলিগুড়ি মহকুমা দপ্তর।
২। ১৮৭৮-এ শিলিগুড়ি মহকুমা।
৩। ১৯৮০-এ প্রথম বিদ্যালয় পাদরী সাহেব প্রতিষ্ঠিত। হাটখোলায় ডি.আই. ফান্ড মার্কেটে।
৪। শিলিগুড়ির প্রথম সাংস্কৃতিক মঞ্চ মিত্র সম্মিলনী - ১৯০৯
৫। প্রথম নার্সিংহোম 'রায় নার্সিংহোম, হাকিমপাড়া। বর্তমানে ঋষি অরবিন্দ রোড।
৬। ১৯৩৮ - শিলিগুড়িতে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়।
৭। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন জর্জ মোবার্ট।
৮। ছাদযুক্ত পাকা বাড়ি থানার কাছে। হরসুন্দর মজুমদার মহাশয়ের। যার নামে হরসুন্দর পাবলিক লাইব্রেরী। ইঁট আসত সৈয়দপুর থেকে।
৯। প্রথম আবাসিক হোটেল 'ডায়াম হোটেল'। মালিক ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। স্থাপিত হয় ১৯১৬ সালে।
১০। শিলিগুড়িতে প্রথম কালীমন্দির - 'মা আনন্দময়ী'। স্থাপন করেন চারণকবি মুকুন্দ দাস ১৮৯৫ সালে।
১১। ১৯০৭-এ মহানন্দার উপরে লোহার পুল।
১২। ১৯৪৫ দেশবন্ধু স্পোটিং ক্লাব।
১৩। ১৯৪৮ - রামকৃষ্ণ ব্যায়াম সমিতি। স্থাপয়িতা কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য- লক্ষ্মী ভট্টাচার্য।
১৪। ১৯৪৯ পৌরসভা। মহকুমা শাসক প্রথম চেয়ারম্যান। জনপ্রতিনিধি হন বীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার। ১৯৫৭ সালে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। শুরুতে পৌরসভা মেঘদূতের বিপরীতে লম্বা টিনের ঘরে।
১৫। রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় শিলিগুড়ি পৌরসভার শিলান্যাস করেন। ১৯৬০ সালে বীরেশ্বর মজুমদার উদ্‌ঘাটন করেন।
১৬। আঠারখাইয়ে ১৯৬২, ১লা নভেম্বর-তে রাজরাম মোহনপুরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭। ১৯৬২তে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। সুশ্রুতনগর

১৮। ১৯৬৩তে আকাশবাণী শিলিগুড়ি স্থাপিত হয়।

১৯। ১৯৬৩তে চম্পাসারি, বারঘরিয়া, পাথরঘাটা, আঠারখাই,গোঁসাইপুর, জালাস অঞ্চল ঘোষিত হয়।

২০। প্রথম ডাকবাংলো প্রসন্নদেবের নামে। এস.এফ. রোডে। দ্বিতীয়টি আদালতের কাছে ছিল। ডোজির বইয়ে উল্লেখ আছে।

২১। তরাইয়ের প্রথম সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদমূলক মাসিক পত্রিকার নাম ছিল মহানন্দা। সম্পাদক ছিলেন অরুণ মৈত্র। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রবীর গোস্বামী, সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, অম্বিকা চক্রবর্তী। নৃপেন বসুর বাড়ীতে মহানন্দার কার্যালয় ছিল। ছাপাখানা জাতীয় সমবায় ভান্ডার প্রেস। শ্রীভবনের ভিতরে। আজো সচল। মূলকারিগর ছিলেন কালীপদ ধর।

২২। বেঙ্গল রাইস মিলের মালিক ছিলেন শেঠ শ্রীলাল গোয়েঙ্কা।

২৩। ১৯৫২ - বিদ্যুৎ সংযুক্ত হয়। কার্শিয়াং হাইডেল প্রজেক্ট থেকে। রোহিনী, খাপরাইল হয়ে।

২৪। ১৯২৬ - সরকারি করাত কল

২৫। ১৯৫০ - ২৩শে আগষ্ট শিলিগুড়ি কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথম পাঠ শুরু হয় বয়েজ স্কুলে। বয়েজ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮ সালে।

২৬। ১৯২৫ - শিলিগুড়ি থেকে প্রথম বাস চলতে শুরু করে। বাস মালিক ছিলেন হুজুর সিং।

২৭। কথাকলম প্রথম থিয়েটার গোষ্ঠী।

২৮। ১৯৮১ সালে মন্ত্রী দাওয়ালামা ডাবগ্রাম মহিলা কলেজ উদ্‌ঘাটন করেন।

২৯। শিলিগুড়ি থানা - ১৯০৩। জমিদাতা ছিলেন বীরেনরায় সরকার।

৩০। শিলিগুড়িতে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯২৪ সালে — নাম 'হরিশচন্দ্র'।

৩১। ১৯২৪ সালে প্রথম দুর্গাপুজা। উদ্যোক্তা গুডস ক্লার্ক সূর্য নারায়ণ চক্রবর্তী।

৩২। এস.জে.ডি.এ ১৯৮০, পয়লা এপ্রিল।

৩৩। প্রথম টেলিফোনএক্সচেঞ্জ (বাণী লাইব্রেরীর উল্টোদিকে) ১৯৪৮-এ।

৩৪। ১৯৫০-এ শিলিগুড়ি জংশন স্থাপিত হয়।

৩৫। ১৯০১ - শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল ৭৩৮ জন।

৩৬। ১৯৯০ - ১২ই মে শিলিগুড়ি কর্পোরেশন

৩৭। ১৯২৪-২৫ সালে শিলিগুড়ি আদালত নির্মিত হয়।

৩৮। ১৯৮৮, ১২ জানুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম

৩৯। শিলিগুড়ির প্রথম বইয়ের দোকান 'শিলিগুড়ি বুকস্টল'। ১৯৫০ হিলকার্ট রোড। ১৯৫২ স্থাপয়িতা জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

৪০। শিলিগুড়ির প্রথম এম.বি. ডাক্তার গোপাল চন্দ্র ঘোষ

৪১। সাদা কালো ছবি তোলার জন্য প্রথম স্টুডিও শান্তি সিনহার 'সিনহা স্টুডিও'।

৪২। শিলিগুড়ির একনম্বর সেরা মিষ্টি ক্ষীরের সিঙ্গারা হীরালাল ঘোষের এবং মনুয়ার প্যাড়ার দোকান। শতবর্ষ প্রাচীন মিঠাই দোকান মুঙ্গারাম। আজো সগৌরবে চলছে।

৪৩। প্রথম খানদানী অভিজাত রেস্তোরাঁ ছিল রেলের ডি. সরাবজী এন্ড কোং। সাহেব মেমদের প্রাধান্য ছিল বেশ। নেটিভদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

৪৪। গো-যানের আড্ডা ছিল বর্ধমান রোডে হাওড়া পেট্রল পাম্পের কাছে। মালিকানায় মেসার্স বর্ডে এন্ড কোং।

৪৫। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য পদ্মজা নাইডু।

৪৬। পাঙ্খাবাড়ী রোড ১৮৪০। দার্জিলিং জেলার প্রথম রাস্তা। শিমুল বাড়ী, গাড়ীধুরা, পাংখাবাড়ি, মকাইবাড়ী, কার্শিয়াং হয়ে সেঞ্চল দার্জিলিং। নাম ছিল 'ওল্ড মিলেটারি রোড'।

৪৭। ১৯৫৯-এ দলাই লামা শিলিগুড়িতে আসেন তিব্বত থেকে।

৪৮। শিলিগুড়ির প্রথম সিনেমা হল 'তৃপ্তি টকীজ'। ১৯৩৯-এ শুরু।

কথামালা

বিপুল দাস

আমার জন্ম শিলিগুড়ি হাসপাতালে। আমার ১২/১৩ বছর বয়স পর্যন্ত সেই হাসপাতালটা ছোটই ছিল। তখন কখনও সেটার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় খুব আপন মনে হত ঘরগুলো। তারপর কবে সেই একতলা ছোট্ট বাড়িটা ভেঙে দোতলা হ'ল, ক্রমে তিনতলা, চারতলা, বড় বড় বিল্ডিং, আলাদা আলাদা বিভাগ। এখন কতবার সেই হাসপাতালের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করি। এখন আর সেই অনুভূতি হয় না। একবারও মনে পড়ে না এখানেই কোনও এক এগারই শ্রাবণ, বুধবার অঝোর ধারায় ভুবনজোড়া কান্নার মাঝে আমার প্রথম কান্না মিশে গিয়েছিল।

নদীর পারে শিমুলতলায় বসে একা একা কত সময় কেটেছে আমার। ওপারে পলাশবন। বসন্তে এপার থেকে দেখি ওপারে থোকা থোকা আগুন। একা একা সেই আগুন দেখি। অস্পষ্ট, কেমন একটা ছুঁই-ছুঁই-করেও ছুঁতে না পারার ইশারা আমার বুকের ভেতরে খেলা করে। ভরা বর্ষায় পাহাড় গড়িয়ে আসে গেরুয়া জলের স্রোত। পাহাড়ে ধস্ নামে। শেকড়সুদ্ধ চা-গাছ, শালগাছ, মরামানুষ ভেসে যায়। একবার উপুড় হয়ে ভেসে যাওয়া সাদা লাশ দেখেছিলাম। ছিপ দিয়ে চ্যালামাছ ধরছিলাম। উত্তরে উজান থেকে একজ লোক চিৎকার করে আমাকে কী যেন বলছিল। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। সে হাত ইশারা করে আমাকে পার থেকে দূরে সরে যেতে বলছিল। হঠাৎ নাকে বিকট একটা পচা গন্ধ এল। দেখলাম একটা মরামানুষ, ফুলে ঢোল, ভেসে যাচ্ছে। খুব ভয় পেয়েছিলাম। সেই গন্ধ এখনও মাঝে মাঝে নাকে আসে। অনেক দিন একা মাছ ধরতে যাইনি।

এখন আর সে নদী চিনতে পারি না। এখন নদীর পারে কখনও দাঁড়ালে বুঝি নদী আর আমার নেই। আমার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। ওপারে সেই পলাশবন এখন বিশাল বসতি। এপারে নদীপার বলে কিছু নেই। নদী অনেক দূরে সরে গেছে। পাড়জুড়ে লোকালয়। দোতলা বাড়ি। সেখানে টিভি চলছে। যেখানে ছিল বালুচর, বুনোকুলের ঝোঁপ , সেখানে পাকা রাস্তা। নিউতরুণ বয়েজ ক্লাব। আর আমার সেই স্বচ্ছসবুজ জলের টলটলে নদী, স্পষ্ট নুড়ি দেখা যেত, সে নদী অতি শীর্ণ, দীর্ণ, সমস্ত শহরের আবিলতা নিয়ে বিষাদময় এক ভিখারিনির মত বয়ে যায় দক্ষিণে। তার এই ক্লেশভার, এই অপমান দেখে আমার চোখে জল আসে। এই নদীতে একা এক দুপুরে মাছ ধরার সময় প্রথম সাদালাশ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম। তখন ধানখেতের আলের ওপর দিয়ে স্কুলে যাই। বর্ষাকালে আল ডুবে

থাকে। তখন ঘুরপথে পালবাড়ির পেছন দিয়ে যাওয়া হয়। যে রাতে খুব বৃষ্টি নামে, পরদিন সকালে সব জল-থৈথৈ। ধানখেতের সব জল যেখান দিয়ে সাদা ফেনা তুলে বড় মাঠে পড়ছে, সেখানে হাতজাল ধরে স্রোতের উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে থাকে বদনড্রাইভার। চকচকে পুঁটিমাছের ঝাঁক লাফ দিয়ে দিয়ে জালে পড়ে। দেখতে থাকি। স্কুলের দেরি হয়ে যায়। শীতকালে পায়ের ওপর আমন ধানের শিষ লুটিয়ে পড়ে। ধানকাটা হয়ে গেলে স্কুলে যাওয়ার পথে খা খা মাঠের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরেও কেমন শূন্যতা এসে ভরে যায়। বেলা সাড়ে দশটার সময়ও মাঠের শিশির শুকোয় না। আকাশ মেঘলা, উত্তুরে হাওয়ায় ছেঁড়া সোয়েটারের ভেতরে আরও কুঁকড়েমুকড়ে যাই। ধানগাছের গোড়া থেকে ব্লেড দিয়ে নাড়া কেটে বাঁশি বানাই।

এক ভিক্ষু 'জল দাও' বললে চণ্ডালিকার হাত কেঁপে উঠেছিল। বেঁচে থাকার জন্য জলহীন মানুষও কাতর প্রার্থনায় দু'হাত তুলে ধরে চণ্ডাল আকাশের দিকে। আল্লা মেঘ দে, আল্লা পানি দে। বেঁচে ওঠার মন্ত্র, বেঁচে থাকার কলমা। সৃষ্টির আদিতে দেখ সেই কারণবারি। মাতৃগর্ভের পিচ্ছিল তরল। অন্ধকারময়। ওম্‌ধ্বনি-এই প্রণবধ্বনি উচ্চারিত হলে প্রসবকালীন জল ভাঙে। জলই তো প্রাণের গোপন কথা।

H_2O – এই সংকেত বড় শুকনো। মানুষের বুকের গভীরে যে টলটলে জল, তার কোনও খবর দিতে পারে না এই সংকেত। এই ফর্মুলায় প্রকৃত জলের বড় অভাব। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশে সাম্রাজ্য বিস্তারকারী জলের কথা, লক্ষ লক্ষ জলচর প্রাণীর কথা, গঙ্গা, নীলনদ, হোয়াং হো, এমন কী ছোট্ট ধরলা ও তার পারে ফাঁদেপড়া বগার কথা কিছুই বলা হয়ে ওঠে না এই ফর্মুলা দিয়ে।

লাইফলাইন বলে যদি কিছু থাকে, তবে সেটি জলপ্রবাহ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই প্রবাহ প্রকৃতপক্ষে রক্তবাহী ধমনি। নাব্য নদী বেয়ে আসে ভাস্কো দা গামা, জোব চার্ণক। নগর সভ্যতার পত্তন হয়। বণিক যায় এলাচ, লবঙ্গ, চিনাংশুক, চুয়াচন্দন নিয়ে। নদীপথে চলেছেন একজন পর্যটক আমাজনের উৎস সন্ধানে। নদীপথে চলেছেন ধর্ম-প্রচারক। কারও হাতে বাইবেল কারও হাতে তথাগতের বাণী। নদীপথে চলেছে হাসেম আলি, কাঁধে মাছধরার জাল। নদীপথে বোটের ওপর বসে আছেন কবি। এই জলেই আমাদের তর্পণ। আমাদের সব অনুতাপ অঞ্জলি করে ভাসিয়ে দিই গাঙের জলে। দূর দক্ষিণে ভেসে যায় একমুঠো ফুল। এই নদী বেয়ে এক নারী পৌঁছে যায় ইন্দ্রের সভায়। ছিন্ন খঞ্জনার মত নাচে। নদীর মতই জীবনপ্রবাহ এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

''সম্মুখের বাণী/নিক তোরে টানি/মহাস্রোতে/পশ্চাতের কোলাহল হতে/অতল আঁধারে অকূল আলোকে...''

পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমেই মহানন্দা সমতলে এসেছে শিলিগুড়িতে। পাহাড় গড়িয়ে পাথর আসে। পাথর গড়িয়ে চূর্ণীভবন চলে দীর্ঘকাল ধরে। নদীর গর্ভে বালি জমে। এখন ওই রুগ্ন, কঙ্কালসার নদীর দিকে তাকালে আমার

বুকের ভেতরে কষ্টটা টের পাই। থাক, আমি দুঃখটা বালিচাপা দিয়ে রাখি।

কিছুদিন আগে আগে হঠাৎ মনে হ'ল যাই, একটু সেই নদীকে দেখে আসি। আমার প্রিয় মহানন্দা। রাস্তা পার হয়ে নতুন বসতির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদী আর খুঁজেই পাই না। এ কী রে বাবা, পুকুরচুরি শুনেছি, আস্ত নদীটাও চুরি হয়ে গেল নাকি। যেখান দিয়ে হেঁটে এলাম, একদিন সেখানে ডুবজলে সাঁতার কাটতাম। অনেক সরে গেছে নদী। শেষে পাওয়া গেল। ঘরবাড়ি শেষ হওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়ালাম। এখানে অন্ধকার। একটা বড় গাছও হয়ে গেছে এ ক'বছরে। হিসেব করে দেখলাম তা প্রায় চল্লিশ বছর পরে আবার নদীর পারে এসে দাঁড়িয়েছি। গাছ তো বড় হতেই পারে।

স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। নদীকথা শুনতে শুনতে সব ভুলে গিয়েছিলাম। উত্তরে পাহাড়ের আলোকমালা, দক্ষিণে অনেকদূরে নতুন ব্রিজের আলো। অবিশ্রান্ত ছোট ছোট ঢেউ এসে ছলছল শব্দে ভেঙে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্ত ধারায়। লোকে বলে বটে , জলের মত সহজ। জল অত সোজা নয়। মানুষ অবজ্ঞা করে বলে -- সব কিছু জলে গেল। অথচ শেষ পর্যন্ত সব কিছু জলেই ভাসিয়ে দিতে হয়। গঙ্গাজল মুখে দিতে হয়। এই নশ্বরদেহ পঞ্চভূ তে বিলীন হয়ে গেলে জলে পুঁতে দিতে হয় অবশেষ। জলেই পিতৃপুরুষের তর্পণ। নদী উদাসীন থাকে। সে শুধু দেখে যায় মানুষের আসা-যাওয়া।

''ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার শুধু দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয় ,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়''

শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের চাঁদা চার আনা। আমি মেম্বার হয়ে গেলাম। ওই চার আনাই ছিল চিচিং ফাঁক। তখন স্বর্গের দরজা খুলিয়া গেল। সত্তর দশকের মাঝামাঝি লিটল্‌থ্ধ ম্যাগাজিন বের করার পরিকল্পনা হল। মূলত আমি, গীতাংশু কর ও নিখিল বসু। তার আগে খুচখাচ কবিতা লিখছি। সব পড়ছি। যা পাচ্ছি, সব। টাউন স্টেশনের ক্যান্টিনে চুটিয়ে আড্ডা। আমার কাছে 'ফিরে এসো চাকা' আছে শুনে নিখিল অবাক হয়ে গেল। 'পাহাড়তলি' নামটা নিখিলই ঠিক করল। আমাকে বলল -- তুমি গল্প লিখবে। বুঝলাম ব্যাপারটা সিরিয়াস। এমনি সময় আমাকে 'তুই' করে বলে।

পুরবার্তা ২০২১

পাহাড়তলি ছাপা হত পটলডাঙার 'অমি প্রেস' থেকে। কমল সাহার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল। তখনই কমল খুব ভালো ছবি আঁকছে। যোগাযোগ হল অঞ্জন সেন, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ ভড়দের সঙ্গে। কলকাতা থেকে লেখা সংগ্রহ, প্রেসে গিয়ে পাহাড়তলির প্রুফ দেখা ওরা সানন্দে করত। প্রথম সংখ্যায় স্যামুয়েল বেকেট সম্পর্কে লিখলেন অশ্রুকুমার সিকদার। কবিতা লিখেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়,মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, অঞ্জন সেন, রানা চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, আরও অনেকে। পর পর কয়েকটি সংখ্যার প্রচ্ছদ করলেন শ্যামল দত্তরায়। চতুর্থ সংখ্যায় ছিল অনন্য রায়ের 'হে স্মৃতি, ঘুম আসছে না' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতা। ঈনিডের অনুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা ছিল অমিতাভ গুপ্তের। পঞ্চম সংখ্যায় উদয়নারায়ণ সিংহ, বীতশোক ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখা। ষষ্ঠ সংখ্যা ছিল বিশেষ কবিতা সংখ্যা। মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা', বিষ্ণু দে'র 'সেই অন্ধকার চাই', সমর সেনের 'মদনভস্মের প্রার্থনা' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যথাক্রমে পুষ্কর দাশগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশ্রুকুমার সিকদার। একটি, দুটি ও তিনটি করে কবিতা ছিল অমিয় চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, আলোকজ্যোতি রায়, শোভন চক্রবর্তী, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্যমন দাশগুপ্ত, মনোজ রাউত, অমিতাভ গুপ্ত, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, সমর চক্রবর্তী, অঞ্জন সেন, বিপুল দাস, সৈয়দ কওসর জামাল, নিখিল বসু, গীতাংশু কর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আলোক সরকারের।

আজ ভাবতে গিয়ে খুবই অবাক হয়ে যাই সত্তরের দশকে শিলিগুড়িতে বসে আমরা কী ভাবে 'পাহাড়তলি' প্রকাশ করেছি। অবশ্য কলকাতার বন্ধুরা, ধুপগুড়ি থেকে পুণ্যশ্লোক -- সবাই না হলে এটা হত না। পরবর্তী কালে নিখিল বসু শিলিগুড়ি ছেড়ে চাকরিসূত্রে ধুপগুড়ি চলে যায়। সেখানে গিয়েও সে 'লালনক্ষত্র' সম্পাদনা করতে থাকে। গীতাংশু চাকরির জন্য কলকাতায়। আমি একা শিলিগুড়িতে। পাহাড়তলি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি সিরিয়াসলি লেখালেখির জগতে ঢুকে পড়লাম।

পাহাড়তলিতে 'অ্যান্টিবায়োটিক' নামে একটা গল্প লিখেছিলাম। আমার প্রথম গল্প। অনেকে এখনও গল্পটার কথা বলে। নিখিলের মত খুঁতখুঁতে মানুষও বলেছিল , মন্দ হয়নি। ওই গল্পটিই আমার গল্পের জগতে যাত্রার সবুজ সংকেত। ওই গল্পটাই আমাকে অপার দুঃখের জগতে ঠেলে দিয়েছে। পরে আমি বেশ কিছুদিন নাটক নিয়ে, এবং প্রায় কুড়ি বছর সেতার নিয়ে রগড়েছি। শেষে আবার গল্পের কাছে ফিরে এসে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছি। মাঝের সময়টা লেখালেখি করেছি, কিন্তু অনিয়মিত ভাবে। টেনশন ছাড়া। ওভাবে লেখা হয় না। দু'টি অসমতল তলের ঘর্ষণ ছাড়া, সংশয় ছাড়া, নিজেকে সিংকটাপন্ন করে তুলতে না পারলে লেখা যায় না। এ সত্য আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আর সিরাজদার কাছে আমি জীবন ও শিল্প-বিষয়ক অনেক গূঢ় কথা জেনেছি।

আমার বাড়ি শিলিগুড়ি। উত্তরবাংলার এই মফস্বল শহরে আমার জন্ম। আমি বড় হয়েছি তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা। করতোয়ার ভিজে বাতাসে। নদীপারে কাশবনের দোলা আর উত্তরে তাকালেই দা গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ। পাহাড় পরিষ্কার থাকলেই ভোরে দেখতে পাই কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র মুকুটে একরকম লাল, আবার বিকেল গড়ালে সেখানে কেমন দুখি লাল। আমার অস্তিত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মইষাল বন্ধুর গান, চা-বাগানের কুলি-লাইনের গল্প, বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের আর মহানন্দা স্যাংচুয়ারির গাঢ় সবুজ গন্ধ। উত্তরের দারুণ বর্ষা আর কনকনে শীত। শালশিমুলজারুলখয়েরের ছায়ায় আমার বড় হয়ে ওঠা। মানুষের চৈতন্যে অবিরত রেকর্ডিং হতে থাকে ছড়ানো-ছেটানো এই সব উপাদান। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শুষে নেওয়া এই সব উপকরণ যেন একটা আর্কাইভে জমা হতে থাকে। বস্তুত, প্রায় তখনই ঠিক হয়ে সে কী লিখবে, কাদের নিয়ে লিখবে। যে কারণেই আমার গল্পে বারে বারে তিস্তা নদী এসেছে, কাঠমাফিয়াদের কথা এসেছে, ভাওয়াইয়া ও রাজবংশীদের কথা এসেছে। বহুদিন আগে দেখা ডুয়ার্সের বাসে একজন ভুটিয়া রমণীর নাকে সোনার নথের ঝিকমিক মগ্ন-চৈতন্যে নিহিত থাকে। ধুপগুড়ির রোদ্দুর আর ওই নথের ঝিলিক নিয়ে একটা গল্প তৈরি হয় আমার মগজে। স্কুলে পড়ার সময় পিকনিক করতে গিয়ে সেভোকে করোনেশন ব্রিজের ওপর থেকে একমুঠো পাহাড়ি ঝাউপাতা ফেলে দিয়েছিলাম তিস্তার জলে। এই নদী বাংলাদেশে জলে গেছে। এখন বয়স যখন হেলে পড়েছে অড সাইডে, একটা গল্প তৈরি হতে চায়, যার নাম হতে পারে , মনোয়ারা বেগমের প্রতি শুভেচ্ছা।

ষাটের দশক চলছে। পাহাড়তলির শহর শিলিগুড়ি তখন নেহাতই এক অর্বাচীন শহর। বড়সড় একটা গঞ্জ থেকে ক্রমশ শহর হয়ে উঠছে। নাগরিক ব্যাধি তখনও তার শরীরে রোগজীবাণু ছড়িয়ে দেয়নি। শহড়জুড়ে নারকেলসুপারি, আমজাম, শিরীষ, দেবদারু গাছ ছড়িয়ে আছে। হাইরাইজ কাকে বলে, প্রোমোটার কাকে বলে, এগ-রোল কিংবা পার্লার কাকে বলে , শিলিগুড়ি জানে না। গ্রামীণ সারল্য এবং লাবণ্য ছিল শিলিগুড়ির অন্তর এবং বহিরাবরণে। তখন উত্তরে তাকালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, তখন মহানন্দার জল ছিল সত্যি কাকচক্ষু। ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যেত টলটলে জলের নীচে নুড়িপাথরের গড়িয়ে চলা। পুবে জনপদ শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে যেত বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের ঘনসবুজ। সেদিক থেকে শহরের দিকে উড়ে আসত টিয়াপাখির ঝাঁক। শহরে বেশির ভাগ বাড়ি ছিল তরাই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য মেনে কাঠের খুঁটির ওপর মাটি থেকে অন্তত চারফুট উঁচুতে কাঠেরই ঘর। তখনও কাঠা অত আক্রা হয়নি এ শহরে। তখনও রাতে গাড়ির হেড-লাইট নিভিয়ে লোভের ট্রাক চকচকে করাত নিয়ে লুঠ করত না জঙ্গলের শালশিমুলসেগুনশিশুর দীর্ঘ বনস্পতি।

পুরবার্তা ২০২১

এই সব লাবণ্য, সবুজ ঘ্রাণ, পাহাড়ি নদীর ছন্দ, ছোট শহরের মানুষের আন্তরিক আত্মীয়তার উষ্ণতা ঘিরে রেখেছিল আমাদের।

হানগরের দুষ্ট ক্ষতগুলো তখনও শিলিগুড়িকে আক্রমণ করেনি। বাতাস তখনও অনেক পরিষ্কার। শহরে ধুলো কম, অক্সিজেন বেশি। মোমো আসেনি, মিষ্টির দোকানগুলো তখনও বাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে। পরিষ্কার-পরিছন্ন ছোট্ট শহর। ট্রেন চলে না, কিন্তু শহরের মহাধমনি হিলকার্ট রোডের ওপরে তখনও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজের ন্যারোগেজ লাইন পড়ে আছে। পরে সেগুলো তুলে ফেলা হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হব-হব করছে। পুরনো টাউন স্টেশনের যৌবন ঢলে পড়লেও তার ছটা রয়েছে। তখনও উত্তরে তাকালে শহরের মানুষ দেখতে পায় কাঞ্চনজঙ্ঘায় রক্তরাগ। বিধান মার্কেট সবে শুরু, হংকং মার্কেট চালু হয়নি। অশ্রুকুমার সিকদারের নাম বিরল-উচ্চারিত। আমরা নবোত্থিত-শ্মশ্রু সদ্য-তরুণ কিছু যুবা বয়সের দোষে দু'ছত্তর কবিতা লিখে ফেলেছি। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, জীবনানন্দের তিন ছত্তর পড়েও ফেলেছি। অশ্রু সিকদারের নাম অস্পষ্ট কানে আসছে। কে একজন বলল, অশ্রুবাবুর দাঁত দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস হয়নি। কোনও মানুষ কখনই হাসেন না, তাই আবার হয় নাকি। পরে সাক্ষাৎ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ধারণা হাইপোথেসিস মাত্র। আমরা ক'জন বন্ধু বেশ কয়েক বার দূর থেকে সৌম্য, শান্ত, একটু ওজনদার চাউনির ধবধবে ধুতিপাঞ্জাবিপরিহিত অধ্যাপককে দূর থেকে দেখে শিহরিত, মনে হয়েছিল একেই বলে অধ্যাপক। আর, বাংলা সাহিত্যের এ রকম একজন ওস্তাদ আমাদের শহরে থাকেন, এটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই বাবুপাড়ায় তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের মনে হত কিছু একটা রেডিয়েশন বোধহয় আমাদেরও স্পর্শ করে গেল।

টাউন স্টেশনের ওভারব্রিজ থেকে রোজ একটা দু'টো তক্তা কমে যায়। আমরা রেল-ক্যান্টিনে আড্ডা মারতে মারতে পরিকল্পনা করি স্যারের বাড়িতে একদিন দেখা করতে যাব। আলোচনা এর বেশি আর এগোয় না। এদিকে টাউন স্টেশনে কুলি কমে যাচ্ছে, এন জে পি-তে বাড়ছে। শহরে পুরনো লোক কমে যাচ্ছে, আনকো লোক বাড়ছে। হঠাৎ একদিন দেখি প্ল্যাটফর্মে শীর্ষেন্দু মুখোপাধায়। আমরা পাকামি মেরে গিয়ে আলাপ করে জানতে চাইলাম তিনি গল্পটার নাম ,'টিকটিকিরা জল খায় না কেন' রাখলেন কেন। কী যেন একটা সাদামাটা উত্তর দিয়েছিলেন, যেটা আমদের হতাশ করেছিল। আমরা আশা করেছিলাম উনি অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়ক কোনও ভারি তত্ত্বের কথা বলবেন। একদিন সাইকেল নিয়ে তিন বন্ধু সেবকে বেড়াতে যাওয়ার পথে দেখলাম পথের দু'পাশের গাছপালা সব সাফ। হু হু করে বাড়ছে জমির দাম। হং কং মার্কেটে নতুন ধরনের হাওয়াই চটি এসে গেল। আমি সাইন্সের ছেলে, কালদোষে কবিতা লিখি। একদিন সাহস করে বাংলার অধ্যাপক অশ্রু সিকদারকে ঘেমে নেয়ে তার ক্লাস-লেকচার শোনার পারমিশন চাইলাম। তখন ইউনিয়ন ছাত্রদের ফুসকুড়ি বা ঘামাচির ব্যাপারে খবর্দারি করত না। স্যার আমাকে অনুমতি

দিলে আমি, মনে আছে, লাইব্রেরি নীচে এগারো নাম্বার রুমে তাঁর ক্লাস করেছিলাম। বাংলা অনার্সের স্টুডেন্টের সঙ্গে।

উটকো লোকে শহর ভরে যাচ্ছিল। শহরে কাঠের খুঁটির ওপরে পুরনো স্টাইলের বাড়ি কমে যাচ্ছিল। চারতলা, পাঁচতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। শিলিগুড়ি কলেজ ক্রমশ আয়তনবান হয়ে উঠছে। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ তিলক ময়দান হয়ে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন। বাঙালিদের মিষ্টির দোকান কমছে, অবাঙালিদের মিষ্টির দোকান বাড়ছে। অশ্রুকুমার সিকদার শিলিগুড়ি কলেজ ছেড়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। আমি তখনও গল্প লিখতে শুরু করিনি। কবিতা লিখছি। অনেকগুলো একসঙ্গে স্যারকে দেখিয়ে আনছি। স্যার অবশ্য সরাসরি বলছেন না , কিস্‌সু হয়নি, মুখে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং নিজের সংগ্রহ থেকে কবিতার বই দিচ্ছেন পড়ার জন্য। পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম তিনি নাকি আমার কবিতার প্রশংসা করেছেন। বন্ধুদের সেদিন ক্যান্টিনে চায়ের সঙ্গে ভেজিটেবল্‌ধ্চপ খাইয়েছিলাম। সাইকেল চালিয়ে যখন স্টেশন ফিডার রোড ধরে বাড়ি ফিরছি, মনে হ'ল কানের পাশে সুড়সুড়ি লাগছে। হাত দিয়ে দেখলাম ঘাড়ের রোঁয়াগুলো।

মাঝে মাঝে এক আধটা লিটল্ ম্যাগাজিন হাতে আসে। আমরা ক'জন গোগ্রাসে গিলি। কলকাতায় গেলে ম্যাগাজিন আর কবিতার বই কিনে আনি। শহর খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। যতটা ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যা ও তাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে, ততটা সাংস্কৃতিক ভাবে নয়। একটি, দু'টি ম্যাগাজিন বেরোয় বটে, কিন্তু এত বেশি মফস্বলী গন্ধমাখা, আধুনিকতা থেকে অনেক দূরে সেই পত্রিকা আমাদের বিরক্ত করত। ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত। আমাদের বন্ধু নিখিল বসু বলল বিনয় মজুমদার না পড়লে আধুনিক কবিতা বোঝা যাবে না। নিখিল আমাদের সর্দার। সে সত্তর দশকের প্রথমেই কলকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের ডাক পেতে শুরু করেছিল। আমাদের আধুনিক করে তোলার কঠিন সংকল্প করেছিল। 'ফিরে এসো চাকা' জোগাড় করলাম। প্রকাশক মীনাক্ষী দত্ত, মূল্য তিনটাকা। কালো রং-এর প্রচ্ছদে কবির মুখাবয়ব। বইটা হাতে নিয়ে কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল। '' রোমাঞ্চ কি র'য়ে গেছে; গ্রামে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে/ দেহের উপর দিয়ে শীতল সাপের চলা বুঝে/ যে-রোমাঞ্চ নেমে এলো, রুদ্ধশ্বাস স্বেদে ভিজে ভিজে।/ সর্পিণী, বোঝোনি তুমি, দেহ কিনা, কার দেহ, প্রাণ"। আমি, গীতাংশু আর নিখিল তর্কে মেতে উঠি কাব্যের অন্তর্গত চিরকালীন সৌন্দর্য ও মৃত্যুর তুলনামূলক আলোচনায়। শেষে ঠিক হয় অশ্রুদা ছাড়া এ শহরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যাঁর কাছে যাওয়া যেতে পারে। এর আগে একবার এ রকম হয়েছিল একটি পংক্তি পড়ে , একটি কথার দ্বিধা থরো থরো চূড়ে/ ভর করে আছে সাতটি অমরাবতী। শব্দ ও বাক্যের অন্তর্গত ব্যঞ্জনা, ভারসাম্য, ছন্দের চতুরালি, একটি গূঢ় কথার উড়াল বুঝতে পেরে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। এত গোপন ভার বহন করে কবিতা।

পুরবার্তা ২০২১

আমাদের শহর বদলে যাচ্ছিল। গাছ কমছিল, হোটেল বাড়ছিল। একটু বেশি রাতে হিলকার্ট রোডের আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকে উগ্র সাজে রোগা রোগা মেয়েরা। মহানন্দার জল আরও কালো হয়ে যাচ্ছে। গাড়িধোয়া তেলমবিল, শহরের সব আবিলতা, চা-বাগান গড়িয়ে-আসা বিষ নিয়ে আমাদের শহরের নদী ক্রমে মরে যাচ্ছিল। আমাদের শহরের সব গাছ, তরাই-ডুয়ার্সের গন্ধ, আমাদের নদী , সব চুরি হয়ে যাচ্ছিল। আর আমাদের ভাবনাচিন্তার বদল ঘটে যাচ্ছিল আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়ের পরিধি বরাবর। যখনই কোনও সংশয় আসে, মমতাজ আলির রেল-ক্যান্টিনে বসে আমাদের তুমুল তর্ক শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সেই অশ্রুদার বাড়িতে যাওয়া সাব্যস্ত হয়। ততদিনে আমরা জেনে গেছি অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদারের আপাতগম্ভীর আবরণের আড়ালে দিব্যি একজন স্বাভাবিক ভালোমানুষ রয়েছেন। এই বিশাল পণ্ডিত মানুষটির সামনে আমাদের আর তখন কোনও সংকোচ ছিল না।

একটি শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে অনেক সময় দরকার। ভৌগোলিক ভাবে যেমন কোনও ক্ষেত্রের উর্বরতা রাতারাতি বৃদ্ধি পায় না, সময় পলি বহন করে আনে। সঞ্চিত হতে থাকে অনুর্বর সেই জমির ওপর। তারপর কর্ষণ, বীজবপন, সারপ্রয়োগ, নিড়ানির পর ফসল ফলে, ঠিক তেমনই কোনও জনপদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রাতারাতি তৈরি হয় না। তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। কিছু শর্ত থাকে। প্রাচীন শহরগুলোতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বহমানতা থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুতই থাকে, শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। একটি জনপদের সমস্ত মানুষের মানসিক শিক্ষার স্তরকে উন্নীত করে তোলা একজন মানুষ বা একটি প্রতিষ্ঠানের সাধ্য নয়। বিশেষ করে সেই শহর যদি অর্বাচীন হয়, নিতান্ত ব্যবসায়িক কারণেই দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে, ভিন ভিন্ন সংস্কৃতির বিচিত্র জনজাতির আবাস হয় , তবে নির্দিষ্ট, একমুখী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠা কঠিন। নবীন শহর শিলিগুড়ির সেই সমস্যা রয়েছে। বাণিজ্যে, ক্রীড়াক্ষেত্রে এ শহর বেশ এগিয়ে গেছে, কিন্তু শুধু কিছু ঝাঁ-চকচকে পথঘাট, রাতে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত শহর, অজস্র আধুনিক কেতার দোকানপাট, অসংখ্য হোটেল, বেশুমার নার্সিং-হোম একটা শহরের উন্নতির মাপকাঠি নয়। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ড যে কোনও শহরের একটি অন্যতম আধুনিকতার পরিচয়। এ শহরে শেষ কবে বড় মাপের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসেছে, সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ ভুলে গেছে। এখানে বড় মাপের টেবিল-টেনিস আসর বসে, নেহরু কাপের খেলা হয়, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা হয়, বলিউডি গানার মেহ্ফিল বসে, কিন্তু কোনও গবেষকের প্রয়োজনীয় বই আনতে হয় কলকাতা থেকে। একমাত্র নাট্যোৎসবের সময় 'কলিকাতার' দল এলে দর্শক আনুকূল্য পায় উদ্যোক্তা। অন্য সময় প্রেক্ষাগৃহ শূন্য। ভালো প্রেক্ষাগৃহ বলতে সবেধন নীলমণি দীনবন্ধু মঞ্চ। এ শহরে কবিসভার চেয়ে হরিসভা, শোকসভা, জনসভার শোভা বেশি। খুব অনিয়মিত ভাবে হাতে গোণা কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। স্বীকার করতে লজ্জা আছে, কিন্তু দ্বিধা নেই , শিলিগুড়ি শহরের আশপাশের ছোট মফস্বলি শহরগুলোর সংস্কৃতি চর্চার ঐতিহ্য এবং মান অনেক বেশি গৌরবময়। পাশের শহর, পাশের রাজ্য, এমন কী

পুরবার্তা ২০২১

সীমান্তঘেঁষা শহর বলে পাশের রাষ্ট্র থেকেও এ শহরে মানুষ ছুটে আসে জীবিকার তাগিদে, চিকিৎসার গরজে, কাঞ্চনজঙ্ঘায় সানরাইজ দেখতে। হাতির পিঠে চড়ে গণ্ডার দেখতে। শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কত পুরনো, এ খবর তাদের কাছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। আর, শহরজুড়ে যারা ভিন্ন রাজ্য থেকে এসে শুভলাভের কড়ি গুণে চলেছে, শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন হ'ল কিনা, তাদের কিছু আসে যায় না।

উত্তরবাংলার এই মফস্‌স্বল শহরে যাদের জন্ম, তাঁরা বড় হয়েছে তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা, করতোয়ার ভিজে বাতাসে। নদীপারে কাশবনের দোলা আর উত্তরে তাকালেই দা গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ। পাহাড় পরিষ্কার থাকলেই ভোরে দেখতে পাই কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র মুকুটে একরকম লাল, আবার বিকেল গড়ালে সেখানে কেমন দুখি লাল। আমাদের অস্তিত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মইষাল বন্ধুর গান, চা-বাগানের কুলি-লাইনের গল্প, বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের আর মহানন্দা স্যাংচুয়ারির গাঢ় সবুজ গন্ধ। উত্তরের দারুণ বর্ষা আর কনকনে শীত। শালশিমুলজারুলখয়েরের ছায়ায় আমাদের বড় হয়ে ওঠা। মানুষের চৈতন্যে অবিরত রেকর্ডিং হতে থাকে ছড়ানো-ছেটানো এই সব উপাদান। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শুষে নেওয়া এই সব উপকরণ যেন একটা আর্কাইভে জমা হতে থাকে। বস্তুত, প্রায় তখনই ঠিক হয়ে সে কী লিখবে, কাদের নিয়ে লিখবে। এ কারণেই উত্তরের লেখকদের গল্পে বারে বারে তিস্তা নদী এসেছে, কাঠমাফিয়াদের কথা এসেছে, ভাওয়াইয়া ও রাজবংশীদের কথা এসেছে। বহুদিন আগে দেখা ডুয়ার্সের বাসে একজন ভুটিয়া রমণীর নাকে সোনার নথের ঝিকমিক মগ্ন-চৈতন্যে নিহিত থাকে। ধূপগুড়ির রোদ্দুর আর ওই নথের ঝিলিক নিয়ে একটা গল্প তৈরি হয় আমার মগজে। স্কুলে পড়ার সময় পিকনিক করতে গিয়ে সেভোকে করোনেশন ব্রিজের ওপর থেকে একমুঠো পাহাড়ি ঝাউপাতা ফেলে দিয়েছিলাম তিস্তার জলে। এই নদী বাংলাদেশে জলে গেছে। এখন বয়স যখন হেলে পড়েছে অড সাইডে, একটা গল্প তৈরি হতে চায়, যার নাম হতে পারে , মনোয়ারা বেগমের প্রতি শুভেচ্ছা।

পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমেই মহানন্দা সমতলে এসেছে শিলিগুড়িতে। পাহাড় গড়িয়ে পাথর আসে। পাথর গড়িয়ে চূর্ণীভবন চলে দীর্ঘকাল ধরে। নদীর গর্ভে বালি জমে। এখন ওই রুগ্ন, কঙ্কালসার নদীর দিকে তাকালে আমার বুকের ভেতরে কষ্টটা টের পাই। থাক, আমি দুঃখটা বালিচাপা দিয়ে রাখি।

কিছুদিন আগে আগে হঠাৎ মনে হ'ল যাই, একটু সেই নদীকে দেখে আসি। আমার প্রিয় মহানন্দা। রাস্তা পার হয়ে নতুন বসতির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদী আর খুঁজেই পাই না। এ কী রে বাবা, পুকুরচুরি শুনেছি, আস্ত নদীটাও চুরি হয়ে গেল নাকি। যেখান দিয়ে হেঁটে এলাম, একদিন সেখানে ডুবজলে সাঁতার কাটতাম। অনেক সরে গেছে নদী। শেষে পাওয়া গেল। ঘরবাড়ি শেষ হওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়ালাম। এখানে অন্ধকার। একটা বড় গাছও হয়ে গেছে এ ক'বছরে। হিসেব করে দেখলাম তা প্রায় চল্লিশ বছর পরে আবার নদীর পারে এসে দাঁড়িয়েছি। গাছ তো বড় হতেই পারে।

গাছটার নীচে গিয়ে বসলাম। আমার ছেলেবেলার নদী। আমার পায়ের কাছে মহানন্দা। উত্তরে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায় তিনধারিয়া, কার্শিয়াং-এর আলো। অন্ধকারে কালো জল পাড়ে এসে ছলাত্‌ছলাত্‌শব্দে ভেঙে পড়ছে। সেই চিরকালের চেনা নদীকে ভীষণ অচেনা মনে হয়। কোথা থেকে এসেছে এই নদী ? কত যুগ ধরে বয়ে চলেছে এই নদী ? এর নাম কে রেখেছে মহানন্দা ? জগদীশচন্দ্র বসুর সেই বিখ্যাত লেখাটার কথা মনে পড়ল। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। আমি তো বিখ্যাত মানুষ নই, তবু ইচ্ছে হ'ল নদীর সঙ্গে কথা বলতে। ফিসফিস করে উচ্চারণ করলাম ,

নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?
কার্শিয়াং-এর কাছে একটা ছোট্ট সরোবরে আমার জন্ম।
নদী, তোমার যাত্রাপথের গল্প বলো।

পাহাড়ে কত শত চঞ্চল ঝর্ণা এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের বন্ধন ছেড়ে নেমে এলাম শিলিগুড়ির সমতলে। আমার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। এ শহরের মানুষ নদীকে ভালোবাসে না। আমি কলুষিত হলাম। ওদিকে সুকিয়াপোখরি থেকে বালাসন এসে আমার সঙ্গে মিলিত হ'ল। শিলিগুড়ি পার হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর এগিয়ে চলেছি। গজলডোবা থেকে তিস্তা ক্যানাল হয়ে তিস্তার জল এসে পড়েছে আমার বুকে। লকগেট বন্ধ করে সেই জল পাঠিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিমে। শুখা মরশুমে ফসল ফলায় উত্তর আর দক্ষিণ দিনাজপুরের সুখা জমিতে।

তারপর ?

তারপর বিহারে ঢুকে পড়েছি। নেপাল থেকে আসা মেচি নদীর সঙ্গে দেখা হ'ল কিষাণগঞ্জের কাছে। সমস্ত জলসম্পদ নিয়ে ক্রমে আরও দক্ষিণে এঁকে বেঁকে, কতবার দিক পালটে অনেক পথ পার হওয়ার পর নাগর ও কুলিকের মিলিত ধারা এসে মালদহ জেলার মহানন্দপুরের কাছে আমার সঙ্গে মিশে গেল। তখন আর আমার সেই পাহাড়ি চঞ্চল খরধারা নেই। কিছুটা অলস ছন্দে আমার এগিয়ে চলা। কত স্ফীত হয়েছি।

নদী তার দুঃখের কথা বলে। কেউ শোনে না। ট্রাক ভর্তি বালিপাথর চলে যায় নগর-সভ্যতার দিকে। শহরের চারপাশে যে সবুজ বলয় ঘিরে রাখত শিলিগুড়িকে, সেই বলয়ের ব্যাসার্দ্ধ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। উন্নয়ন চাইলে উচ্ছেদও তোমাকে মেনে নিতে হবে। পুবে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট কত দূরে সরে গেছে। এখন সেখানে মানুষ, শুধু মানুষ। উত্তরে মানুষের প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে চা-বাগান উচ্ছেদ করে তৈরি হয়েছে বিলাসবহুল আবাসন। পশ্চিমে নদীর

ওপারেও চলে গেছে শিলিগুড়ি। আর দক্ষিণে শিলিগুড়ি এখন জলপাইগুড়ির দিকে দৌড়ে চলেছে। শুধু মানুষ, শুধু ধূসর কংক্রিট। বৈকুণ্ঠপুর থেকে সবুজ টিয়ার ঝাঁক এখন আর আসে না শিলিগুড়িতে।

তবু সৃষ্টির বাসনা জেগে থাকে কিছু মানুষের মনে। এই প্যাশনের মৃত্যু হয় না। রয়েছেন কিছু অধ্যাপক। রয়েছে কিছু নাটকের দল। মাঝে মাঝে ছবির প্রদর্শনীও হচ্ছে। গদ্যপদ্যের জগতে শক্তিশালী কলম নিয়ে এগিয়ে আসছে কিছু তরুণ মুখ। ওরাই গানে, কবিতায় মুখর করে তোলে বইমেলা।

কতকাল হ'ল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের ক্যান্টিন বন্ধ। মমতাজ আলি, আস্‌রাফ আলির কথা মনে পড়ে। পুরনো স্টেশন প্রায় পরিত্যক্ত। আরও দক্ষিণে নতুন স্টেশনঘর হয়েছে। খুঁজেই পাই না কোথায় ছিল আমদের সেই মফস্‌সলি কফি-হাউস রেল-ক্যান্টিন।

হঠাৎ কোনও দিন বিধান মার্কেটে 'নেতাজি কেবিন'-এ যাই। এখানেও শিলিগুড়ির লেখক-শিল্পীরা আসা-যাওয়া করত। এখন আর করে কি না, জানি না। তপনের বিখ্যাত বই-এর দোকান 'বুকস্' বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তরবাংলার প্রায় সব লেখককবিরা এখানে আসত তাদের প্রয়োজনীয় বই-এর খোঁজে। আমাদের নিত্যদিনের সায়ং সভার নাটমন্দির ছিল বুকস্। যে কোনও বই দরকার হলেই তপনকে বলতাম। তপন ওর লোক দিয়ে আনিয়ে দিত। অনেকেই এক সময় প্রচুর বই আনিয়েছেন এই বুকস্ মারফত্। আমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল বুকস্ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। এত বড় শহর। বলা হয় দ্বিতীয় কলকাতা নাকি। অথচ বুকস্-এর মত আর একটা বই এবং লিটল্ ম্যাগাজিনের দোকান শিলিগুড়িতে হ'ল না। শহরে এতগুলো কলেজ, কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, এত মানুষ, এত দোকানপশার, অথচ আমাদের একটা পাতিরাম বা ধ্যানবিন্দু নেই। আমাদের হংকং মার্কেট আছে, আমাদের বিদেশি ব্যাঙ্ক আছে, আমাদের বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, আমাদের মন্দির-মসজিদ-গির্জা-গুরুদ্বার আছে, অথচ হায়, একটি ছোটখাটো কলেজ স্ট্রিট নাই।

হবে নিশ্চয় একদিন। আশায় বাঁচে চাষা। কলকাতার ইতিহাস তিনশ বছরের। এই শহরের গঞ্জ থেকে মফস্বল শহর হয়ে বড় শহর হয়ে ওঠার ইতিহাস খুব বেশি হলে পঞ্চাশ বছরের। এই শহরের সংস্কৃতির ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন পাহাড়তলির নাম আলাদা ভাবেই উল্লেখিত হবে।

আমার লেখালেখি, আমার জীবনবোধ কিছুটা তো অবশ্যই পরিবেশ ঠিক করে দেয়। আমি যা দেখিনি, শুনলেও আমাকে আলোড়িত করেনি, যে ইকো-সিস্টেমে আমার চলন সহজ, স্বচ্ছন্দ নয় , কী ভাবে সে সব বিষয় নিয়ে লিখব। পাঠক তো নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করে নেয় গল্পের সত্যি। যে লেখক পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতার যত কাছে যেতে পারেন, সেই গল্প তত বেশি সার্থক হয়ে ওঠে। কারও বাড়িতে সাত বার বজ্রপাত হতেই পারে, এ হ'ল বাস্তবের সত্য। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাইরে। গল্পে এমন ঘটনা থাকলে পাঠকের বিশ্বাসের অনেক দূরে থাকে সেই সত্যি।

পুরবার্তা ২০২১

কী আমি লিখতে চাই, কেমন হবে আমার জীবনবোধ , এ প্রশ্ন আমি নিজেকেই অনেকবার করেছি। একটা গল্প শেষ হলে পড়ে বুঝতে চাই, ঠিক এটাই কি আমি লিখতে চেয়েছি। মহানন্দার ওপর ব্রিজ তৈরি হবে। তিনপুরুষ ধরে ঘাটে পারানির কাজ করছে, সেই মাঝির সমস্যা নিয়ে গল্প লিখলাম। লেখা শেষ হলে বুঝি, আমি যা লিখতে চেয়েছিলাম, সত্যিই আমি সে কথা লিখতে পারিনি। এত দিন ধরে পুরনো মাঝি ইন্দ্রমোহনকে দেখে, ওর নৌকোয় খেয়া পারাপার করে , ব্রিজ হ'লে ওর রুজির সমস্যা ছাড়াও প্রতিদিন নদীর স্রোতকে চ্যালেঞ্জ করবে বলে ওর রক্তের ভেতরে যে আর একটা নদী গর্জে উঠত , আমি আমার জীবনবোধ দিয়ে তার কতটুকে বুঝতে পেরেছি। এখানে ব্যারাজ হবে, ব্রিজ হবে। এতদিন যারা ওকে তোয়াজ করেছে, এখন তারাই গটমটিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যাবে। এই ক্রাইসিস তো ওর অমার্জিত, অশিক্ষিত বোধে কয়েকটি খোঁচা হয়ে জেগে থাকে শুধু। আমি আমার মার্জিত বোধে যা বুঝলাম, তাই কি আসল সত্যি।

এবার ধরা যাক আমার পরিবেশ। তাল, নারকেলের ছায়াঢাকা গ্রাম। গ্রামীন কূটকচালি আছে, দুর্গাপুজো আছে, মহরমের তাজিয়া আছে। এখানেই আমার বড় হয়ে ওঠা। এখন আমার বোধে রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস, রোহিলাদের সমস্যা, গাজা স্ট্রিপ, সিঙ্গুরে কৃষিজমি হস্তান্তর, ২০১৭ সালেও ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা , এগুলো তাহলে কী ভাবে কাজ করবে।

আসলে আমি কী লিখব, কীসের ভিত্তিতে আমার জীবনবোধ গড়ে উঠবে, সেটা কিছুটা নির্ভর করে আমি কোন মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমার শেকড় কোন রস টানছে , তার ওপর। এগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাবকের কাজ করে। গল্পের প্রেক্ষিত, চরিত্র সৃষ্টিতে সরাসরি সাহায্য করে। আর একটা প্রক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে কাজ করে। সেটা হ'ল ব্যক্তিমানুষ থেকে সামাজিক মানুষ, সামাজিক মানুষ থেকে রাষ্ট্রিক মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। নিজেকে সংবিধানের অন্তর্গত একজন নাগরিক ভাবার সঙ্গে সঙ্গে এর ভালো মন্দও যেন নিজের উঠোনে এসে পড়ে। দুনিয়াজোড়া মানুষের ভালোমন্দের দায়িত্বরক্ষার আমিও একজন অংশীদার , এই বোধ খুব গভীরে অস্পষ্ট, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কাজ করে। কেউ চাপিয়ে দেয় না, কিন্তু কোথা থেকে যেন এই দায় আসে। এ কথা সাধারণ মানুষ সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য, লেখক সম্পর্কেও। এই মনুষ্যত্ববোধের অহংকার তাকে প্ররোচিত করে যে কোনও রকমের ভাঙন, যা তার এবং তার প্রজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে , তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হয়। কেউ ওয়ার অ্যান্ড পিস লেখেন, কেউ কমোডে বসে মেঝেয়ে থুথু ফেলেন, কেউ গেয়ে ওঠে উই শ্যাল ওভারকাম, কেউ রিকশাওয়ালা পেটায়, কেউ ডেপুটেশন দেয়, কেউ পুলিশকে খিস্তি দেয়, আবার কোনও কবি বন্দুক হাতে গ্রানাডা পাহাড়ে চলে যান তবে সব কিছু এত সহজে হয় না। রক্তে বিরুদ্ধগতির প্রবাহও থাকে। অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীও পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা থাকলে এক্সট্রা উত্তেজনায় জারিত হ'ন। কোথা থেকে আসে এই এক্সট্রা ? এও কভারেজ। রাষ্ট্র বা তার নিজের অস্তিত্বের সংকটের বিরুদ্ধে এক রকম ডিফেন্স মেকানিজম্‌ধ্ধ। এক ধরণের পোকা আছে, বিপদ দেখলে

দুর্গন্ধময় রস ছড়ায়।

এখন ইনফর্মেশন টেকনোলজির চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের ফলে অনেক বেশি তথ্য দ্রুত লেখকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এর ভেতরে কিছু তথ্য সংবাদের চেয়েও বেশি ডাইমেনশন নিয়ে লেখকের মনে আলোড়ন তোলে। একই ঘটনা ভিন্ন লেখকের মনোজগতে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঘটনা একটি, কিন্তু মাল্টি-ফেসেড হওয়ার ফলে এক-এক মানুষের কাছে এক-একটি তলের উজ্জ্বলতা প্রখর হয়ে ওঠে। একটি ঘটনার অনেকগুলো মাউন্টেড স্পট থাকে। লেখক ঝাড়াই বাছাই-এর পরে সিদ্ধান্তে আসেন কী লিখবেন। ধর্মের প্রতি মানুষের সীমাহীন আনুগত্য কী ভাবে মানুষকে অমানুষ বানায়, এ কথা এই মুহূর্তে আর নতুন করা বলার কিছু নেই। প্রত্যক্ষ এবং মিডিয়াবাহিত পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সেই রসায়নাগারে কাজ শুরু দেয়। জীবনবোধ পীড়ন শুরু করে। কেউ লেখেন মশাল হাতে এক উন্মাদের নিষ্ঠুরতার গল্প, কেউ লেখেন মানবিকতার গল্প।

মানুষ নামক জটিল প্রাণী অসীম অনন্ত এক রহস্যে মোড়া। আপাতভাবে মনে হয় শান্ত নদীর জল। কিন্তু অনেক চোরাপাথর, মগ্নমৈনাক থাকে জীবনের গভীরে। রহস্যের গোপন কন্দরে ডুবে থাকে সেই সব ডুবোপাহাড়। অসীম বিশ্বাস ও কোটি টাকার অহংকারী টাইটনিকও ডুবে যায় কত সহজে।

সেইসব ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে অবিরত ঘর্ষণ হতে থাকে স্থানিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত অসংখ্য তথ্যের সঙ্গে, রক্তে লালিত বিশ্বাসের সঙ্গে, গেঁড়েবসা সংস্কারের সঙ্গে, যাপিত অভিজ্ঞতা ও পঠিত তত্ত্বের সঙ্গে। আমরা কখনও কখনও শান্ত মানুষের হঠাৎ জেগে ওঠা দেখি। ওই গ্রাফ ধরার চেষ্টা করেন লেখক। কী লিখতে চাই মনে হলেই মানুষের বুকের ভেতরের ওই পাথর একবার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। এই বোধহয় জীবনবোধের তাড়না, যার থেকে কোনও স্রষ্টারই নিষ্কৃতি নেই।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি ও তার পৌর পরিসর ঃ প্রসঙ্গ বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিবর্তনের ধারা

শ্যামল গুহ রায়

এই জনপদের জন্মলগ্ন থেকেই বহুমাত্রিক জনবিন্যাস শিলিগুড়ি শহরকে উত্তরবঙ্গের আর পাঁচটা শহর থেকে আলাদা করেছে। স্থানীয় জাতি, উপজাতি, জনগোষ্ঠী[১] (মেচ, রাজবংশী, গারো, থারু, লেপচা, ভুটিয়া, লিম্বু ইত্যাদি) অধ্যুষিত ছোট এই জনপদ পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পর নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতে চলে আসা মানুষের ভিড়ে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নিজস্ব গতিতে দেশের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জনবসতি ও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন এই শহরকে কসমোপলিটান রূপ দিয়েছে, ঠিক তেমন এই শহরের একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বাজারকেন্দ্রগুলি এই বহুভাষিক এলাকাকে এক অনন্য নগর কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই বাজার কেন্দ্রগুলি এবং তাদের আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বী সুপার মার্কেটগুলি এই শহরের প্রাকৃতিক পরিসরকে নতুনভাবে সঙ্গায়িত করতে সাহায্য করছে। সাম্প্রতিক কালে শিলিগুড়ি শহরের বাণিজ্য ধারার নিরিখে এই দুই মেরুর অর্থনীতির চর্চা বা কথোপকথন কে নব প্রতর্কের জন্ম দিয়েছে, তা বলাই যায়।

অর্থনীতির এই চটকদারি বিবর্তনের ধারার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গঠনের প্রক্রিয়ায় এক জটিল তথা অবাঞ্ছিত পরিণামের চোখ রাঙানি। 'যত তাড়াতাড়ি পারি, টাকা করি' — এই বাণিজ্য কালচার শিলিগুড়িতে এক 'Fly by Night' গোত্রীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলেছে, যা আজ শিলিগুড়ির সর্বত্র দৃশ্যমান।[২]

শিলিগুড়ি শহরের গোড়ার কথা আজও অনেকের কাছে অজানা। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা দার্জিলিঙকে শৈল শহর হিসেবে চিহ্নিত করায় এই জনপদের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়তে শুরু করে। কালক্রমে, নগরায়ণের বৃত্তে আসায় পাহাড়ের তিন নগর কেন্দ্রগুলি দার্জিলিঙ, কালিম্পং ও কার্শিয়াঙের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৯৩১ খ্রীঃ সেনসাসের তথ্য অনুযায়ী জেলার মোট শহরে জনসংখ্যার ১৪শতাংশ ছিল শিলিগুড়ির। কিন্তু ১৯৭১ সালে এই হার দাঁড়ায় ৫৫শতাংশতে।[৩] প্রথমে দার্জিলিঙ জেলাকে দুটি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। একটি সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে সদর মহকুমা এবং ১৮৬৪ থেকে ১৮৮১ সন অবধি তরাই মহকুমা (২৭৪ বর্গমাইল) যার সদর ছিল হাঁসখোয়া। এই প্রসঙ্গে O'Malley বলেছেন, 'নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের টার্মিনাস স্থাপিত হওয়ার সুবাদে শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে হাঁসখোয়া থেকে তরাই-এর মহকুমা শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত হয়।[৪]

শিলিগুড়ি শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশ পথ নয় — সিকিম, ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ, দার্জিলিঙ,

ডুয়ার্স সহ একাধিক অঞ্চলের বাণিজ্য ও পর্যটন ব্যবস্থার অন্যতম যোগাযোগ স্থল। ১৯৬২ সালে জাতীয় সড়কপথের যোগাযোগ সাড়া দেশের সাথে গড়ে ওঠার ফলে প্রতিদিন পণ্যবাহী গাড়ী চলাচল ক্রমশ বাড়তে থাকে। শহরের গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে অর্থোপার্জনের জন্য পার্শ্ববর্তী নানা জায়গা থেকে মানুষ আসতে শুরু করে — যার সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অধ্যাপক সমীর দাস জানিয়েছে, 'Planning Commission-এর তথ্য অনুযায়ী উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে শিলিগুড়িতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল —একমাত্র প্রাকৃতিক কারণ নয়। এই বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পরিযান। (ইনস্টিটিউট অব এ্যাপ্লাইড ম্যান পাওয়ার রিসার্চ ২০০২ঃ১০)।[৫] ফলে শিলিগুড়ি পরিযায়ীদের শহরে পরিণত হয়। পরিযায়ীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ পূর্ববঙ্গ, ইষ্ট-পাকিস্থান, বাংলাদেশ থেকে, ১৭ শতাংশ বিহার থেকে, ৮ শতাংশ মাড়োয়াড়ি আর বাকি ১৫ শতাংশ এসেছে দক্ষিণবঙ্গ ও আসাম থেকে। (তথ্যসূত্র ঃ নমুনা সমীক্ষা - মানস দাশগুপ্ত) শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী যথার্থই এই শহরকে একটি কসমোপোলিটান শহর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। দেশ ভাগের পর এবং ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থান ও সামারিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে। ১৯৪১ সালে এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১০,৪৮৭ জন। ১৯৬১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬৫,৪৭১জন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ছিল ৬২৪.৩১ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিলিগুড়ির গুরুত্ব স্বীকার করে এগিয়ে আসে এর উন্নয়নে। পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নে তৈরী হয় Siliguri Planning Organisation (SPO) যার মুখ্য পরামর্শদাতা ছিলেন আমেরিকার অধ্যাপক লিও জ্যাকবসন। ১৯৬৫ সালে এই শহরের উন্নয়নে তিনিই সর্বপ্রথম পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে সামনে রেখে Town & Country Planning Act, ১৯৭৯ অনুযায়ী শিলিগুড়ি শহরকে কেন্দ্র করে একটি Outline Development Plan তৈরী করা হয় - যার মূল লক্ষ ছিল শহরকে বিশেষ কোন জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করে সর্বত্র সমানভাবে এর বিস্তার ঘটানো যায়।[৬]

ব্রিটিশ প্রবর্তিত বাণিজ্য অর্থনীতি আবহমান কাল ধরে চলে আসা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোকে পরিবর্তিত করেছিল দেশের বিভিন্ন অংশে, তার এই প্রভাব থেকে এই অঞ্চলও বাদ পরেনি। এই বাণিজ্য অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল বাজার। দেশীয় বিপণন কেন্দ্র হিসাবে ব্রিটিশরা এই'বাজার' শব্দটি ব্যবহার করেছে তাদের সরকারি নথিপত্রে। প্রসঙ্গত কলিকাতার বিপণন কেন্দ্রগুলি সাধারণত ছিল ব্যস্ত, জনবহুল ও অপরিচ্ছন্ন। যদিও তারা এই বাজারের সুবিধা নিয়েছে, তবু তারা নিজে কোনদিন বাজারে পা রাখে নি। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য তারা বেনিয়াদের পাঠাত বাজারে।

যাহোক্, শিলিগুড়ি শহরের বয়স তুলনায় একেবারেই নবীন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিংশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধের আগে এই শহর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থানে ছিল না। শহরের যা বিকাশ বা বিস্তার ঘটছে, তা মূলত বাণিজ্যভিত্তিক। তবে বাণিজ্য সংস্কৃতি উৎপাদনমুখী নয়, সবটাই মুনাফামুখী। মানস দাশগুপ্ত বলেছেন, 'কোলকাতা হল যথার্থ জায়গা যেখানে শিল্প সভ্যতা ও বাণিজ্য সভ্যতার মিলন ঘটেছে। কিন্তু শিলিগুড়ি এই মিলন থেকে অনেক দূরে। কারণ শহর বা উপকণ্ঠে কোন তেমন শিল্প নেই। তার কথায় 'শিলিগুড়িতে বাণিজ্য কালচার বা Mercantile Capitalism-এর আবহাওয়া থাকাতে এক বিচিত্র Super structure Culture গড়ে উঠেছে। একদল বাবুশ্রেণি, তারা মূলত প্রথম বা দ্বিতীয় জেনারেশন ধরে শিলিগুড়ির অধিবাসী। এদের মধ্যে রয়েছে ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশাদার শ্রেণি। এখানে আয়ের বৈষম্য ভীষণরকম বেশি। প্রথমত, ধনী ৫ শতাংশ আর সবচেয়ে নিচে পড়ে থাকা ৫ শতাংশের মধ্যে আয়ের প্রভেদ আকাশ পাতাল।

দ্বিতীয়ত, এখানে যেহেতু অর্থের লোভে বাইরে থেকে লোকজন আসছে, তার প্রভাব Sex-ratio তে লক্ষ্য করা যায়। শিলিগুড়ির সেক্স রেসিও অনুযায়ী দেখা যায় এখানে প্রতি হাজার পুরুষ-মেয়েদের সংখ্যা অন্ততঃ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম। অর্থাৎ বাণিজ্য শহরে সামাজিক ব্যধি বড় আকার ধারণ করেছে। ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে বলা আছে যে শিলিগুড়ির এই সমস্যা যদি সমাধান করা না হয়, তাহলে অচিরেই তা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কথাটা যে অমূলক নয় তা বোঝা যায় এই শহরের sex-trade এর বাড়বাড়ন্ত দেখে। শিশু ও নারী পাচারকারীদের এক মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছে এখানে। Sex-workers দের দুটি ব্যবসার চক্র ছিল — একটি কোচবিহারে এবং অন্যটি আমাদের চেনা শহর শিলিগুড়িতে। National Human Rights Commission of India'র এক অনুসন্ধানে (২০০২-২০০৩) দেখা গেছে যে দুটি চক্রই একে অন্যের সাথে যুক্ত। সমীর কুমার দাস এই বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বায়ণের ফলে চাবাগানের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লক আউট, কর্মচ্যুতি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ালে সুযোগ সন্ধানী, অর্থলোভী, দালালরা অসহায় চা-মহিলা শ্রমিকদের এই ফাঁদে টেনে নিয়ে আসে। এরা ছড়িয়ে পরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, এমনকি শিলিগুড়ি-নক্সালবাড়ীস্থিত তাদের কেন্দ্র থেকে তারা ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয়'।[৮]

বলা বাহুল্য বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। W.W. Hunter লিখেছেন, '১৮৭১ সালে প্রাপ্ত Deputy Commissioner-এর মুখ্য রাস্তার তালিকা থেকে জানা যায় Darjeeling Hill Cart Road যা শিলিগুড়িতে প্রবেশ করেছে তার দূরত্ব ৪৮ মাইল। তরাই অংশের ৮ মাইল পাকা ছিল, বাকি অংশ ছিল কাঁচা। এছাড়া পাঙ্খাবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি রাস্তাও পাকা ছিল না।[৯] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কলিকাতা গ্রান্ড হোটেলের তত্ত্বাবধানে শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙ-এর মধ্যে মোটরগাড়ি চলাচল করত। এর ফলে পাহাড়ী রাস্তায় শিলিগুড়ি বাণিজ্য ও

তার পরিমাণ বহু গুণ বাড়ে।[১০] ১৯০৯-১৫ সান নাগাদ Servey and settlement Operations in the Darjeeling Tea-এর পেশ করা চূড়ান্ত রিপোর্টে অনেকগুলি রাস্তার চিত্র তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে হিলকার্ট রোড দার্জিলিং পর্যন্ত, শিলিগুড়ি-নক্সালবাড়ি রাস্তা, মাটিগাড়া-কার্সিয়াঙ, নক্সালবাড়ি-গয়াবাড়ি, শিলিগুড়ি-সেবক রাস্তা উল্লেখযোগ্য ছিল। এগুলি পাকা রাস্তা ছিল।[১১] ১৮৮০ সালে ২৩শে আগস্ট, শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন চালু হয়। ১৯৪৯ সালে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন চালু হয়। নিউজলপাইগুড়িতে নতুন রেল টার্মিনাস তৈরী হওয়ায় নর্থ আসাম ও বিহারের মধ্যে বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বর্তমানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে এই অঞ্চলটি রেলপথের মাধ্যমে শিলিগুড়ির সাথে দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলকে সংযোগ করেছে। এই শহরের বাণিজ্যিক সফলতা অনেকটা নিশ্চিত করেছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। এই বিমান বন্দরের সাথে ব্যাঙ্গালোর, চণ্ডিগড়, নিউ দিল্লি, কলকাতা, গৌহাটি, মুম্বাই, চেন্নাই এবং ভূটানের পারো বিমান বন্দরের সংযোগ রয়েছে। সড়ক যোগাযোগের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস ছাড়াও শহরে পি. সি. মিত্তল বাসস্ট্যান্ড, কোর্টমোড় বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া পেট্রোল পাম্প, জলপাইমোড় ও বিধান রোডে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড রয়েছে। এই শহরের ওপর ৩১নং জাতীয় সড়ক, ৫৫নং জাতীয় সড়ক, ১২নং রাজ্য সড়ক এবং ১২-এ নং রাজ্য সড়ক বয়ে গেছে। এই বহু বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে দিন দিন শিলিগুড়ি শহরের দৈনিক বহিরাগত মানুষের চাপ বেড়ে চলেছে। তবে এর ফলে বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া শিলিগুড়ি সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া, বাগডোগরা, নক্সালবাড়ি হাট উল্লেখযোগ্য। হাটের দিন মানে উৎসবের দিন ছিল সবার কাছে। হাট নয় যেন মেলা। বর্তমানে শহরে সংস্কৃতির গ্রাসে মহকুমার হাট।

একটু পেছনের দিকে তাকানো যাক। ১৮৮৭ শিলিগুড়ির রেল কর্তৃপক্ষ স্টেশন লাগোয়া তাদের অধীনস্থ বেশ কিছুটা অঞ্চল শিলিগুড়ি হাট ও মহাবীরস্থান নির্মাণে দিয়ে দেয়। ফলে শিলিগুড়ি হাট ও মহাবীরস্থান অঞ্চলে কিছু দোকান পাট নিয়ে স্থানিক বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যেমন সুভাষপল্লী বাজার, হায়দার পাড়া বাজার, ফুলেশ্বরী বাজার, গেট বাজার, চম্পাসারী বাজার ইত্যাদি। তাছাড়া, বর্তমান মিলনপল্লীতেও বসতবাড়ি ছাড়াও দোকান বাজার গড়ে উঠেছিল। কারণ জলপাইগুড়ি রাজার কাছারী ছিল এই এলাকায়। সেইটিই ছিল পুরনো শিলিগুড়ি। আর মহানন্দার দক্ষিণে হিলকার্ট রোডের ধার ঘেষে কিছু মানুষ বসতি ও ব্যবসা শুরু করেছিলেন।[১২]

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে অতুল চন্দ্র দত্ত ও নরেন্দ্র রায়ও ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী। ১৯১৭ সালে প্রয়াত লালমোহন মল্লিকও ছিলেন একজন প্রখ্যাত কাষ্ঠ ব্যবসায়ী। এ সময়ে চা ক্ষেত্র তৈরী করতে বিপুল পরিমাণ বন ধ্বংস করা হয়। কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা এ কাঠ রেলওয়ে স্লীপার নির্মাণ ও চা বাগানে Fire wood সরবরাহের ব্যবসা করতেন। শোনা যায় তখনকার অবিভক্ত বাংলায় এরা কাঠ পাঠাতেন ও ব্যবসা করতেন।[১৩] হরিমোহন সান্যাল

তাঁর 'দারজিলিঙের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার বনবিভাগ স্থাপন করে আইনগতভাবে অরণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। তা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের কাঠের প্রতি নজর পড়ে লোভী ব্যবসায়ীদের। ফলাও করে শুরু হয় কাঠ রপ্তানী। তিনি আরও লিখেছেন, জলপাইগুড়ি রাজার অর্থলালসার কারণে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল (রাজার অধীনস্থ জঙ্গলমহল) সমুৎপাটিত হয়েছে। কাজেই কাঠের ব্যবসা সে সময় এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধনা জীবিকা হয়ে উঠেছিল।[১৪] এখনও এই ব্যবসা চলছে, তবে অনেকটাই অসৎ পথে। অধিকাংশ রাস্তা, ড্রেনের জমি দখল করে এ ব্যবসা চলছে।

এই অঞ্চলের মানুষ পাটের ব্যবসার সাথেও যুক্ত ছিলেন। শিলিগুড়ি জনপদে কয়েকটি পাট কোম্পানীর শাখা অফিস ছিল। এসব কোম্পানীর প্রধান কাজ ছিল মাটিগাড়া হাট থেকে পাট কিনে কলকাতার অফিসে চালান দেওয়া।[১৫] এই প্রসঙ্গে প্রদ্যোৎ কুমার বসু তাঁর গ্রন্থ 'একটি জনপদের কাহিনীতে' লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিলিগুড়িতে কয়েকটি ইউরোপীয় কোম্পানী পাট ক্রয়ের গুদাম ও অফিস স্থাপন করে যথা — ল্যান্ডেন এন্ড ক্লার্ক, পানিকল নামে পরিচিত নর্থবেঙ্গল জুট মিল, আরসিম এন্ড কোং, র‍্যালি ব্রাদার্স, বার্কমায়ার জুট গুদাম ইত্যাদি।[১৬]

শিলিগুড়ির কয়লা ব্যবসায়ী ছিলেন রামপদ চ্যাটার্জী। তিনি ১৯১৯ সাল থেকে পাহাড়ের চা শিল্পে কয়লা প্রেরণ করতেন। এছাড়া বাবুপাড়া, দেশবন্ধু পাড়ার কিছু ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর আগে কয়লা ব্যবসায় সফল হন। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও নানা জায়গায় কয়লা ব্যবসা চলত। রেলওয়ে ওয়াগন করে কয়লা আসত এনজেপি স্টেশনে। সেখান থেকে বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হত। এক কথায়, স্থানীয় স্তরে কয়লা অর্থনীতি গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক গ্যাস আসায়, কয়লার চাহিদায় ভাটা পরে।

শিলিগুড়ি শহরের গুরুত্ব এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে অবস্থানের ফলে অনেক আগে থেকেই হোটেল ব্যবসা শুরু হয়। ১৯৩৯ সালে শহরের হোটেল ব্যবসাতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন শচীন ঘোষ। 'ডায়াম' হোটেলটিতে ইংরেজরাও ভোজন করত। স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় তাঁর (রূপকথায় দেশে) লেখাতে বলেছেন, 'ডেল স্টেম্যানের গায়ে সোরাবজী হোটেল ছিল। খুব ঝকঝকে পরিস্কার এ হোটেলে সাহেব সুবোরা এসে প্রাতঃরাশ সেরে দার্জিলিঙ পাহাড়ে যাবার ছোট রেলগাড়িতে উঠতেন। এছাড়া, থাকা খাওয়ার জন্য চারের দশকে গড়ে উঠেছিল 'বসু বোর্ডিং'। এস এফ রোডের কমলা কেবিন, হিলকার্ট রোডের তরাই পাইস হোটেল, ট্রেজারি বিল্ডিং-এর কাছে 'জয়হিন্দ মিষ্টান্ন ভান্ডার', বিধান মার্কেটের 'নেতাজী কেবিন' শিলিগুড়ির খাদ্য রসিকদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল।

১৯২৫ সালে রকমারি স্টেশনারী দোকানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তারা স্টোর্স, ঘোষ ব্রাদার্স, ফ্যান্সি স্টোর্স। পরে ১৯৩০ সালে ভেঙে হয় বর্ধমান স্টোর্স ও ঢাকা স্টোর্স। পরবর্তীতে ১৯৪২ সালে তৈরি হয় ভ্যারাইটি স্টোর্স,

লাকি স্টোর্স ও রূপায়ণ স্টোর্স। এছাড়া, বস্ত্র ব্যবসায় সুনাম অর্জন করেছিল লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্রালয়, ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়, ঘোষ বস্ত্রালয়, ভারতী বস্ত্রালয়, নির্মলা ক্লথ স্টোর্স ইত্যাদি।[১৭]

ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ে অগ্রদূত ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ বসু। ত্রিশের দশকে নৃপেনবাবু একটি বাস ও ট্রাক নিয়ে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিঙের পাহাড়ী পথে চালিয়ে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। কার্ত্তিক চন্দ্র দে-ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপনিবেশিক আমলে বিজয় বসন্ত বসু, মনীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ও বাস কিনে ব্যবসা করেছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে মাটিগাড়ায় পরিবহন নগরী গড়া হয়েছে। ফুলবাড়ীতে তৈরি হয়েছে বড় আকারের ট্রাক টার্মিনাস।

শিলিগুড়ি শহরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা হলো ওষুধের ব্যবসা। মহানন্দা পাড়ার গয়ারাম মেডিক্যাল হল এবং কার্সিয়াং মেডিকেলের হাতে যে ব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল, তা এখন বড় আকার ধারণ করেছে। খুচরো ব্যবসা ছাড়াও, পাইকারী ওষুধের ব্যবসা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের চাহিদা মেটাচ্ছে।

চা শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র শিলিগুড়ি। এখানে শুরু হয়েছে বৃহৎ চা নিলাম কেন্দ্র। এক সময় শিলিগুড়ির চারপাশে ঘেরা চা বাগানের অর্থনীতি এই শহরকে বড় হতে সাহায্য করেছে। তবে সমীর কুমার দাস মনে করেন যে শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার প্রসার পার্শ্ববর্তী এলাকা ও চারপাশের চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় প্রভাব ফেলে। একটা বড় মাপে চা বাগানের শ্রমিক এবং প্রান্তিক মানুষদের আরও দূরবর্তী এলাকায় ঠেলে পাঠায়। অর্থাৎ Urban to Rural Migration কে শিলিগুড়ির নগরায়ণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রাক-বিশ্বায়ন যুগে চা শিল্প যে কতটা লাভজনক ছিল তা ১৯৮৪ সালের একটি হিসাব থেকে বোঝা যায়। যথাক্রমে চিনি, তামাক, বস্ত্র এবং চা ব্যবসায় লাভ ছিল ৯.৭, ৮, ৭ এবং ৩৩ শতাংশ। চা শিল্পে বিনিয়োগ এতটাই লাভজনক ছিল যে দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে নতুন নতুন চা বাগান গড়ে ওঠে বা সম্প্রসারিত হয়। অনেক সময় অসৎ উপায়ে আদিবাসী জমি দখল করে চা বাগানের পত্তন ঘটে। তবে ১৯৮০ সালের পর বিশেষ করে শতাব্দীর শেষে চা শিল্প ভয়ানক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। ডুয়ার্সে বহু বাগান বন্ধ হয়ে যায়, অনেক বাগান মুখ থুবড়ে পরে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা (শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, কেনিয়া এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে), নতুন লগ্নির অভাব, নতুন প্রযুক্তির অভাব, নতুন করে বাগিচা তৈরি, কোম্পানীর বহুদিনের আর্থিক ঋণের দায় ইত্যাদি নানা কারণে চা শিল্প থেকে বিনিয়োগকারীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১৯]

সমীর কুমার দাসের মতে চা শিল্পের সঙ্কট জমি-হাঙরদের কাছে বিরাট সুযোগ এনে দেয়। চা বাগিচা ক্রমশ অর্থলোভীদের কাছে মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে ওঠে। চা-বাগান ও পার্শ্ববর্তী জমিতে জমির কারবারি, প্রোমোটার, জমি-মাফিয়ারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে নেমে পড়ে। তাছাড়া পঞ্জি স্কিমের মাধ্যমেও চা বাগানের টাকা বাইরে চলে

যেত। আলিপুর দুয়ারের বুন্দাপানি চা বাগান হাত বদলের পর ২০১৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। চাঁদমনি চা বাগানকে তুলে দিয়ে সেখানে PPP model- SJDA তত্ত্বাবধানে Bengal Ambuja Group ও আরো দুই সংস্থার সহযোগে উত্তরায়ণ হাউজিং কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে। এই পর্ব সম্পন্ন করার মাঝের ইতিহাস বড়ই করুন। চা বাগানের শ্রমিকদের ক্যাজুয়াল হিসাবে গণ্য করে কিছু স্থায়ী কর্মচারীদের বহাল রাখা হয় এই ভেবে যে company যখন বাগান বিক্রি করবে, তখন এই অল্প সংখ্যক কর্মীবৃন্দকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে রফা করা যাবে যা forced voluntary retirement মতন হয়ে দাঁড়ায়। চা বাগানের শ্রমিকদের বাড়ি নির্মাণের মুল্য ২.৫ কাঠা জমি ও নগদ ৭৫০০০ টাকা দেওয়া হবে এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, গ্র্যাচুইটি দেবারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে Anti-Eviction Committee এবং Mazdoor Morcha আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনে দু'জন অস্থায়ী শ্রমিক রাম ভগৎ এবং রঞ্জিত মন্ডল পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ২৬ শে জুন, ২০০২ সালে। আরও অনেকে বুলেটের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। The Chandmoni Anti-Eviction Joint Action Committee বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে। চাঁদমনির ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছিল কেমন করে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চা বাগানের জমি করায়ত্ত করে অসহায় গরীব শ্রমিকদের অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে নিক্ষেপ করা যায়।[২০]

শিলিগুড়ি বাণিজ্য অর্থনীতি ক্রমবিকাশের ধারায় যোগ হল মার্কেট কমপ্লেক্স এর প্রস্তাব। বাজারের পরিসর ও ভাবনাকে আরও সুসংহত রূপ দেবার জন্য ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিশ্রুতিমত শিলিগুড়িতেও একটি স্থায়ী মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজ শুরু করে পুরসভা। নিউ মার্কেট নাম দেওয়া হবে, এই সিদ্ধান্ত হয়। উদ্দেশ্য, সমস্ত ঘুমটি দোকান হিলকার্ট রোড থেকে উঠিয়ে এবং ফল-সব্জির বাজারকে একটি এলাকাবদ্ধ করে নাগরিকদের সুবিধা দেওয়া। এই বাজার নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ১৯৬০ সালে। এই পথে পা বাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গড়ে উঠল শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, হংকং মার্কেট ইত্যাদি। হংকং মার্কেট স্মাগলিং ব্যবসার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। প্রচুর টাকা খাটিয়ে শিলিগুড়ির বেশ কিছু ব্যবসায়ী অসৎ উপায়ে প্রায় এক সমান্তরাল অর্থনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কোন মদত নেই, একতা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

এই শহরকে কেন্দ্র করে এক ধরণের 'Border Economy' তৈরী হয়েছে। নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য যোগাযোগ আয়ত্ত নিবিড় হয়েছে। নেপাল থেকে শিলিগুড়ি হয়ে Asian High Way-এ বাংলাদেশে প্রবেশ করে ফুলবাড়ী সীমান্ত দিয়ে। একটা বড়মাপের বাণিজ্যিক কর্মকান্ড শুরু হয়েছে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘিরে। এখন প্রশ্ন হল বাণিজ্যের এত বাড়বাড়ন্ত স্বত্ত্বেও শিল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। মানস দাশগুপ্ত সঠিক প্রশ্ন তুলেছেন, যদি স্মাগ্লিং-এর বিনিয়োগে বেশী লাভ হয়, বেশী মুনাফা হয়, তবে শিল্প কেন ? বলা বাহুল্য শিলিগুড়ি লাভের শহর।

তাই শিলিগুড়ি আপাতত শিল্পবিহীন। সমীর কুমার দাসও শিলিগুড়ি শিল্পায়ন নিয়ে এক হতাশার চিত্র এঁকেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ১৯৯১ সেন্সাস অনুযায়ী শিলিগুড়ির সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিল্প শ্রমিকের সংখ্যার নিরিখে অনুপাত হল ৫.৩শতাংশ। আবার উত্তরবঙ্গের স্থায়ী আমানত ও total value added সম্পদের তুলনায় অনুপাত হল যথাক্রমে ১.২ শতাংশ এবং ৩.২শতাংশ। একটি হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় যে শতকরা ১৫ভাগ শিল্প শ্রমিক এখনও বাস করে দক্ষিণবঙ্গে। ফলে শিল্পায়নের অভাব শিলিগুড়িকে একটি মার্কেট টাউনে পরিণত করেছে।

বিশ্বায়নের ফলে পরিবর্তনের হাত ধরে বাজার অর্থনীতিতে যে চোখধাঁধানো, চটকদারি ব্যাপার এসেছে। শিলিগুড়ি এই বৃত্তের বাইরে নয়, বরং নিজেকে মেলে ধরেছে এই পরিবর্তনের অংশীদার হতে। বড় বড় শপিং মল, আইনক্স, বার্বিকিউ নেশনের মতো outlet গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারী ব্যাঙ্ক, ইন্সুরেন্স কোম্পানী। অর্থাৎ কমার্স আর সার্ভিস সেক্টর পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই order করা যাচ্ছে Swiggy বা Zomoto'র মত পরিষেবা প্রদানাকারী agency'র সাথে পছন্দমত খাবার সরবরাহের জন্য। Amazon বা Flipcart-এর মত সংস্থার মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে ক্রেতাদের কাছে তাদের প্রিয় ও পছন্দের রকমারি সম্ভার। বৃহত্তর শিলিগুড়ির সাথে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জনপদ Satellite Town. পাইকারী বাজারকে একই ছাতার তলায় আনার জন্য চম্পাসারী নিয়ন্ত্রিত বাজার চালু হয়েছে। বলা হয় যে শিলিগুড়ির বাণিজ্য culture এতটাই প্রবল যে প্রতি ১০০জন পিছু শিলিগুড়িতে Retail shop-এর সংখ্যা ৩, যা কিনা ভারতের কোন শহরে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। ভারতের দ্রুত গড়ে ওঠা শহরের মধ্যে শিলিগুড়ি হল অন্যতম শহর। একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে, শিলিগুড়ি উন্নয়নের হার (১৯৭১-৮১) ছিল ৫৭.৮শতাংশ। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে শিলিগুড়িকে I.U.D.P. প্রকল্পের অধীনে এনে আরও প্রয়োজনীয় কিছু পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় — যেমন পরিকাঠামো গঠনে সাহায্য প্রদান, নাগরিক পরিষেবার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি। শিলিগুড়িতে BCC&I- এর অফিস খোলা হয়েছে যাতে করে 'origin of certificates'-এর সুবিধা প্রদান করা সহজতর হয়। একথা জানিয়েছেন BCC&I-এর সভাপতি শ্রী অমরদীপ দাশগুপ্ত।

শিলিগুড়িতে ব্যবসায়ী সমিতি গড়ে উঠেছে যেমন Siliguri Merchants' Association, FOCIN ইত্যাদি। Merchants' Association সাধারণ সম্পাদক এক নিবন্ধে সাম্প্রতিক কালে ব্যবসার নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই মতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল নিয়ন্ত্রিত বাজারের লেভি প্রবর্তন। এই লেভি প্রবর্তনের কুফল সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমিতি বারংবার দরবার করে। একই রকমভাবে, বিভিন্ন রাজ্য

ও দেশের সীমান্ত অঞ্চলে এই নিয়ন্ত্রিত বাজার অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন রাজ্য ও প্রতিবেশী দেশ সমূহের বিক্রয় করের তারতম্য শিলিগুড়ি বাণিজ্য ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে সমস্যায় ফেলছে। যাইহোক্, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জাতীয় ফোরামে দেশজুড়ে বিক্রয় করের ব্যাপারে একই নীতি গ্রহণ করবার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে শিলিগুড়ি বাণিজ্য সম্প্রসারণে জোয়ার আসবে। তাছাড়া, পণ্যবাহী গাড়ির প্রবেশ ও পার্কিংয়ের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করায়, বণিকমহল উদ্বেগ প্রকাশ করে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে সমস্যার সমাধান হলেও তারা বিকল্প রাস্তা ও টার্মিনালের দাবি তোলে। ইস্টার্ন বাইপাশকে NH-31 এবং NH 34 সাথে সংযুক্ত করার দাবী তোলে। ফুলবাড়ী হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্য করিডর খোলার দাবি জানানো হয়। এর ফলে শিলিগুড়ি শহরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনেকগুণ বাড়বে বলে তারা আশা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে উপরোক্ত দাবিগুলি ইতিমধ্যে অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। মাটিগাড়ায় পরিবহণ নগরে SJDA, ASSOCIATION- ৯৯টি জমির প্লট প্রদান করেছে, অত্যাধুনিক ware house গড়ে তোলার জন্য।

পরিশেষে বলা যায়, যেখানে দোকানদারী, অর্থনীতির মূল ভিত্তি তার কিছু অসুবিধা আছে। বাণিজ্য বাড়তে বাড়তে একটা Saturation Point-এ পৌঁছে যায়। ফলে দেখা দেয় 'প্রচ্ছন্ন বেকারী' urban disguised unemployment। এই উদ্বৃত্ত দোকান থাকায় প্রতিযোগিতা তীব্র হতে বাধ্য। মানস দাশগুপ্ত শহরকে melting spot হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে শিল্প সভ্যতার সব ভাষাভাষীর মানুষ এক হয়ে যায়, যা বাণিজ্য সভ্যতায় হয়না। বাণিজ্য সভ্যতায় মধ্যবিত্তের সঙ্কট বৃদ্ধি পায় বেশী, বর্ণবৈষম্য আরও প্রকট হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. জে. ডি. হকার, হিমালয়ান জার্নাল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ১২৭-১৩৬

২. মানস দাশগুপ্ত, 'শিলিগুড়ির আকস্মিক বৃদ্ধি — ফলে বৃত্তি সমস্যা', দুর্গা সাহা সম্পাদিত 'শিলিগুড়ি আজ ও আগামীকাল', সপ্তম, পৃষ্ঠা-৬

৩. মানস দাশগুপ্ত, 'ডেমক্রেটিক প্যাটার্ন অব হিল এরিয়াস' - এস.কে. চৌবে সম্পাদিত প্রেফাইলস অব মডার্ন জেসন এন্ড এডাল্টেসন, ১৯৮৫, পৃষ্টা-৫৬

৪. ও'ম্যাল্লে, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, দার্জিলিঙ, ১৯০৭ পৃষ্ঠা-১৫৬

৫. সমীর কুমার দাস, 'মাইগ্রেসন, আইডেন্টিটিস এন্ড ডেমক্রেটিক প্র্যাকটিসেস ইন ইন্ডিয়া', ২০১৮, পৃষ্ঠা-৬৫

৬. বিকাশ ঘোষ, 'বৃহত্তর শিলিগুড়ি উন্নয়ন পরিকল্পনায় কর্পোরেশন', দুর্গা সাহা সম্পাদিত 'শিলিগুড়ি আজ ও আগামীকাল', সপ্তম, পষ্ঠা-১৫

৭. শ্রীময়ী গুহঠাকুরতা, 'ক্যালকাটা এন্ড ইটস আরবান স্পেস'—এ স্টাডি ইন বাজার সেটেল্টমেন্টস, 'মল্স এন্ড সুপার মার্কেটস', প্রদীপ বসু সম্পাদিত 'কলোনিয়াল মর্ডানিটি ইন্ডিয়ান পারস্পেকটিভ', ২০১১, পৃষ্ঠা-১৯১

৮. সমীর কুমার দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা ৮০-৮১

৯. হান্টার, 'আ স্টাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব দার্জিলিঙ', ১৮৭৬ পৃষ্ঠা-১৯১

১০. বরুণ দে সম্পাদিত, 'গেজেটিয়ার্স অব ইন্ডিয়া', দার্জিলিঙ ১৯৮০ পৃষ্ঠা-২৯৬

১১. বরুণ দে সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা-২৯৮

১২. দেবাশিস চক্রবর্তী, 'শিলিগুড়ি মহকুমার ১০০ বছর', ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৭

১৩. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়,'শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমা পরিচয়', ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৯৩

১৪. ইছামুদ্দীন সরকার সম্পাদিত, শ্রী হরিমোহন সান্যাল রচিত 'দারজিলিঙ্গের ইতিহাস', ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৯

১৫. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা-৭৯

১৬. দেবাশিস চক্রবর্তী, 'প্রাগুপ্ত', পৃষ্ঠা-১৫

১৭. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, ' প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা-১৯৩-১৯৪

১৮. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা-১৯৬

১৯. সমীর কুমার দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা ৭১-৭২

২০. সমীর কুমার দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪

২১. আমার প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ড. সুপম বিশ্বাসের অনুরোধ এবং ক্রমাগত তাড়া এই লেখাটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। নানা তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করায় আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সেই শিলিগুড়ি, আজ শিলিগুড়ি, কার শিলিগুড়ি ?

সৌমেন নাগ

উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি। কে এই শিরোপার উজ্জ্বল মুকুট এই নগরের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে তার কোনো ইতিহাস নেই। সে যেন আপন গতির দুর্বার বর্ণ ছটায় নিজেই নিজের পরিচয়লিপিতে এই শিরোপায় নিজেকে অভিধা করে নিয়েছে।

বাড়ছে শিলিগুড়ি কলেবরে।বাড়ছে তার কৌলিন্যের দাপটে। নগর পরিকল্পনার রূপকারদের প্রচলিত নিয়মের ভাবনাকে তোয়াক্কা না করেই এই নগরের নানা জনস্রোতের জোয়ার বাঁধ ভাঙা জলস্রোতে বয়ে আনা পলিস্তরের মতন নিত্য নতুন জনবিন্যাসের সূচনা ঘটিয়ে চলেছে। আজকের এই জনকল্লোলের নগর শিলিগুড়ির জন্ম কাল নিয়ে অকাট্য তথ্য কোথায় ? তার জন্য এই আলোচনার শিরোনামে এই প্রশ্নটা অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে কারণ কোনও শহর নিয়ে গবেষণার মূল শক্তিই হচ্ছে এটা আমার শহর এই আত্ম শ্লাঘার এক আবেগের ঘন অনুভূ তি।

শিলিগুড়ির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা যেন আলাদীণের আশ্চর্য প্রদীপের যাদুর স্পর্শের মতন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এক নগর। তবে এখানে নেই আরব্যরজনীর সেই মনোহর কাহিনী।আছে দেশ ভাগের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জনস্রোতের দুঃসহ স্মৃতি ও জীবন যুদ্ধের ইতিহাস। মায়ের কোলে কয়েক মাসের শিশু হযেও উদ্বাস্তর টীকা কপালে এঁটে এই। প্রতিবেদকও সেই জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে সেদিনের প্রায় এক অন্ড গ্রাম এই শিলিগুড়ির মাটিতে হামাগুড়ি দিতে শিখেছিল লন্ঠন আর কেরোসিন কুপির মিটি মিটি আলোতে ঘরের বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে শেয়ালের ডাক শুনে ভযে মাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকত।এই শহরটা আমার শহর এই আত্মীয়তার সুর মনের গভীরে প্রবেশ করার পথে জীবন যুদ্ধের ভাবনা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াত।মা। বাবার কথায় আমাদের দেশের বাড়ি পূর্ববাংলা ও বাঙাল কথার সুরে শিশু মনেও সেই দেশটাকেই অনেক দিন পর্যন্ত আপন দেশ মনে হত। শিলিগুড়ি আমার শহর এই চেতনার শেকড় গভীরভাবে মনের মধ্যে প্রোথিত হতেই পার হয়ে গেল যৌবনের দিনগুলি। আজকের প্রজন্মের কাছে তাই এই শহরের নিজস্ব সংস্কৃতির একটা আকর্ষণীয় ছবি যে আমরা উপস্থিত করতে পারিনি এই নির্মম সত্যটাকে আমরা অস্বীকার করি কি ভাবে ?

আজকের প্রজন্মের কাছে দেশ ভাগের সেই দুঃসহ স্মৃতি নেই। কিন্তু তারা যে আমাদের মতন প্রবীণদের কাছ থেকে এই শহরের নিজস্ব সামাজিক সংস্কৃতির কোনও পরিকাঠামো পায় নি, এরা পেয়েছে এক মিশ্র সংস্কৃতি। গতিশীল সমাজ বিজ্ঞানের হয়তো এটাই নিয়ম। কিছু পেতে গেলে কিছু খোওয়াতে হয়। আধুনিকতার ছটায় আমরা

প্রগতিকে বরণ করেছি।হারিয়েছি আমাদের যৌথ পরিবারের সেই আত্মীয়তার স্পর্শের আমেজ।

ভাঙছে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক বাঁধন। জন্ম নিচ্ছে নগর ও নগরায়ন। মনে পড়ে মহেশ গল্পে মেয়ে আমিনাকে নিয়ে গফুরের গ্রাম ছেড়ে চটকলের উদ্দেশ্যে যাত্রার কথা? ১৮৬৭ সালের ১ জানুয়ারি কালিম্পং মহকুমাকে দার্জিলিঙের সঙ্গে যুক্ত করে দার্জিলিংকে দুটো মহকুমায় ভাগ করা হয়েছিল। (ক) সদর মহকুমা।তিস্তার উভয় পারের পার্বত্য অঞ্চল ছিল এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। আয়তন ৯৬০ বর্গ মাইল। (খ) অপর মহকুমার নাম তরাই মহকুমা।পাহাড়ের পাদদেশে ২৭৪ বর্গ মাইলের এই মহকুমার সদর দপ্তর ছিল আজকের ফাঁসিদাওয়ার কাছে হাঁসখাওয়া। শিলিগুড়ি তখন অনেক গ্রামের ভিড়ে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের এক ছোট মৌজা। ১৮৮১ সালে শিলিগুড়ি মৌজা সহ কিছু অংশ জলপাইগুড়ি জেলা থেকে নিয়ে এসে দার্জিলিঙের সঙ্গে যুক্ত করে তরাই মহকুমার সদর দফতর হাঁসখাওয়া থেকে সরিয়ে এনে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। এর কারণ ১৮৭৮ সালে নর্থ বেঙ্গল মিটার গেজ রেল লাইন শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রসারিত করা হল।

কলকাতার অস্তিত্ব সেই মনসামঙ্গল কাব্য রচনা কালের অনেক আগে থাকলেও বামফ্রন্ট সরকার জব চার্ণকের পদার্পণ কালকেই কলকাতার জন্ম দিবস বলে ঘোষণা করে তার তিনশো বছর জন্ম দিবস উদযাপন করেছিলেন। অনুরূপ একটা চেষ্টাও হয়েছিল বিগত বাম শাসিত শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল আমলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শিলিগুড়ির জন্মকালে এমন কোনও শ্বেত প্রভুর আগমনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ১৮৭৮সালে রেলের এই সম্প্রসারণ বছরটি বা ১৮৮১ সালে তরাই মহকুমার সদর দপ্তর শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত সালকে শিলিগুড়ির জন্ম কাল ধরা যায় কিনা ভাবা যেতে পারে। আবার মনে রাখতে হবে ১৯০৭ সালে তরাই মহকুমার সমতল অঞ্চলকে কার্শিয়াং মহকুমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে গঠন করা হয়েছিল শিলিগুড়ি মহকুমা।

১৯০১ সালে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল ৭৮৪।১৯৩৮ সালে জর্জ মেহবাটকে মনোনিত সভাপতি করে যখন শিলিগুড়ির জন্য গঠন করা হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ড , তখন এর জনসংখ্যা ছিল ৮৫৪৯ জন।

১৯৪৯ সালে আটটি ওয়ার্ড নিয়ে হিলকার্ট রোডের এক ভাড়া বাড়িতে শুরু হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরসভার যাত্রা। ১৮৯৫ সালে ডি আই ফান্ড হাটে (আজকের পুরাতন বাজার) স্কট মিশন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিল সেটাই এই শহরের প্রথম বিদ্যালয়।১৯০৭ সালে শিলিগুড়িতে স্থাপিত হয়েছিল এখানকার প্রথম ডাকঘর। আজকের শিলিগুড়ির জনবিন্যাসের সূচনা কাল বলে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪৭ সালের সেই বিষাদঘন দেশ ভাগের কাল থেকে। ১৯৪১ সালে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল ১০৪৮৭। ১৯৫১সালে সেটা হয় ৩১৪৮০। তার পরের ইতিহাস তো শুধু জনস্রোতের ইতিহাস। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ এই দশ বছরে এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশ। ঐ সময়ে এখানে বাড়ি নির্মাণের হার ছিল ১১ শতাংশের মতন। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলে গড়ে

উঠেছে অসংখ্য বস্তি।

শরীরের মেদ বৃদ্ধির ফলে যে ওজন বৃদ্ধি তা যে স্বাস্থ্য বৃদ্ধির পরিমাপ নয় এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। শিলিগুড়ি বাড়ছে তার কলেবরে। তার জনসংখ্যায়। এখানে জনবিস্ফোরনের হার ১১৯ শতাংশের বেশি। এই বৃদ্ধির হার এই রাজ্যের যে কোন শহরের তুলনায় বেশি তো বটেই দেশের অন্য সব শহরের তুলনায়ও অনেক বেশি।

যেটা মনে রাখা দরকার নগর ও নগরায়নের মধ্যে আছে একটা বুনিয়াদি পার্থক্য। আর এই পার্থক্যকে আমরা গুলিয়ে ফেলি বলে নগরোন্নয়নের রূপটা ধরতে পারিনা। নগর বলতে সাধারণ ধারণা বড় বড় ইমারত,দোকান, গাড়ির ভিড়,স্কুল,কলেজ বড় হাসপাতাল ইত্যাদি সহ ঘন জনবসতি। নগরের প্রশ্নে ভারতের জনগণনায় বলা হয়েছে ন্যূনতম ৫০০০ মানুষের বসবাস অথবা প্রতি বর্গ কিলোমিটার ৪০০মানুষের বসবাসের ঘনত্ব। পশ্চিমবঙ্গের পৌর আইনে বলা হয়েছে কম করেও ২০হাজার মানুষের বসবাস ও প্রতি বর্গ কিলোমিটার ৭৫০ জন মানুষ এবং সেই জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ অ-কৃষি কাজে নিযুক্ত।

১৮৬৫ সালে নগর বা শহর পরিকল্পনার ধারণাটি এসেছিল ইতালিতে।১৯০৯ সালে নগর পরিকল্পনার আইন রচিত হয়েছিল ইংল্যান্ডে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শর্ত গুলি ছিল নগরের পরিবেশ তথা তার স্বাস্থ্যের সুরক্ষা। আর সেখান থেকেই এসেছে নগরের পাশাপাশি নগরায়নের ভাবনা। একটা বাড়ির ঘরগুলি পরিচ্ছন্ন রাখলেই বাড়ির পরিচ্ছন্নতাকে রক্ষা করা হয় না। ঘরের বাইরের জায়গাগুলিতে খোলা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ না থাকলে সেই বাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না।

একটা শহর তাকে চাপমুক্ত করার পরিবেশ গড়ে না দিলে সেই শহর পুর সমস্যার নানা চাপে ভেঙে পড়ে। শহরের চারপাশের এলাকাকে উন্নয়নের আওতায় এনে সেখানেও উন্নত পরিষেবাসহ কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক সুবিধাগুলির বিকেন্দ্রিকরণই নগরায়ণের শর্ত।

শিলিগুড়ি একটি অপরিকল্পিত শহর। দুর্গাপুর কল্যাণী বা সল্টলেক অথবা নিউটাউনের মতন পরিকল্পিত শহর নয়। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে যত্রতত্র বসতি। এমন কি বসতি এলাকার জন্য পরিবেশের বিচারে ক্ষতিকর এমন ছোট ছোট শিল্প। বৃহৎ শিল্পের কোনও অস্তিত্ব এখানে নেই। একটা পরিকল্পিত নগরের ভূ মি ব্যবহারের মানচিত্র তৈরি করে সেই অনুযায়ী বাসস্থান, শিল্প, পার্ক, বাজার,স্টেডিয়াম,পাবলিক হল, বাসস্ট্যান্ড, বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ ইত্যাদির মতন পুর ও সামাজিক অপরিহার্য বিষয়গুলির বন্টন ব্যবস্থা রাখতে হয়। যান চলাচলের জন্য নগরের ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়। শহরের ফুস ফুস মুক্ত বায়ু প্রবাহের জন্য ২৫শতাংশ খোলা জায়গার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

শহরের উপর চাপ কমাতে তাই প্রয়োজন নগরোন্নয়নের পাশাপাশি নগরায়ণের অর্থাৎ এই শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলির উন্নয়ন।

প্রশ্নটা রাজনৈতিক নয়। তাই সত্যকে সত্য বলেই মেনে নিতে হয়। শিলিগুড়ি পুর এলাকা জনসংখ্যার চাপ বহনের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে গেছে অথচ নগরের প্রতি জনস্রোতের ধারা অব্যাহত। এই অবস্থায় 'উত্তরায়ণের' মতন তথাকথিত স্যাটেলাইট টাউনশিপ তার সমাধান হতে পারে না। সেখানে জায়গা নেয় উচ্চবিত্তের মানুষেরা। অথচ সমস্যা উচ্চবিত্তের নয়। সমস্যা সাধারণ মানুষের।

আজকের যিনি পুর প্রশাসক, তিনি উত্তর বঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকাকালীন উত্তর বঙ্গের অন্য সব এলাকায় কি উন্নয়ন হয়েছে তার বিবরণ এই প্রতিবেদকের দেয়া সম্ভব নয়। কারণ অসুস্থতার জন্য এই প্রতিবেদক বলতে গেলে গৃহবন্দি। কিন্তু শিলিগুড়ি সংলগ্ন আশেপাশের নানা এলাকায় মাঝে মধ্যেই যেতে বাধ্য হই। অস্বীকার করার জায়গা নেই এখানকার নানা প্রান্ত এলাকা যা বলতে গেলে প্রায় অগম্য ছিল সে সব এলাকাতেও এই মন্ত্রীর অদম্য উদ্যোগের ছোঁয়ায় ঝা চকচকে পাকা রাস্তা ও জল নিকাশির ব্যবস্থা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। বিশেষ করে আমার গবেষণাপত্র রচনার সময় এই সব প্রান্তিক এলাকাগুলিতে আসার প্রয়োজন হত। পার্থক্যটা তাই চোখে পড়ে।

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার দরকার হল কারণ আমার প্রতিবেদনটির শিরোনামে আছে আজকের শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার এই উন্নয়নের ফলে এই শহর থেকে জনবসতির চাপ ঐ সব এলাকায় যে অনেকটা সরে গেছে তা উত্তরায়ণের মতন ঘোষিত না হলেও সেখানকার জনবিন্যাসের ছবি থেকে অনেকটাই বোঝা যায়।

শিলিগুড়ি তুমি কার ?

প্রশ্নটা কিন্তু কোনও অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই শহর আমার শহর এই ঘোষণাটি উৎসারিত হয় মনের গভীরতম আবেগের উৎসভূমি থেকে। এর জন্য দরকার সেই শহরকে ঘিরে তার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আমার কলকাতা ভাবনার পেছনে আছে তিনশো বছরের ইতিহাসের পাশাপাশি তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌলিন্য।আমার মালদহ এই আবেগের পেছনে আছে প্রাচীন গৌড় বঙ্গের ইতিহাস। আমার কোচবিহার এই দাবির পেছনে আছে কোচবিহার সাম্রাজ্যের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য। শিলিগুড়ির তো নেই এমন কোনও প্রেক্ষাপট। শিলিগুড়ি শহরে কারা এসেছেন কেন এসেছেন এ সব কিছুই হতে পারে Urban Geography-র গবেষকদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিলিগুড়ির এই বিস্ময়কর বৃদ্ধি নিয়ে রুরকির নগর পরিকল্পনা দপ্তর কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের বহু গবেষকদের গবেষণার বিষয় বলে অনুমোদন দিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের এই জনবসতিকে বলা যেতে পারে মাইগ্রেসন জনবসতি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এখানে

প্রতি ১০০জন পিছু ৬০জন এসেছে পূর্ব বাংলা থেকে, বিহার থেকে এসেছে ১৭ শতাংশ। মারোয়ারি ৮ শতাংশ। বাকিদের মধ্যে আছে দক্ষিণ বঙ্গ, আসাম ,নেপাল, পাঞ্জাব ইত্যাদি।

ব্যবসার ক্ষেত্রে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০ শতাংশ আছে পূর্ব বঙ্গ থেকে আগতদের দখলে, ৭০ শতাংশ এর মধ্যে মারোয়াড়ি, বিহারি আর পাঞ্জাবি। বাকি ১০শতাংশে আছে আসাম ও বাংলার দক্ষিণ ভাগ থেকে আগত ব্যবসায়ীদের হাতে।

আগে পাইকারি ব্যবসার কেন্দ্র বলে বোঝাত খালপাড়াকে। এখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আছে মূলত মারোয়াড়ি। তবে এখানকার ব্যবসায়ীদের ব্যবসা মূলত খাদ্যশষ্য কেন্দ্রিক। এখন এই পাইকারি ব্যবসার দ্রুত বিকেন্দ্রিকরণের সঙ্গে বহুমাত্রিক হয়ে চলেছে। এখন সেবক রোড হয়ে উঠেছে আরেকটি কেন্দ্র। এখানে কিন্তু মারোয়াড়িদের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। এই এলাকা মূলত ইলেকট্রনিক, মোটর পার্টস, ওষুধ, গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, রঙ ইত্যাদির মতন ব্যবসা। এখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আছে অতি অবশ্যই মারোয়াড়ি। আর আছে পাঞ্জাবি, বিহারি, গুজরাতি এবং আশ্চর্য জনক ভাবে সামান্য সংখ্যায় হলেও বাঙালি।

এখানে আছে নিয়ন্ত্রিত বাজার বা Regulated Market . মূলত তরিতরকারি,ফল মাছ এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে অবশ্য বাঙালি ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। শিলিগুড়ি শহরের আরো তিনটি ক্ষেত্র শিল্প বা ব্যবসার মানচিত্রে জায়গা পাচ্ছে। প্রথমটি হল হোটেল ব্যবসা, দ্বিতীয়টি নার্সিংহোম ব্যবসা আর তৃতীয়টি শিক্ষা (প্রাইভেট স্কুল ও কলেজ)।

শিলিগুড়িকে খুচরো দোকানের শহর বলা যেতে পারে। প্রতি হাজার জনসংখ্যায় এত খুচরো দোকানের সংখ্যা ভারতের আর কোনো শহরে নেই। এর প্রধান কারণ এখানে নেই কর্ম সংস্থানের সুযোগ। এই সব খুচরো দোকানের ২৭ শতাংশই ছোট ছোট খাবারের দোকান। ১৪ শতাংশের মতন চা,পান,বিড়ি । শিলিগুড়ি শহরকে রিক্সার শহর বলা যায়। আগে অধিকাংশ রিক্সা চালক ছিল বিহারি। এখন এরা মুলত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রাম থেকে আগত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। এক সময় এই শহরের প্রচুর সংখ্যক যুবক নেপাল সীমান্ত থেকে বিদেশী দ্রব্য বেআইনী ভাবে আনার কাজে যুক্ত ছিল। এই সব সামগ্রীর ভান্ডার নিয়ে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে রমরমা চলত বিখ্যাত 'হংকং' মার্কেট। এখন অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু হয়ে যাওয়ায় এই বিদেশী সামগ্রী আইনি ভাবেই সর্বত্র লভ্য। ফলে সেই 'স্মাগলিঙ' শিল্প আর নেই। সেখানকার বেকার শ্রমিকেরা এখন অনেকেই অটো চালাতে নেমে পড়েছে। এদের দাপটে রিক্সা চালকেরা কোণঠাসা হয়ে গেছে। শিলিগুড়ি শহর রিক্সা শহর থেকে এখন রূপান্তরিত হয়েছে অটোর শহরে।

শিলিগুড়ির ভালো মন্দ আমারও ভালো মন্দ। আজকে কিন্তু আমার শিলিগুড়ি এই একটা আবেগ এই প্রজন্মের মনে নাড়া দিতে শুরু করেছে। গড়ে উঠছে শিলিগুড়ি নিয়ে ভাবনার একটা মঞ্চ। গড়ে তোলা হচ্ছে বহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ভাবা হচ্ছে এই শহরের ভালো মন্দের বিষয়গুলি নিয়ে। শহর শিলিগুড়ি এখন শুধুই শিলিগুড়িবাসীর নয়। এই

শহরকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলি তো বটেই প্রতিবেশি রাজ্য বিহার সিকিম আসাম সহ প্রতিবেশি দেশ ভূটান ও বাংলা দেশের সীমান্ত জেলার জনজীবনও বহু বিষয়ে নির্ভরশীল। ফলে শিলিগুড়িকে নিজ এলাকার বসবাসকারীদের দায়িত্ব বহন ছাড়াও পরিষেবার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করতে হয়।

এই শহরে আসে নানা কাজে নিত্য যাত্রীরা। এদের অর্থনৈতিক ভূ গোলের ভাষায় বলা হয় Commuter । এরা এখানে আসে নানা জীবিকার তাগিদে। সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যা বেলায় ফিরে যায়। এক সমীক্ষায় জানা যায় এই নিত্য যাত্রীদের ৩১ শতাংশ আসে কাজের সন্ধানে।বাজার করতে আসে ১৫ শতাংশ। শিক্ষায়তনে আসে ৮ শতাংশ। চিকিৎসার প্রয়োজনে আসে ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ আসে ভ্রমণের জন্য, বাকিরা আসে অন্য নানা সমাজিক প্রয়োজনে। ভিন্ন রাজ্য থেকে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নানা ব্যবসায়িক কাজে এখানে এসে সরকারি জমিতে অস্থায়ি ভাবে আস্তানা বানায়। তৈরী করে অবৈধ খাটাল। এরা এই শহরে ব্যবসা করে কিন্তু কোনও সামাজিক বা পুর দায়িত্ব পালন করে না, যা মুনাফা সব পাঠিয়ে দেয় নিজ রাজ্যে পরিবারের কাছে। এদেরও শহরের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে পুরসভাকে পরিষেবা দিতে হয়। পুরসভা এদের কাছ থেকে কোনও রাজস্ব পায় না।

শিলিগুড়ি শহরকে বলা হয় এক রাস্তাকেন্দ্রিক শহর। হিলকার্ট রোড। এর প্রবেশ কেন্দ্র ছিল মূলত এক সেতুকেন্দ্রিক। যুক্তফ্রন্ট বা বাম সরকারের পূর্ত দপ্তরের নগর উন্নয়নে তাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় রাখতে এই শহরের প্রবেশদ্বার দার্জিলিং মোড় থেকে মহানন্দা সেতু পর্যন্ত ভবিষ্যতের প্রসারতার ভাবনাকে চিন্তায় না এনে কদাকার বাণিজ্যিক বিল্ডিং নির্মাণ করে ভরিয়ে দিলেন। সেই সব বাণিজ্যিক বাড়িগুলি অব্যবহারযোগ্য অবস্থায় পড়ে আছে।এখন এই শহরের প্রবেশ মুখ প্রসারিত করতে হলে এই বাড়িগুলি ভাঙার প্রয়োজন হবে।

এই শিলিগুড়ি আমার আপনার

এখন কিন্তু বলার সময় এসেছে এই শহর আমার। এই শহর আমাকে দিয়েছে যা তার কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়ার দায় আমারও আছে। সবটাই প্রশাসনের এই কথাটি বলার পাশাপাশি নাগরিক হিসাবে আমার দায়বদ্ধতা যেন ভুলে না যাই।

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুধু শহরের জন্য নয়, আমাদের বাঁচার স্বার্থে। পাশের ছোট্ট সিকিমের অধিবাসীরা যদি এর ব্যবহার বাতিল করতে পারে আমরা এক বৃহৎ নগরের বাসিন্দা হয়ে সেই দায়িত্ববোধের পরিচয় কেন দিতে পারি না ?। বাড়ির ময়লা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় কর্পোরেশনের কর্মীরা। বাড়িতে বাড়িতে ব্যবহৃত

দ্রব্য রেখে দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে দুটি করে পাত্র। একটিতে থাকবে মাটিতে মিশে যাওয়া যাকে বলা হয় bio degradable দ্রব্য, অপরটিতে non-degradable দ্রব্য। কতজন এই নিয়ম মেনে ব্যবহৃত দ্রব্য পৃথক করে পুর প্রশাসনকে সাহায্য করি ?

শহর সম্প্রসারণের সঙ্গে নানা সমস্যারও আগমন ঘটছে। এই ধরণের এক জ্বলন্ত নাগরিক সমস্যা Solid waste management. প্রতিদিন আমরা অসংখ্য ধরনের বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে চলেছি। প্যাকেজজাত নানা দ্রব্যসহ কাচের সামগ্রীর পাশাপাশি বাতিল করা ইলেকট্রনিক দ্রব্য ও আরো নানা সামগ্রী। সভ্যতার যত বিকাশ তত এই বর্জ্য পদার্থ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সারা পৃথিবীর গড় হিসাবে জন পিছু প্রতিদিন ২৫০গ্রাম থেকে ১০০০ গ্রাম বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয়। শিলিগুড়ি শহরে এই নিয়ে কোনও বিস্তারিত সমীক্ষা হয়েছে কিনা জানা নেই। তরুণ গবেষকরা এই বিষয়ের উপর গবেষণা করলে শহর ও গবেষক উভয়েই উপকৃত হবেন। শিলিগুড়ি শহরে যে বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি মাথা ব্যথার কারণ হয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

শিলিগুড়ি শহরের বাইপাসের ধারে অবস্থিত এই বর্জ্য পদার্থ জমা করার জায়গাটি জনবসতি গড়ে ওঠার ফলে হয়ে উঠেছে এক গভীর সমস্যা। আমরা মাইসর বা পুনে। শহরের দৃষ্টান্তের দিকে নজর দিতে পারি। সেখানে এই সমস্ত বর্জ্য সামগ্রী আধুনিক প্রণালীতে পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে কম্পোজ সারের কেক তৈরি হচ্ছে। সেই এলাকার পাশ দিয়ে কিন্তু নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে হয় না। সেখানে অতি সুন্দর শিল্প মন্ডিত উদ্যান সৃষ্টি করা হয়েছে। দলে দলে লোক প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য জমা হয়। কলকাতার ধাবা এলাকার তো রূপান্তর করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার বর্তমান পুর প্রশাসকের (তখন মন্ত্রী) উদ্যোগেই শিলিগুড়িতে গড়ে উঠেছিল এই শহরের এক প্রধান আকর্ষণের জায়গা ‘বেঙ্গল সাফারি’। আশা করা যায় বাই পাসের ধারে এই আবর্জনা ফেলার জায়গাটিও তার প্রচেষ্টায় দুর্গন্ধ মুক্ত একটা নান্দনিক রূপ নেবে।

১৯৬০ সালে বাংলার রূপকার তথা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের স্বপ্নের সৃষ্টি বিধান মার্কেট এই শহরের বাণিজ্যিক ফুসফুস। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই বাণিজ্যিক কেন্দ্রটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কথা ভেবেই বিধান চন্দ্র রায় পরিকল্পনা করেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় শহরের কেন্দ্র স্থলে ৯ একর জমির ওপর নির্মিত এই বাজারের ২ একর জমি কিছু অতি ক্ষমতাবান ব্যক্তির মালিকানার চলে গেলেও বাজারে এখনও সেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের অধীনে আছে। এই বাজারটির আধুনিকীকরণ করে শিলিগুড়ির যানজট থেকে শুরু করে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। এই প্রশাসক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী থাকাকালিন এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে জানি।

শহরের জীবন প্রবাহের ধমনী তার নদী। শিলিগুড়ি সৌভাগ্যবান বাণিজ্যিক এই শহরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত

হয়ে চলেছে দুটি বড় নদী— মহানন্দা ও বালাসন। এই প্রসঙ্গে নদী বিজ্ঞানের একটা প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো দরকার, দুটি নদী যখন মিলিত হয়ে প্রবাহিত হয় তখন যে নদীর উৎস স্থলের উচ্চতা অন্য নদীটি থেকে বেশি সেই মিলিত নদীর নামকরণ হয় উচ্চ উৎস স্থল থেকে উৎপন্ন নদীর নাম অনুসারে। এক্ষেত্রে বালাসনের উৎস স্থলের উচ্চতা ৭৬৭২ ফুট(লেপচা জগৎ) মহানন্দা নদীর উৎস স্থলের উচ্চতা ৭৩৬৬ফুট (মহালধিরাম)। নদী বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে তাই নদীটির নাম মহানন্দা না হয়ে বালাসনের নামে পরিচিত হতে হত। যাক সেই আলোচনা। এটা শিলিগুড়ি পুরসভার দায়ের মধ্যে পড়ে না। তবে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি। প্রতিবেদনে 'মহানন্দা নদীর সংরক্ষণ যোজনা' যে ভুল তথ্য দিয়েছে তার সংশোধনের দরকার আছে। সেখানে বলা হয়েছে মহানন্দা নদী উৎপন্ন হয়েছে পাগলা ঝোরা থেকে। মহানন্দার উৎসস্থল পাগলা ঝোরা থেকে কয়েক শত ফুট উচ্চতায় অবস্থিত মহালধিরাম।

মহানন্দা ও বালাসনকে দখল ও দূষণ মুক্ত রাখতে হবে শিলিগুড়ির বাঁচার প্রয়োজনে। ফুলেশ্বরী, জোড়াপানী নদীগুলি এই শহরের জল নিকাশির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন অথচ এগুলি দখল হয়ে ঘর বাড়ির জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। এদের জীবন দান শহরের জল নিকাশির জন্য প্রযোজন। ১৯৬৬ সালে শিলিগুড়ি শহরের আবাসিক অঞ্চল ছিল ৬ শতাংশ। ১৯৮৬ সালে সেটা হল ২৫শতাংশ। এখন সেই আবাসিক অঞ্চল ৬০ শতাংশের বেশি। এটা কিন্তু শহরের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। রাষ্ট্র সংঘের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৭ একর ফাঁকা জায়গা রাখা দরকার, সেটা হয় সেই শহরের ফুসফুস। শিলিগুড়ি শহরে এই ফাঁকা জায়গার পরিমাণ ০.১৪ একর।। বিমান নির্মাণের নকসা তৈরি সময় যেমন বায়ু প্রবাহের চরিত্রকে মাথায় রাখতে হয় তেমনি একটা শহরের বাড়ি তৈরির নক্সা অনুমোদনের সময় সেই শহরের বায়ু প্রবাহের গতি প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা মনে রাখতে হয়। শিলিগুড়ি শহরে স্টেডিয়ামের উল্টো দিকে হাসমি চকের চার রাস্তার সংযোগ স্থলে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের অনুমতির সময় শহরের কথা ভাবা হয়েছিল বলে মনে হয় না। একটা অপরিকল্পিত শহরে আছে নানা সমস্যা। তার সব কিছু নিয়ে আলোচনার জন্য প্রযোজন এক বিস্তারিত পরিসর। 'পুরবার্তা' প্রকাশের মাধ্যমে যে প্রশাসক অনেককেই আলোচনার মঞ্চে উপস্থিত করতে চান সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি করে। আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু প্রণব কুমার ভট্টাচার্য যেভাবে আমাকে লেখার জন্য তাগিদ দিয়ে লিখতে বাধ্য করেছেন তার জন্য তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

এই শহর আমার শহর। এই শহরের সার্বিক উন্নয়ন তো আমারও স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশায় রইলাম।

শিলিগুড়ি নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকে

নবেন্দু গুহ

এক সময় নিতান্তই গন্ডগ্রাম শিলিগুড়ির কোনরকম পরিচিতিই ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত শিলিগুড়িসহ দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অংশের মালিকানা নিয়ে প্রায়শই নেপাল এবং সিকিমের মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকতো। এহেন ঝামেলার মধ্যে ধূর্ত শেয়ালের মতো ঢুকে পড়ে ইংরেজ শাসকরা। নেপালের বিরুদ্ধে লড়াই করে সিকিমকে সাহায্য করবার নামে নিজেদের কার্যত সেকেন্ড হোমল্যান্ড দার্জিলিং দখলে নিয়ে নেয় ব্রিটিশরা। কিন্তু দার্জিলিং পৌঁছানো বড় ঝামেলার ব্যাপার ছিল। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁচানোটাও যথেষ্টই ঝকমারিপূর্ণ চিল। পাল্কি, গরুর গাড়ি চেপে খাড়া পাহাড়ি পথে দার্জিলিং যাওয়াটা বেশ কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। সেই সময় ইংরেজদের মাথায় আসে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা। শেষমেশ অবশ্য ১৮৮১ সাল নাগাদ শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে টয় ট্রেন চালু করা সম্ভবপর হয়। সেই সময় শিলিগুড়িতে শুধু একটিই রেল স্টেশন ছিল। শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশন তৈরী হয় ১৯৫১ সালে। নিউ জলপাইগুড়ি ১৯৬৬ সালে।

মাত্র দুই ফুট চওড়া ন্যারোগেজ রেল লাইন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পাতা হয়। প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথ পাতার কাজ শুরু হয় ১৮৭৯ সালে। এই কাজ শেষ হয় ১৮৮১ সালে। অবশ্যই চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। শিলিগুড়ির মতো সমতল এলাকা থেকে উঠতে উঠতে ৭৪০০ ফুট উচ্চতার ঘুম রেল স্টেশন এবং তারপর নামতে নামতে ৬৮০০ ফুট উচ্চতার দার্জিলিং রেল স্টেশন পর্যন্ত রেল লাইন পাতার কাজটা কোনোভাবেই সহজ সাধ্য ছিল না। শুধু শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এর মধ্যেই নয়, শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং পর্যন্ত ট্রেন লাইন চালু করা হয়েছিল। কালিম্পঙের কাছে গেইলখোলা পর্যন্ত যেতো এই ট্রেন। তবে এই রুটে যাত্রী ট্রেনের থেকে অনেক বেশী সংখ্যায় চলতো মালবাহী ছোট ট্রেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সালে ভয়াবহ ধস ও বন্যার কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয় কালিম্পঙ এলাকার। শিলিগুড়ি-কালিম্পঙ রেলপথ কার্যতঃ উড়ে যায়। এরপর থেকে এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধই করে দেওয়া হয়।

শুধু কালিম্পঙ নয় ক্ষতি হয়েছিল দার্জিলিঙেও। এছাড়া সেবার তিস্তার ভয়াবহ বন্যার ফলে কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ হবার জোগাড় হয় জলপাইগুড়ির। বর্ধিষ্ণু শহর জলপাইগুড়ি শহর সেই থেকে শুধুই পিছিয়ে যেতে থাকে। আর এগিয়ে যেতে থাকে এক সময়ের নিতান্তই গন্ডগ্রাম শিলিগুড়ি। রাজ্য তো বটেই দেশের প্রয়োজনে দ্রুত উন্নতি হতে থাকে শিলিগুড়ির। প্রয়োজনেই বেড়ে উঠেছে শিলিগুড়ি। এর মূল কারণ অবশ্যই এ শহরের ভৌগোলিক অবস্থান। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং চীন সীমান্ত দিয়ে কার্যত ঘেরা শিলিগুড়ি। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রবেশদ্বারও হয়ে ওঠে শিলিগুড়ি। আবার ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সামরিক দিক দিয়েও শিলিগুড়ির গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বাস্তবে সব দিক দিয়েই গুরুত্ব বাড়তে থাকে শিলিগুড়ির। ফারাক্কা ব্রীজ নির্মাণের পর যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সুগম হয়। অন্য দিকে ১৯৬২ সালে চালু হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৮ সালে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। সবই শিলিগুড়িকে ঘিরে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও শিলিগুড়ির গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়।

উত্তরের এই এলাকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো পর্যটন। উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের

গুরুত্ব যে অপরিহার্য তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দার্জিলিং, কালিম্পঙ, মিরিক তো বটেই ডুয়ার্সের বড় একটি এলাকার পর্যটকদের কাছে অতি প্রিয়। তাছাড়া রয়েছে সিকিম এবং অবশ্যই ভুটান। পূর্ব নেপালেও পর্যটকরা গিয়ে থাকেন শিলিগুড়ি হয়েই। মূলতঃ এই শিলিগুড়ি হয়েই সিকিম, ভুটান, দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা এবং ডুয়ার্স ভ্রমণে আসেন পর্যটকরা। শুধু রেল বা সড়কপথই নয়, বিমান চলাচলও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে শিলিগুড়ি লাগোয়া বাগডোগরা বিমানবন্দরে। শুধু দেশের বিশিষ্ট শহরের সঙ্গেই নয়, বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ব্যাঙ্কক এবং থিম্পু যাতায়াত সম্ভব। বিমানযাত্রীর সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সঙ্গে শিলিগুড়ি বড় আকারের ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই শহরের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। আবার চারদিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকার কারণে চোরাকারবারের ঘটনাও কম কিছু ঘটেনা। অন্যদিকে দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং যেমন সেই সাহেবী আমল থেকে 'এডুকেশন হাব' হিসেবে বিখ্যাত, শিলিগুড়িতেও বেশ কিছুকাল যাবত বেশ কিছু নামী-দামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। ভালো কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালও স্থাপিত হয়েছে। ফলে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার শিলিগুড়ির জনসংখ্যায় ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে। ১০৫১ সালের জনগণনার হিসেব অনুযায়ী শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩ হাজার। ২০১২ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা বেড়ে সাত লক্ষ পেরিয়ে গেছে। কার্যত জনবিস্ফোরণ ঘটেছে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাভাবিকভাবে এখানকার ব্যাপক উন্নয়টাও প্রয়োজন। এই শহরের পরিসর আরো অনেকাংশে বৃদ্ধি করাটা একান্ত প্রয়োজনীয়। এমনিতেই শিলিগুড়ি ঘিঞ্জি শহর হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছে। রাস্তার মান ইদানীং ভালো হলেও নানা রকম যানবাহনের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে এ শহরে চলাচল করাটাই বড় সমস্যা। তাছাড়া এ শহরে ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও ট্রাফিক ব্যবস্থা বড় নড়বড়ে, বড় দুর্বল। ট্রাফিক আইন মেনে চলতে যেন নারাজ সবাই। তার ওপর বড় রাস্তা দিয়ে পথচারীদের যাতায়াত করাটা মুশকিল। কারণ ফুটপাথ দখল হয়ে গেছে সেই বহুকাল আগেই।

শিলিগুড়ির গুরুত্ব সব দিক দিয়ে ব্যাপক বেড়েছে। কিন্তু এ শহরের সার্বিক উন্নয়ন, আরো উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন। মুশকিলটা হলো, এ শহর কার্যত গড়ে উঠেছে ঠিকঠাক পরিকল্পনা ছাড়াই। বলা যায় 'আনপ্ল্যান্ড' শহর শিলিগুড়ি। এই শহরকে আরো প্রসারিত করবার প্রয়াস অবশ্যই চলছে। কিন্তু কিছু কিছু সমস্যা এতটাই শেকড় গেড়ে রয়েছে যে সেই শেকড় উৎপাটন করে সমস্যার সমাধান করাটা চাট্টিখানি কথা নয়। ফলে শিলিগুড়ি শহর পরিবেশ দূষণের শিকার। মহানন্দা নদীর চর যে হারে জবরদখল হয়েছে এবং তার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আবার ফুলেশ্বরী বা জোড়াপানির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া ভার হবে অদূর ভবিষ্যতে। পুর কতৃপক্ষ তথা রাজ্য সরকারের উচিত এ ব্যাপারে গভীর চিন্তাভাবনা করা এবং সমস্যা দূর করবার ব্যাপারে যথার্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। নইলে সমস্যা, বিশেষ করে পরিবেশগত সমস্যা, দূষণসংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আর এমনটা চলতে থাকলে অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যায় পড়ে যাবে শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ি মহকুমার চা-শিল্প ও শ্রমিক (১৮৬২-১৯৬৭)

ড. অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

সূচনা ঃ শিলিগুড়ি অঞ্চলে চা'শিল্প ও শ্রমিকদের আলোচনায় প্রথম যে কথাটি বলা দরকার তা হোল, এ অঞ্চলে প্রথম চা বাগান গড়ে ওঠে ১৮৬২ সনে। শুধু এ অঞ্চলে নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলায় প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা'উৎপাদন শুরু হয় দার্জিলিং পর্বতে, ১৮৫৬ সালে। বাংলার চা'শিল্প ও চা'শ্রমিকদের অবস্থার কথা আমরা সেরকম ভাবে পাইনা। বর্তমান বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এ শিল্প ও শ্রমিক নিয়ে ভাবেন না। দুর্ভাগ্য এই যে ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার ব্রাহ্মসমাজ, জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলার বুদ্ধিজীবী অসম চা'শিল্প ও শ্রমিক নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী অসমে চা' শ্রমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ওখানকার চা'শ্রমিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তা সারা ভারতের মানুষকে জানিয়েছেন। 'চা'দর্পণ' নাটকও সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সে সময়ে বাংলার চা'শিল্প ও শ্রমিক নিয়ে এই বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন নীরব। দুর্ভাগ্য, বর্তমানেও বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে উদাসীন। অথচ ভারত চা'শিল্প ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে বাংলার স্থান দ্বিতীয়। অসমের প্রায় ১৫ বছর পর এ শিল্প বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বাংলার চা'শিল্প ও শ্রমিক নিয়ে গবেষণা শুধুমাত্র তথ্যের অভাবে সেভাবে পরিবেশন করা যায় না। স্বাধীনতার পর বাংলার চা'শিল্প ও শ্রমিকের যে অগ্রগতি আশা করা গিয়েছিল তাও হয়নি।

শিলিগুড়ি অঞ্চলের চা'শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শ্রমিক নিয়োগ ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের মধ্যে পর্বতের চা'শিল্পের জমি প্রায় শেষ হয়ে যায়। 'জেমস হোয়াইট' ব্যাপারটা আগে বুঝতে পেরেই শিলিগুড়ির সন্নিকটে ১৮৬২ সনে 'নিউ চামটা' চা'বাগান স্থাপন করলেন।[১] সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকেই উত্তর তরাইয়ের এক বিশাল বনক্ষেত্র উজাড় করে দেওয়া হল। তরাই বা এ শিলিগুড়ি মহকুমা অঞ্চল ছিল ভয়ঙ্কর। অন্ধকার, স্যাঁতসেতে। ঘন বনে শুধু হিংস্র পশু বা কীট নয়, ছিল অসম্ভব বিষাক্ত মশা। এখানে শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে সমস্যা হল। স্থানীয় মেচ, ধীমাল, থারু, রাজবংশী, কেউ চা'শিল্পে অংশগ্রহণ করল না।[২]। তাই চা'বাগিচা স্থাপনে নিয়ে আসা হল মুন্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও ও আরও অনেক ছোটনাগপুরী আদিবাসী। আবার মধ্যপ্রদেশ, রেওয়া (দেশীয় রাজ্য) ওড়িশা এমন কি পরবর্তীকালে তামিলনাড়ু প্রদেশ থেকেও 'ট্রাইবাল'দের নিয়ে আসা হয়েছিল।[৩] কিছু নেপালী শ্রমিকদেরও চা'শিল্পে নিয়ে আসা হয়েছিল। ঊপনিবেশিক আমলে নেপালি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল শতকরা সাতভাগ। এরা অধিকাংশ ছিল পূর্ব-নেপালিয়।[৪]

১৮৮১ সাল অবধি শ্রমিকরা পদব্রজে এ অঞ্চলে চা'চাষে এসেছে। রাস্তায় পর্যাপ্ত যত্নের অভাবে হাজারে হাজারে শ্রমিক মারা গেছে। পথে যেসব পুলিশ থানা ছিল সেখানে শ্রমিকদের হাজিরা দেখাতে হয়েছে। শ্রমিকরা যাতে পালাতে না পারে তার জন্য ছিল 'মাউন্টেট পুলিশ[৫]' যারা চা'করের সর্বদা স্বার্থ দেখত। সর্দারী প্রথায় শ্রমিক নিয়োগ হত।[৬] তরাই-এ উপনিবেশিক আমলে নানা কারণে শ্রমিক অভাব লেগেই থাকত। শ্রমিক নিয়োগের প্রারম্ভিক কথা ছেড়ে এবারে আবার শিলিগুড়ি মহকুমার চা'শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তরাইতে সবই ইউরোপীয় চা'বাগিচা। ১৮৬২ সালে মাটিগাড়া চা'বাগানও গড়ে ওঠে।[৭] ১৮৬৫ সালে গড়ে উঠল হাঁসখোয়া চা'বাগিচা, যেটি মিঃ আর্থার কুরির শ্রমে, নিষ্ঠায় ও উদ্যোগে গড়ে ওঠে।[৮] ১৮৬৬ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে প্রায় ২২টি চা'বাগিচা ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন কোম্পানীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। এ সময়ে চা'বাগিচা একর প্রতি লীজ মূল্য ছিল ৬ আনা।[৯] দার্জিলিং পর্বতের মত এ মহকুমার চা'বাগিচার ইতিহাস, সঠিক সন, তারিখ তথ্যের অভাবে খুব একটা পাওয়া যায় না। যেসব কারণে এ তথ্য পাওয়া যায় না তা হল — প্রথম ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ — এই সময়টাতে বেশিরভাগ চা'বাগান ত্রিশ বা চল্লিশ একরের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তারপর সেগুলো বিক্রি করা হয়েছিল কোন একটি কোম্পানীকে। ফলে সেগুলো 'অ্যামালগ্যামেটেড' হয়ে ১৫০ থেকে ২০০ একরের চা'বাগিচায় রূপান্তরিত হয়।[১০] এরকম হাত বদল এ অঞ্চলে অহরহ ঘটেছে। একারণে মালিকানা বদলের ফলে তথ্য সংরক্ষিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর হাতবদল বেশি হয়েছে। এমন কি বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকেও মালিকানার পরিবর্তন ঘটেছিল। হাতবদল হবার পর নতুন চা'কর পুরানো তথ্য যত্নকরে রাখেনি। যাইহোক ১৮৬২ থেকে ১৮৬৬ সাল অবধি[১১] যেসব চা'বাগান এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে তা হল (১) নিউ চামটা, (২) মাটিগাড়া, (৩) হাঁসখোওয়া, (৪) মরাপুর, (৫) পঞ্চনই, পরে নাম দাগাপুর হয়। (৬) শিমূলবাড়ী, (৭) মানঝা, (৮) লোহাগড়, (৯) বেলগাছি, (১০) পানিঘাটা, (১১) পাহাড়গুমিয়া, (১২) সিঙ্গিঝোরা, (১৩) সন্ন্যাসীথান, (১৪) ত্রিহানা, (১৫) অড টি এস্টেট, (১৬) মারিয়নবাড়ি ও অন্যান্য। এ বাগিচার অধিকাংশই ১৮৬৬ সনে প্রথম চা'বাগিচার জন্য খাস জমি লীজ ভিত্তিতে পায়। এছাড়া ১৮৬৬ সালে আদলপুর, বড় চেঙ্গা, ছোট চেঙ্গা, এম.এম. তরাই, মেচী, সাহাপুর, কলাবাড়ি, সাতভাইয়া, ডুমডুমা ইত্যাদি বাগিচাও চা'চাষে জমি পেয়ে যায়। এখন এসব বাগানের নাম পাওয়া যায় না। কারণ এর অধিকাংশই 'অ্যামালগামেটেড' হয়ে নতুন নামকরণ করেছে।[১২] শিলিগুড়ি মহকুমায় সমস্ত লীজ প্রথমে ব্যক্তিগত অর্থাৎ বৃটিশ কোন একজনের নামে গ্রান্ট করা হতো।[১৩]কিন্তু পরে এই ব্যক্তিগত 'গ্রান্ট' বা কোম্পানীগুলো 'অ্যামালগ্যামেটেড' হয়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীকে বিক্রি করে দিত। অনেকেই বলেন এমনকী ও'ম্যালিও[১৪] বলেন যে, তরাইতে অধিকাংশ বাগিচাই ছিল ভারতীয়দের। কথাটি ঠিক নয়। এ অঞ্চলে খাস জমি ও উত্তর তরাই যা কার্শিয়াং পর্বতের ঠিক নীচে,

সেগুলো সবই ছিল ইউরোপীদের হাতে। এমন কী দক্ষিণ তরাইয়ে হাঁসখোওয়া, গয়াগঙ্গা, টাইপু, মধ্য তরাইয়ের পাহাড়গুমিয়া, ত্রিহানা সহ অনেক চা'বাগিচাই ছিল ইউরোপীয়দের হাতে।[১৫] ভারতীয়রা চা'বাগিচা স্থাপন করে অনেক পরে। বিংশ শতাব্দীর দু-এর দশকে অথবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে। এ অঞ্চলে খাস জমি বৃটিশ চা'করদের দিয়ে, আর চা'চাযের জমি ছিল না। সুতরাং দরকারে পরবর্তীকালে বৃটিশরা জোতজমি কিনে খাস জমির সঙ্গে মিলিয়ে চা'চাযের একর জমি বাড়িয়েছে।[১৬]

অপরদিকে ভারতীয়রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জোতজমি কিনে সে জমিতে চা'চাষ শুরু করে। এভাবে বহু চাযের জমি তরাইতে বিংশ শতাব্দীতে চা'চাযে চলে যায়।[১৭] জোতজমি চা'চাযে রূপান্তরিত হলে এ মহকুমার বিভিন্ন জনজাতি প্রতিবাদ করে। তাছাড়া, চা'চাযের জন্য বিশাল অরণ্য শেষ হওয়াতে এ অঞ্চলে বৃষ্টি কমে আসে। ফলে শিলিগুড়ি মহকুমার জনজাতিরা গত শতাব্দীর তিনের দশকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে।[১৮] উপনিবেশিক আমলে এ প্রতিবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যাইহোক ঊনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ চা'বাগিচা ইউরোপীয় হলেও বেশ কয়েকটি চা'বাগিচা ভারতীয়রা করতে পেরেছিল। শিলিগুড়ি মহকুমায় জলপাইগুড়ির হিন্দু, মুসলমান ও দু'একজন রাজবংশী জোতদার ঊপনিবেশিক আমলে বহু চা'বাগান স্থাপন ও ক্রয় করে।[১৯] শিলিগুড়ি মহকুমায় ইংরেজ চা'কররা বিভিন্ন কারণে চা'চাষ করে সে রকম আনন্দ পেলেন না। ফলে ওরা ১৮৭৪ সালে ডুয়ার্সে চা'বাগিচা স্থাপনে উদ্যোগী হলেন।[২০] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ অঞ্চলে চা'বাগান তৈরী হবার প্রায় ৭৫ বছর পর ছোট্ট শিলিগুড়ি শহর গড়ে ওঠে। কাগজে কলমে অবশ্য ১৯০৭ সালে শিলিগুড়ি গড়ে ওঠে, যখন এর লোকসংখ্যা ৭৮৪। চা'বাগান গড়ে উঠলে এ অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা যেমন মেচ, থারু, ধীমাল, রাজবংশী জনজাতি মহাসংকটে পরে। তবু এরা চা'চাযে আসেনি বরং পূর্ব-নেপাল ও অন্যান্য স্থানে পালিয়ে যায়।[২১] লাভবান হয় শুধু রাজবংশী জোতদাররা।

যাইহোক এবারে আবার আসা যাক শ্রমিক নিয়োগ প্রসঙ্গে। সাঁওতালদের চা'শিল্পে নিয়োগ করা হয়েছিল, কারণ এরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী। অসম্ভব গরম ও শীতে এরা অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারত।[২২]

অন্যদিকে ছোটনাগপুরের ওঁরাও, মুন্ডা ও অন্যান্যরাও ছিল কঠোর পরিশ্রমী। পঞ্চানন সাহা, এসব শ্রমিক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন,[২৩] "The hill coolies (Chotanagpur coolies) were particiularly suitable for their expeience of working in the jungle lands." শিলিগুড়ি মহকুমা তখন জঙ্গল বনভূমিময়। এসব উপেক্ষা করে, এ অঞ্চলে চা'বাগান ওরা স্থাপন করল। অসমের মত এ মহকুমার চা'শ্রমিকরা চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করতনা। এ মহকুমায় শ্রমিকরা স্বাধীন ছিল ঠিকই, কিন্তু এখানকার চা'কররা যখনই অসুবিধায় পড়েছে, তখনই তারা অসমের মত শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের আইন, চুক্তি সবই ব্যবহার করেছে। আর এ অঞ্চলের শ্রমিকদের ধারণা ছিল যে তারা চুক্তিবদ্ধ ও পরাধীন।[২৪] এ অঞ্চলে 'সর্দারী সিস্টেম' ছাড়াও স্থানীয় 'এজেন্ট' ও 'প্রাইভেট'

এজেন্সির মাধ্যমেও শ্রমিক নিয়োজিত হত। শ্রমিক সংগ্রহে ছল, চাতুরী ও প্রলোভনের বিরাট ভূমিকা ছিল। হঠাৎ প্রয়োজনে সর্দারের সঙ্গে শ্রমিক সংগ্রহে বাগানের সহকারী ম্যানেজার ও কেরানিরাও ছোটনাগপুর যেতেন।[২৫] আরকাঠিরাও নানাভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করে প্রচুর লাভ করত। এদের দৌরাত্ম ইংরেজরাও বন্ধ করতে পারেনি। যাইহোক, স্থানীয় ক্ষেত্রেও অনৈতিকভাবে শ্রমিক সংগৃহীত হত। যখন তখন শ্রমিক চুরি করা হত। শ্রমিকরাও বাগান থেকে পালিয়ে যেত ও প্রলোভনে অন্য বাগানে যোগ দিত। সব বাগানই স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগে অনৈতিকতার সাহায্য নিত।[২৬] তবু ঊপনিবেশিক যুগে শুধুই শ্রমিক অভাব। ১৯২৭ সালে 'Tea District Labour Association' নামক সংস্থার মাধ্যমে শ্রমিক সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়।[২৭] অবশ্য এ ব্যবস্থার সুযোগ শুধু ইংরেজ চা'কররাই পেয়েছে। এ অঞ্চলের বাগানগুলো ছ'মাসের চুক্তিতেও শ্রমিক আনত। 'টি.ডি.এল.-এ' এসব শ্রমিকের সংগ্রহের দায়িত্ব নিত। ১৯২৯ সালে অবশ্য চা'কর সংস্থাগুলো এ ধরণের শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করতে চাইলেও, পারেনি। 'T.D.L.A.' 1959 সাল অবধি ছিল।[২৮] এরপরে এর অবলুপ্তি ঘটে। শ্রমিক নিয়োগে কখনই মানবিক দিকটা দেখা হত না। ট্রেনে গরু, ভেড়ার মত এদের নিয়ে আসা হত। চা'শ্রমিক সংগ্রহে খৃষ্টান চার্চগুলো বিদেশী বাগানগুলোকে নানাভাবে সাহায্য করত। শিলিগুড়ি অঞ্চলে হাটের দিনে চা'বাগান বন্ধ থাকত। হাটগুলো শ্রমিক চুরির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আবার উপনিবেশিক আমলে শিলিগুড়ি স্টেশন থেকেও শ্রমিক চুরি হত।[২৯]

মনে রাখা দরকার শুধুমাত্র প্রলোভনে বা সর্দার ও আড়কাঠিদের দক্ষতার জন্য শ্রমিক পাওয়া যেত, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। তখন ছোটনাগপুর সহ আদিবাসি অধ্যুসিত অঞ্চলে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে আদিবাসিরা ঐ অঞ্চলে থাকতে পারছিল না। ইংরেজ প্রভু ও দিকুদের (অ-আদিবাসী) যোগসাজসে নিজ ভূমি থেকে ভূমিচ্যুত হয়ে ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতালরা তখন দিশেহারা। এ অবস্থা হয়েছিল বলেই ওদের চা'বাগানে অমানবিকভাবে আনা সম্ভব হয়েছিল।[৩০] ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণায় ওদের করুন অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া এখানে বিস্তারিত লেখার সুযোগ নেই। তাই সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলা হচ্ছে।

আদিবাসী জীবনে সঙ্কট ১৬২৮ সালে শুরু হয়েছিল।[৩২] এরপরেই ওরা বহিরাগতদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে লাগল। সহজ সরল মুন্ডা ও ওঁরাও নিজভূমিতে পরবাসী হল। ১৭৬৫ সালে এ অঞ্চলে ইংরেজ এসে ওদের আরও সর্বনাশ করল। এ সময়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিহারী, বাঙালী, ভোজপুরী, শিখ ও মুসলিম ধর্মের বহু মানুষ ইংরেজ প্রশ্রয়ে আদিবাসীদের জমি থেকে উৎখাত করে চাষাবাদ ও বসতি বিস্তার শুরু করল।[৩৯] দিকুরা ছোটনাগপুরে এসেই জমির দলিল, দস্তাবেজ তৈরী করে নেয়। প্রকৃত জমির মালিক মুন্ডা, ওঁরাও তা করতে পারেনি। কারণ ওদের সমাজে তা দরকার হত না। অসহায় অবস্থায় ওরা কোর্ট কাছারিতে গিয়েও সুবিচার পায়নি। ইংরেজ বিচারক ওদের ভাষা বোঝেনি। ওদের জমির মালিকানার বৈশিষ্টও বোঝেনি বা বুঝতে

চায়নি।[৩৩] মহাজনী শোষণ, অমানবিক অন্যান্য শোষণে ওরা 'Bond Servant'-এ পরিণত হয়েছে। সাঁওতালরাও এর থেকে রেহাই পায়নি। ইংরেজ প্রভুর দল ওদের বনসম্পদও কেড়ে নিয়েছে। সর্বশেষে খৃষ্টান হলে ওদের সব সঙ্কট কেটে যাবে এমন আশ্বাস দিয়ে ওদের হাজারে হাজারে খৃষ্টান করেছে ইউরোপীয় পাদ্রীর দল। কিন্তু এখানেও ওরা প্রবঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং দিশেহারা হয়ে ওরা চা'বাগানে এসেছে।

শিলিগুড়ি অঞ্চলে শতকরা সাতভাগ ছিল নেপালি শ্রমিক। এ অঞ্চলে কেন নেপালিরা এল তারও বহুবিধ কারণ ছিল। পূর্ব নেপালের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ১৭৭২ সালে পাল্টে যায়। পৃথ্বিনারায়ণ সা, পূর্ব নেপালকে সুদৃঢ় করতে উচ্চবর্ণের নেপালিদের নিয়ে আসেন এবং এদের প্রশাসনিক ও নানা উচ্চপদে নিয়োগ করেন। ক্রমে হিন্দু গোর্খাদের আইনকানুন, রীতিনীতি ও অন্যান্য প্রথা পূর্ব নেপালে সম্প্রসারিত হল এবং এ অঞ্চলে রাই, লিম্বু, তামাঙ, সুনোয়ার, দানুয়ারসদের জমি থেকে উৎখাত করে উচ্চবর্গীয় নেপালিদের জমি, জমা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হল।[৩৪] এ অঞ্চলের জমি ব্যবস্থার নাম ছিল 'কিপত ব্যবস্থা'। মহেশচন্দ্র রেগমি এ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন,[৩৫] "Under the 'Kipat System', land belong to Local Ethnic Community under customary law, not to the state under statutory law." কিন্তু এখানে 'রাইকর ভূমি ব্যবস্থা' বলবৎ করা হল। এ সম্পর্কে রেগমি বলেছেন[৩৫] "In Nepal, land was traditionally been considered to be the proporty of the state. This system of state land lordism is known as Raikar". নেপালে এ ধরণের জমি ব্যবস্থায় জমির মালিক কোন ব্যক্তি বিশেষও হতে পারতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্বে নেপালে শুধু 'রাইকর ভূমি ব্যবস্থা' রাখা হল। ফলে রাই, লিম্বু, তামাঙ ও অন্যান্যদের জমি থেকে উৎখাত করা হল। এদের জমি উচ্চবর্গের নেপালিরা দখল করে নিলেন, এবং যৌথ মালিকানার জায়গায় ব্যক্তিগত মালিকানা এল। স্বভাবতই সরকারি সহায়তায় ব্রাহ্মণ, ছেত্রী, মগররা জমির মালিক হল। শুরু হল পূর্ব নেপালে মহাজনী শোষণ। রাই, লিম্বু ও অন্যান্য পূর্ব নেপালের জনজাতি দাসে পরিণত হয়। পূর্ব নেপালিদের জমির কোন দলিল, দস্তাবেজ ছিল না ফলে ওরা অসুবিধায় পড়ে। কাঠমুন্ডু সরকার বারবার বলা সত্ত্বেও কোন কাগজপত্র ওদের হাতে দেয়নি।[৩৬ক] ফলে এ অঞ্চলের জমি যখন অসৎ পথে উচ্চবর্ণের হাতে গেছে তখন কোর্ট, কাছারি, বিচারক, সরকার কেউ রাই, লিম্বুদের পাশে দাঁড়ায়নি। ফলে মধ্য ও পশ্চিম নেপাল অধ্যুষিত অঞ্চলের উচ্চবর্গের চালাক চতুর মানুষ দলে দলে পূর্ব নেপালে এসে জমি দখল করে, তাই caplan[৩৭] বললেন, "Pressure on land was the Principal cause of emigration early as the 1890s."

চা শ্রমিক মজুরী ঃ শিলিগুড়ি অঞ্চলের চা শ্রমিক মজুরী চিরকাল কম। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকেই ওরা ঠিক করে চা'শিল্পে সমস্ত শ্রমিক পরিবারকে নিয়োগ করা হবে। ওরা প্রমাণ পেয়েছে যে আদিবাসী মহিলারা

ক্ষিপ্রগতিতে চা'পাতা তুলতে পারে। আর শিশুদের দিয়ে চা'গাছের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিঃশেষ করা যাবে। আবার পরিবার ভিত্তিক নিয়োগ হলে মজুরি কম দিলেও চলবে। কিন্তু মহিলারা ভাল কাজের হলেও দীর্ঘ একশো বছরের অধিক পুরুষের চেয়ে কম মজুরী পেয়েছে।[৩৮] শিশু শ্রমিকদের মজুরী ছিল আরও কম।

উপনিবেশিক যুগে নানা অছিলায় শ্রমিক মজুরী কেটে নেওয়া হত। মজুরী পাবার পর একপয়সা করে সরদারদের কমিশন কেটে নেওয়া হত। শ্রমিকরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত হওয়াতে মজুরী কম দিলেও ওরা বুঝতে পারত না। পাতা তোলার মরশুমে 'ঠিকা'র চেয়ে বেশী পাতা তুললে ওদের বেশী পয়সা দেওয়া হত। একথা যেমন সত্য তেমনি, পাতার ওজন কম দেখিয়ে ওদের ঠকানো হত, একথাও সত্য। কাজ বন্ধ থাকলে, ও ছুটির দিনে কোন মজুরি দেওয়া হতনা। অনেক সময়ই বেগার খাটতে হত।[৩৯]

কিন্তু চা'শিল্পের জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি চা'কররা সব সময়েই বলে শ্রমিকদের মাসিক আয় যথেষ্ট। কারণ ওদের বিনা পয়সায় থাকার ঘর দেওয়া হয়, জ্বালানি দেওয়া হয়। সামান্য হলেও 'কোয়ার্টার' সংলগ্ন জমিতে ওরা সবজি ফলায়, গরু, মুরগী, শুয়োর প্রতিপালন করে ওরা আয় করে। ওদের রেশন ও বিনাপয়সায় চিকিৎসা করা হয়। সন্তান প্রসব করলে ওদের বকসিস দেওয়া হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রায় ৫৫ বছর ওদের মজুরি একপয়সাও বাড়েনি। বরং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির দরুন ওদের প্রকৃত আয় কমেছে।[৪০] অর্দ্ধশতাব্দীর বেশীর ভাগ সময়ে ওদের পুরুষের মজুরী ছিল দিন প্রতি ৪ আনা। মহিলা শ্রমিক ৩ আনা ও শিশু ৬ পয়সা। চা'শিল্পে মন্দা এলে ওদের উপরিউক্ত মজুরীও দেওয়া হত না। যে মজুরী ১৮৯১ সনে ঠিক হয় তা ১৯৪৭ সাল অবধি চলেছে। শিলিগুড়ি অঞ্চলে ১৮৭১ সালে যে মজুরী দেওয়া হত তার কোন পরিবর্তন ছিল না।[৪১] তাই হান্টার বলেছেন, [৪২] Upto 1871, Wages in Terai had not muchaltered from what they were informer days. আবার মিঃ হার ফারটাঙ্গুলার তিনি ১৯২৭ সালে ভারত ভ্রমণে এসে[৪৩] বলেছিলেন, The wages of coolies on the Indian Plantation have not changed for the last seventy years." একথা বলা বাহুল্য চা'শিল্পে শ্রমিক মজুরী ইউনিফর্ম ছিল না, আর স্বাধীনতার পরও চা'শ্রমিকদের মজুরি কম ছিল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল অবধি শুধু অবৈজ্ঞানিক প্রথায় ডি.এ. বাড়ানো হয়। ১৯৫৫ সালে ওদের মজুরি ছিল পুরুষ ১টাকা ১১ আনা এবং মহিলা ১টাকা ৯ আনা ও শিশু ১৫ আনা। এ মজুরি ১৯৫৮ সাল অবধি একই ছিল।[৪৪] ১লা এপ্রিল ১৯৬৬ সালে যে নতুন মজুরির কথা বলা হল, ভৌমিক সে সম্পর্কে বললেন,[৪৫] "The wage of 1966 was by no means a need based wage." আবার ১৯৭৫ সাল অবধি পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের

মজুরি এক নয়।

শ্রমিক অবস্থা ঃ ১৯৪৬ সালে রেগে কমিটির রিপোর্টে[৪৬] এ অঞ্চলের কিছুটা শ্রমিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি মহকুমা মনুষ্য বসতির অনুপযুক্ত ছিল। শুধুই সেখানে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ব্ল্যাক ওয়াটার ফিবার'। এ পরিবেশে শ্রমিক অবস্থা কী ছিল তা সহজেই অনুমেয়। চিকিৎসা কিছুই ছিল না। ম্যানেজার অনেক সময়ে ডাক্তারের কাজ করতেন। অর্থাৎ জ্বর এলেই 'কুইনাইন' খাইয়ে দেওয়া হত। কাজের পরিবেশও খারাপ ছিল। কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টি, ড্যাম্প ও ঠান্ডা। শ্রমিকদের কোন 'Protection' ছিল না।[৪৭]

শ্রমিকদের বাসস্থানও ছিল অস্বাস্থ্যকর। ঘিঞ্জি-একই কক্ষে ছাগল, গরু, মুরগি নিয়ে শ্রমিকরা নিদ্রায় যেত। ঘরের গা দিয়েছিল অজস্র নর্দমা। কর্মক্ষেত্রেও কথাবার্তা বলা বা বিশ্রাম নেওয়ার কোন আবকাশ ছিল না। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে অবধি এক নাগাড়ে কাজ। দেরি হলে মজুরি কাটা হত। কারণে অকারণে চাবুক চালিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হত। শ্রমিকদের বাড়ীতে অতিথি আনার অধিকার ছিল না।[৪৮] হাটের দিন ছাড়া ওরা বাগানের বাইরেও যেতে পারত না। শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা ছিল না। ১২ঘন্টা কাজ করানো এবং তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে চরম শাস্তি দেওয়া হত। বেয়াড়া শ্রমিকদের পরিবার সহ রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের করে গরুরগাড়ীতে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হত। এ প্রথাকে বলা হত 'হপ্তাবাহার'।[৪৯] প্রাপ্ত একটি রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, চা বাগানের শুরু থেকে ১৯১১ সাল অবধি চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না।[৫০] কলেরা, আমাশয়, জ্বর, আলসার, পায়ের নীচে ঘা ও ব্যাথাও ছিল। অন্যান্য ঘাতক রোগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। আন্দাজে চিকিৎসা করতেন ম্যানেজার ও কেরানীবাবুরা। কলেরার চিকিৎসা হত না।[৫১] এ অঞ্চলে ১৮৯২, ১৯০৬, ১৯১১ সালে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দেয় ও প্রচুর শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। এছাড়া অন্যান্য রোগেও শ্রমিক মারা যেত। ১৯৪০ সালে বসন্ত ও আমাশয়ে 'সন্ন্যাসী থান' টি স্টেটে এভাবে এত শ্রমিক মারা যায় যে সে বাগানের চা উৎপাদন কমে যায়।[৫২] শিলিগুড়ি মহকুমায় উপনিবেশিক যুগে জন্মের থেকে মৃত্যুর হার বেশী ছিল। রেগে কমিটি (পৃ.৯০) থেকে জানা যায় যে ১৯৪২, ৪৩ ও ৪৪ সালে জন্মহার ছিল ২৭.২১, ২৯.৯৪ ও ২০.৭১, সেখানে মৃত্যুহার ছিল ৩০.২১, ৩৬.৩০ ও ৩৭.৯৪। এছাড়া শ্রমিক আবাসে আগুন লেগে, বিষাক্ত সাপের কামড়ে, বাঘ ও ভাল্লুক, বাইসনের তান্ডবে বহু শ্রমিক মারা যেত। প্রসবকালে ও পরে চিকিৎসার অভাবে বহু মহিলা ও শিশুর মৃত্যু হত। এসব বলে শেষ করা যাবে না। এক কথায় বলা যায়, 'A human way of life was denied to them" চাপাতা তুলতে জোঁকের উৎপাত কিভাবে শ্রমিকরা সহ্য করেছে তা জানা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়।

অন্যদিকে উপনিবেশিক যুগে তরাইতে 'টানা ভগৎ' আন্দোলন হয়[৫৩]। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশ

থেকে ইংরেজদের তাড়ানো। তরাইতে অবশ্য এ আন্দোলনের তীব্রতা ডুয়ার্সের মত ছিল না। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন এ অঞ্চলের চা'শিল্পে হয়নি। বন্ধন ওঁরাও ও প্রয়াত নৃপেন বসু সক্রিয় হয়েছিলেন এই মাত্র।[৫৪] শিলিগুড়ি মহকুমায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয় অনেক দেরিতে। গত শতাব্দীর চারের দশকে সত্যেন মজুমদার, চারু মজুমদার, বীরেন বসু, জঙ্গল সাঁওতাল, অতীন বসু কম্যুনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তরাইয়ের কিছু চা'বাগানে কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেসীরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং সে সময়ে কানু সান্যাল, বীরেন বসু, কান্তি কলিতা, ঈশ্বর টিরকিই ছিলেন কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেসের ট্রেন ইউনিয়ন নেতা। কিরন ভট্টাচার্য চা'বাগান মালিক হলেও কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।[৫৫] ১৯৫৫ সনে তরাইকে বোনাস আন্দোলন হলেও, দার্জিলিঙ ও ডুয়ার্সের মত তা তীব্র ছিল না। এরপর গতানুগতিক মজুরি ও অন্যান্য দাবী নিয়ে আন্দোলন হয়। তবে তরাইতে চা'শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ১৯৬২ সনে কম্যুনিষ্টরা বিভক্ত হয়ে সমগ্র নেতৃত্ববর্গ সিপিআই(এম) ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেয়।[৫৬] ১৯৬৭ সনে নকশাল আন্দোলনে তরাই চা'শ্রমিক স্থায়ী, অস্থায়ী শ্রমিকরা যোগ দেয়। চা'বাগানগুলো ছিল নকশাল নেতাদের আশ্রয়স্থল। দূর দূরান্তে চা'শ্রমিকরা 'আন্ডারগ্রাউন্ড' হলে তাদের খাদ্য সরবরাহ করত চা'শ্রমিক। কোন কোন বাগানে নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে হরতাল হয়। তবে সব বাগানে নকশাল আন্দোলন হয়নি।[৫৭] ঈশ্বর টিরকি ও বীরেন বসু বহু বাগানকে নকশাল আন্দোলনের বাইরে রেখে দিতে পেরেছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১) L.S.S. O'Malley - District Gazetter of Bengal, Darjeeling, Reprint, P-74.
২) Asok Gangopadhay - Banglar Cha Silpa Ebong Sharmik Abastha, Cal, P-18.
৩) Field Survey by the writter in Tarai, in 1985
৪) Ibid.
৫) P.J. Griffith - History of Tea Industry in India. London, 1967, P-39.
৬) Gangopadhay - op.cit. P-59.
৭) O'Malley - op.cit. P-14.
৮) File No. 3/H (Hanskhoya T.E.)
৯) O'Malley op.cit., P-152
১০) Gangopadhyay op.cit., P-18
১১) Ibid. P-19
১২) Ibid.

১৩) Ibid.
১৪) Ibid. P-25
১৫) Ibid. P-20
১৬) File No. 4/M Singhijhora T.E.
১৭) Gangopadhyay op.cit., P-20.
১৮) Ibid.
১৯) Bhoj Narayan T.E. is one of them
২০) Gangopadhyay op.cit., P-23.
২১) Ibid. P-20.
২২) Ibid. P-53.
২৩) Panchanan Saha - Emigration of Indian Labour, Delhi, 1970, P-29.
২৪) Gangopadhyay op.cit., P-58.
২৫) Ibid. P-25.
২৬) Letter No. 1008, dated 27th Jan, 1927. From Secretary to the Board of Revenue of Bengal.
২৭) Gangopadhyay op.cit., P-64.
২৮) Interview with Babulal Biswakarma, Sukna T.E. 1.9.85
২৯) Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal. 1872, pp> 169-172.
৩০) Gangopadhyay op.cit., P-82.
৩১) Hoffman Rev. J. and others, Encyclopedia Mundaria, Vol-IV, 1950, P-1444.
৩২) Gangopadhyay op.cit., P-58.
৩৩) Ibid. P-98
৩৪) Mahesh Ch. Regmi - Land Ownership in Nepal. U.S.A. 1976, P-19
৩৫) Ibid. P.16
৩৬) Regmi.op.cit., P-16.
৩৬ক) Gangopadhyay op.cit., P-102.
৩৭) Lional Caplan, - Land and social change in East Nepal, London, P-6.
৩৮) Female Workers received same Wages in 1976. But some of the gardens paid it in 1980

to 1983.

৩৯) Gangopadhyay op.cit., P-115.

৪০) Ibid, P-116

৪১) Ibid, P-120

৪২) Hunter, Statistical Account of Bengal. Vol. X, Reprinted, P-101

৪৩) Quoted in Chamanlal, The Story of Labour and Capital in India. Vol-2, Lahore, 1932, P-16

৪৪) Gangopadhyay op.cit., P-134.

৪৫) Sharit Bhowmick, Class Formation in the Plantation system, Delhi, 1981, P-90.

৪৬) Gangopadhyay op.cit., P-145.

৪৭) Ibid, P-147.

৪৮) Ibid, P-150.

৪৯) Ibid, P-151.

৫০) Ibid.

৫১) Ibid, P-154.

৫২) Ibid, P-151.

৫৩) Asok Gangopadhay - Banglar Ch Shramik Bidroha O Trade Union Andalon, Cal-2019, P-59.

৫৪) Ibid, P-70.

৫৫) Based on Field Survey and interview with Kanu Sanyal dated Hathighisa. 1.7.1985

৫৬) Gangopadhay, op.cit. P-48.

৫৭) Ibid,2019 P-49.

শিলিগুড়ি মহকুমার হাট

অশেষ কুমার দাস

ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সমস্তরকম আঞ্চলিকতার গন্ডি অতিক্রম করে নিজেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যায়। যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান সহ জীবনধারণের মানোন্নয়নের জন্য যে কোন উৎপাদন মানুষের ঘরের দুয়ারে পৌঁছে যায়। এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যে যেমন ব্যবসা ও মুনাফা থাকে, তেমনই থাকে বিভিন্ন ধরনের মানবিক উপাদান। যা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নানাভাবে সাহায্য করে। মানবতাবোধ যার মূল কথা। এই বাণিজ্যবোধের কাছে মাথা নত করে সমস্ত রকমের কুসংস্কার সহ কূপমুন্ডকতা। যার ফলে সমাজ হয় গতিশীল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ব্যবস্থা মাথা নত করে বাণিজ্যবৃত্তির কাছে। চাহিদা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ বাধ্য হয় জ্ঞানের মাধ্যমে মরুতেও সোনার ফসল ফলাতে। সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়মেই এমন ঘটনা ঘটতে থাকে। সমাজ উন্নয়নের অসম বিকাশ দূর করতে তাই ব্যবসা বাণিজ্যর কোন বিকল্প নেই। বিশ্বের সর্বত্র একই নিয়মে ব্যবসা বাণিজ্য সংগঠিত হয়ে থাকে। হাট বাজার হল যার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

শিলিগুড়ি মহকুমাতেও একই নিয়মে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। ইংরেজ আসার বহু আগেই এই মহকুমাতে নয়টি হাট গড়ে উঠেছিল স্থানীয় জোতদারদের সহযোগিতায়। সেই সময়কার রাজনৈতিক মানচিত্রও ছিল অন্যরকম। এই মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ও মহানন্দা নদীর পূর্ব পারের অঞ্চল বাদ দিয়ে বাদবাকি সমস্তটাই ছিল সিকিমের অধীনে। ধারণা করা হয় যে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে সিকিম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তারা এই অঞ্চলের দখল নেয়। তখন সামগ্রিকভাবে সিকিম রাজের দখল করা ভূমিখন্ডের নাম ছিল পূর্বকোরাং। মহানন্দা নদীর পূর্বদিকের অঞ্চলের পরিচয় ছিল বৈকুন্ঠপুর পরগণা নামে। সে সময় এই অঞ্চলটি ছিল গভীর অরণ্যময়। কোচবিহার রাজত্ব শুরু হওয়ার পর এলাকাটি ঐ রাজ্যভুক্ত হয়। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে জলপাইগুড়ির রায়কতরা বৈকুন্ঠপুরের শাসন ক্ষমতায় আসে। জলপাইগুড়ির প্রথম রায়কত বা রাজা শিষ্যসিংহ বাস করতেন বর্তমান শিলিগুড়ি মৌজার দক্ষিণে, শিলিগুড়ি নামক একটি গ্রামে মহানন্দার তীরে। রাজা হওয়ার পর তিনি তিস্তা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী কোন অঞ্চলে তার রাজধানী স্থাপন করেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা পূর্বমোরাং দখল করে। সেই সময় শিলিগুড়ি মহকুমাতে মোট জোতদারের সংখ্যা ছিল ৫৪৪জন (Compendium) । এই জোতদাররা ছিল অনেকটাই গ্রামের অভিভাবকদের মতন। বছরের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে চাষীরা জোতদারবাড়ি গিয়ে কি পরিমাণ জমি চাষ করবে, তা জানিয়ে দিত। তার ভিত্তিতে জমির খাজনা নির্ধারণ করা হত। সিকিমরাজ এই মহকুমা থেকে বনজাত দ্রব্য সংগ্রহ, ব্যবসা, চাষ আবাদ ও গবাদি পশু

পালনের জন্য খাজনা সংগ্রহ করত। স্থানীয় জোতদার মারফত সেই খাজনা খাপরুল মৌজাতে 'খাপরুল শুল্ক সংগ্রহ' কার্যালয়ে (মৌজা তালিকা ১৯২১-২৪ নং ১৪) জমা করতে হত। সেই অর্থ সিকিম রাজকোষাগারে জমা করা হত। স্বাভাবিক ভাবেই সিকিম রাজ যে অধিক পরিমাণে শুল্ক সংগ্রহ করবার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যতে উৎসাহ দিত তা বলা বাহুল্য মাত্র। মানুষের জীবনধারণের মানও ছিল খুবই সাধারণ। খাবারের তালিকা ছিল সাধারণ। ভাতের সাথে ঝোল মাছ সহ তরকারি। ডাল ছিল মূল্যবান খাবার। মাটির পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হতো। জোতদার বাড়িতে বিকল্প পাত্র ছিল, নিজেরাই নিজেদের কাপড় তৈরি করত। ধারণা করা যায় যে এখানে উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিয়ে ব্যবসার শুরু। সাধারণ মানুষেরা দিনে তিনবার দুধ পান করত। বিছানা বলতে ছিল খড় বিছিয়ে পাটি, সাথে চাদড় ও বালিশ।

সিকিম রাজ এখান থেকে শুল্ক আদায় করেই খুশী ছিল। অন্যান্য প্রতিবেশী রাজারা শিলিগুড়ি মহকুমা থেকে কাঠ, মধু ও মোম সংগ্রহ করত। মহকুমার উদ্বৃত্ত পণ্যকে নষ্ট না করে তা বিপণনেন জন্য মোট ৯টি হাট শুরু হয়েছিল মহকুমার উত্তরাংশে মূলত বালাসন নদীকে কেন্দ্র করে। যেমন পানিঘাটা, মহিষমারী, খাপরুল, গাড়িধুরা, শালবাড়ি। অন্য চারটি ছিল পশ্চিম তরাইয়ে, যেমন মুদীর জঙ্গল, বীর্ণাবাড়ি, কৃষ্ণপুর ও দেবীগঞ্জ। (SASHIBUSAN DUTTA) বালাসন উপত্যাকায় ৫টি হাট স্থাপনের মূল কারণ হলো এই নদীকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের অনেক উচ্চতায় পৌঁছানো যেত। অনুমান করা যেতে পারে যে বালাসন নদীতে পাথরঘাটা ও পানিঘাটা নামে নৌকা ঘাট ছিল। ব্যবসায়ীরা এই নদী পথেই তাদের পণ্য নিয়ে হাটে আসত। আবার পাহাড় থেকে (মূলত সিকিম) ক্রেতারা তাদের খচ্চর, ঘোড়া বা গাধা নিয়ে এই হাটগুলোতে আসত। তাদের ক্রয়ের তালিকায় প্রধান দ্রব্য ছিল কাপড়, মাংস সহ বিভিন্ন ধরনের মশলা। পার্বত্য রাষ্ট্রে কাপড় ছিল তখন খুবই মূল্যবান। কারণ পাহাড়ের মানুষ কাপড় বুনতে জানতো না। এ ব্যাপারে ভূটান হলো সবচেয়ে বড় উদাহারণ (DHE SUNDERS)।

এক সময় উপহিমালয়ের এই অঞ্চলটি বিখ্যাত ছিল তুলা উৎপাদনের জন্য। অরণ্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে ছিল শিমূল তুলার গাছ। কোন কোন জনগোষ্ঠী সেই তুলা গাছের চারপাশ দিয়ে কলাই চাষ করত। যার ফলে কোন গাছের তুলা কে পাবে তা জানতে অসুবিধা হত না। আর কলাই শুকিয়ে পাউডার করা হতো এবং যে কোন ঝোলে ব্যবহার হত। আর তুলা দিয়ে তৈরী হতো নানা ধরণের কাপড়। ভূমি পুত্ররা এ ব্যাপারে দক্ষ ছিল। উদ্বৃত্ত বস্ত্র কিনে নিতো প্রতিবেশী সিকিম ও ভূটানের ব্যবসায়ীরা। হাপরুল, গাড়িধূরা, পানিঘাটা, কৃষ্ণপুর ও শালবাড়ির হাট বিখ্যাত ছিল কাপড়ের জন্য। সেই সাথে মহিষমারী মৌজার (মৌজা নং ৩, শিলিগুড়ি থানা ১৯৫৪-৬৬) ভৈষমারীর হাট বিখ্যাত ছিল মাংস উৎপাদনের জন্য। এই হাটে মহিষ, পাঠা ও খাসির মাংস বিক্রী হতো। খাপরুল কথাটি এসেছে খাপড়া থেকে। যার অর্থ হলো যেখানে 'শক্ত করে বাঁধা' হয়। কি বাঁধা হতো এই প্রশ্ন থেকে যায়! অরণ্য বেষ্টিত তরাইয়ে পাহাড়ের ব্যবসায়ীরা আসত ঘোড়া, গাধা বা খচ্চর নিয়ে। তারা হয়ত প্রাণীগুলোকে শক্ত করে বেঁধে রাখত বা

কাপড় কিনে শক্ত করে বেঁধে পাহাড়ে উঠত। আর একটি মত হলো খাপড়া অর্থে ছোট ছোট ঘর। ১৯২০-২১ এর মৌজা তালিকা অনুযায়ী খাপরুল মৌজাতে ১২টি জোত ছিল। প্রতিটি জোতই ছিল স্বমহিমায় উজ্জ্বল। যে কারণে খাপড়া বলা হয়। এই খাপড়া থেকেই খাপরুল কথাটি এসেছে বলে অনুমান করা হয়। জোতদার কর্তৃক স্থাপিত এই হাট গুলোতে ব্যবসা করবার জন্য ব্যবসায়ীদের কোন অর্থ দিতে হতো না এবং হাটগুলোর আয়তন জোতদাররাই ঠিক করে দিত। আয়তনের দিক দিয়ে খাপরুল ১৪.৬৫ একর এবং বীর্ণবাড়ি ৯.৮২ একর ছিল। তুলনায় অন্য হাটগুলো ছিল খুবই ছোট। এই নয়টি হাট সপ্তাহে মোট ১৪ বার বসত। বীর্ণাবাড়ির হাটে বিহার ও নেপাল থেকে ব্যবসায়ীরা আসত। বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন এই হাট বসত। দেবগঞ্জ, মুদির হাট, কৃষ্ণপুর ও বীর্ণাবাড়িতে বহু দুরদূরান্ত থেকে মানুষ আসত গরুর গাড়িতে। এই চারটি হাট সপ্তাহে মোট সাতবার বসত। মেচি নদীর উপত্যকায় বীর্ণাবাড়ি হাট ছিল সবচেয়ে বড়। সেই সময়কার শিলিগুড়ি মহকুমা পূর্বদিকের হাওয়াতে ভীষণভাবে জর্জরিত ছিল। বছরের প্রায় বারো মাসই এই হাওয়া বয়ে যেত এবং নানারকম ব্যাধি বাসা বাঁধত মানুষের শরীরে। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ীরা মুনাফার কারণেই এই হাটগুলি সম্পর্কে আগ্রহী ছিল। তবুও সাধারণ মানুষ এই হাটে আসত বিপণনের জন্য। আর একটা কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই সাথে গ্রহণ করত সমগ্র বিশ্বের খবর। সর্বোপরি এক গোষ্ঠীর সাথে আর এক গোষ্ঠীর সখ্য গড়ে উঠত।

১৮৫০ সালে ইংরেজরা বর্তমান মহকুমাকে তাদের দখলে নেয়। প্রথমেই তারা নজর দেয় ভূমি ব্যবস্থার দিকে। এ জন্যে তারা কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে 'চৌধুরী' পদাধিকারী নামে কিছু মানুষকে নিয়োগ করে। এই চৌধুরীরা খাজনা আদায় থেকে আইনি ব্যবস্থার দেখভাল করত। সেই সাথে বন কেটে চাষ আবাদ করলে প্রথম পাঁচ বছর তাদের কোন খাজনা দিতে হতো না। বেতন হিসাবে তারা পেত আদায় করা খাজনার দশ শতাংশ। ইংরেজদের চোখে তখন সবুজ সোনার স্বপ্ন। যার ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকে। এর ফলে ১৮৬৪ সালে এই মহকুমায় প্রথম 'চামটা' চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। এছ চা বাগানে কাজ করার জন্য মজদুর হিসাবে আনা হয় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক নৃগোষ্ঠীর মানুষদের। যার ফলে মানুষের জীবন ধারণের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রয়োজন হয় আরো হাট বাজারের। ১৮৭৮ সালে শিলিগুড়িতে প্রথম রেল আসে। ফলে কলকাতা শিলিগুড়ির দূরত্ব যেন এক ঝটকায় কমে যায়। ১৮৬৬ সালে দার্জিলিং জেলা ঘোষণা করে প্রথমে তরাই বা শিলিগুড়ি মহকুমা সৃষ্টি হয়। বর্তমান হাঁসখোয়া চা বাগান বা দেবীগঞ্জ ছিল তার সদর দপ্তর। পরবর্তীতে তা শিলিগুড়ি মৌজাতে স্থানান্তরিত হয়। রেলপথ নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই শিলিগুড়ি যেন মহানগরের লক্ষ্যে ডানা মেলে দেয়।

চা, কাঠ, পর্যটন ও পরিবহনকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি মহকুমা সমগ্রা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। জেলার পার্বত্য অঞ্চল সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ফলে এবার সরকারী উদ্যোগে ১৮৮০ সালে গড়ে ওঠে ১০টি হাট। এই হাটগুলি হলো মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি,

বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, বান্দরঝুলি, বাতাসী, অধিকারী, নক্সালবাড়ী, আমবাড়ি। এই দশটি হাট সপ্তাহে মোট কুড়িবার বসত। অর্থাৎ প্রতিটি হাটই সপ্তাহে দু'দিন হতো। আয়তনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বাড়ছিল অধিকারীর হাট এবং ছোট ছিল বান্দরঝুলির হাট। অধিকারী ছিল খড়িবাড়ি থানার ময়নাগুড়ি মৌজাতে (মৌজা নং ২৯/১৯২১-১৯২৪) এবং বান্দরঝুলির অবস্থানও একই থানার ফুলবাড়ি মৌজাতে (মৌজা নং ১৩/১৯২১-১৯২৪)। সরকারী উদ্যোগে তৈরী এই হাটগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল মাটিগাড়া ও নক্সালবাড়ির হাট। যেখানে বিহার ও দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা আসত খেলনা রেলগাড়ি করে। উল্লেখ্য সে সময় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের একটি শাখা বিহারের কিষাণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দুই স্থানে হাটের দিন বিশেষ ট্রেন চালানো হত। শিলিগুড়ি হাটের সামনে একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল। যাতে প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে আসা মানুষরা বিশ্রাম নিতে পারে। মূলত গরীব মানুষেরা সেখানে বিশ্রাম নিত। (SASI BHUSAN DUTTA।

১৯০১ সালে শিলিগুড়ি মৌজার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৮৪জন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজরা যে নতুন ১০টি হাট শুরু করে, তার মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে বড় ছিল শিলিগুড়ি। যার আয়তন ছিল ৬২.৭২ একর। দুরদর্শী ইংরেজরা হয়ত শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এমনটা করেছিলেন। কিন্তু তারপরের স্থান ছিল মাটিগাড়া হাটের। ১৯৯৮ সালে এর আয়তন ছিল ৫৭.৮৮ একর। ১৯২১-২৪ সালে প্রকাশিত মৌজা তালিকাতে মাটিগাড়ার আয়তন হয় ৭১.১২ একর। এবং ১৯৫৬-৬৬ সালে প্রকাশিত মৌজা তালিকাতে মাটিগাড়ার আয়তন হয় ৭১.১২৫০ একর। অর্থাৎ হাটের জনপ্রিয়তাই হয়ত কলেবর বৃদ্ধির সহায়ক হয়। মাটিগাড়া কথাটির অর্থ হল যেখানে মাটিতে গেড়ে দেওয়া বা পুতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই অঞ্চলটি ছিল পাথুরঘাটা পরগণায় মৃত গবাদি পশুর কবরখানা। এর পাশেই ছিল 'তোম্বা' নামক মৌজাটি। শিলিগুড়ি মহকুমার মৌজা নামের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্থানীয় ভূমিপুত্র সংস্কৃতির ছাপ। কিন্তু 'তোম্বা' শব্দটি এসেছে লেপচা শব্দ ভান্ডার থেকে। আসলে তোম্বা হল তাদের একটি প্রিয় পানীয়। তাই ধারণা করা যায় যে ইংরেজ-নেপাল যুদ্ধের পর বিদেশী বন্দীদের তোম্বা মৌজাতে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং তাদের তৈরী পানীয় পান করে স্থানীয় মানুষ বুঁদ হয়ে থাকত। সেই মানুষদের সম্পর্কে ইতিহাস কোন প্রমাণ না রাখলেও ধারণা করা যেতে পারে যে তারা স্থানীয় জোতদারদের ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। যে কারণে তরাইয়ের প্রবীণ নাগরিককে বলতে শোনা যায় যে মাটিগাড়া হাটে মানুষ ও বিক্রী হত। এই কথার সত্যতা সম্পর্কে ইতিহাস নীরব থাকলেও গ্রাম নামের ইতিহাস কিন্তু তার সত্যতা আজও বহন করে চলেছে। হয়ত তাই 'মাটিগাড়া হাট' মৌজাটি স্থাপিত হয়

অপরদিকে নকশালবাড়ি শব্দটির অর্থ হল নকের মতন শাল গাছ। ইংরেজ ভাষ্যকার LSS O'MALLEY বলেন SMALL HUNTING GROOVES. অর্থাৎ একটি ছোট অরণ্যে খরগোস সহ ছোট ছোট প্রাণী শিকার করা হত। পাশেই ছিল উত্তম চাঁদ, টুকুবিয়ার মতন বড় বড় অরণ্য ভূমি। হয়ত সে কারণেই সাহেবরা মানুষের চাহিদা মেটাতে এখানে অরণ্য ধ্বংস করে হাট বসান। মাটিগাড়া ও নক্সালবাড়িতে বিহার নেপাল সহ সুজাপুর পরগণা থেকে

মানুষ জন আসত। টয় ট্রেন সহ গরুরগাড়ি ছিল এই হাটে আসার অন্যতম পরিবহন। মুরগী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে হাট জমত। ধান পাট সহ গবাদি পশু ছিল এখানকার প্রধান বিক্রয়ের বস্তু। মানুষ পণ্য ক্রয় করে সন্ধ্যাবেলা গরুরগাড়িতে ফিরে যেত ক্যাঁচড় ক্যাঁচড় আওয়াজ করতে করতে। গাড়ির নীচে ঝুলত একটা লন্ঠন। যার আলোতে বন্য পশুরা একটু হলেও সাবধান হত।

তরাইয়ের হাট কথায় হাড়িয়ার মাদকতা থাকবে না, তা হয় না। হাড়িয়া পানীয়টি যেমন বিনোদনের উপকরণ, তেমনই যেন ভুলিয়ে দেয় ব্যক্তি জীবনের সমস্ত জ্বালা ও যন্ত্রণাকে। বিশেষত চা বলয়ের হাটগুলিতে দেখা যায় কোন এক প্রান্তে গাছের ছায়ায় নেশায় বুঁদ হয়ে লতার মতন মাটিতে গড়াগাড়ি খাচ্ছে। আবার কেউ বা লটারির নামে পকেট ফাঁকা করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরছে ভাগ্যকে দোষ দিতে দিতে। সে সময় কোন এক গ্রামীণ শিল্পীকে হয়ত দেখা যাবে দুপুর জুড়ে গান গেয়ে বিক্রী করছেন তার নিজ হাতে তৈরী দাঁতের মাজন। খুশী মনে নিজের পসরা গুটাতে গুটাতে হাসি মুখে গুন গুন করে গাইছেন ''হরি দিন তো গেলো, সন্ধ্যা হলো ...।' পাশের ঝোঁপে তখন আকাশের তারার মতন আলো করে আছে জোনাকির দল। নিন্দুর ঠাকুর নামে এক গোঁসাই বারো মাস কলা বিক্রী করতেন মাটিগাড়া হাটে। তার উদ্দেশ্য ছিল অর্জিত মুনাফা দিয়ে রূপসিং জোতে বাসন্তী পুজোর মেলাতে দৈ চিড়া খাওয়ানো। তিনি তাতে সফল হন (চিত্তরঞ্জন দেবভূতি)। হাটের সাথে জীবন জীবিকার যোগ থাকলেও নিন্দুর ঠাকুরের ছিল যেন দার্শনিক যোগ। সব মানুষ সুখে থাকুক, এটাই যার মূল কথা। এই মেলাটি প্রায় আশি বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২১-২৪ সালে সরকারী মৌজা তালিকায় শিলিগুড়ি মহকুমাতে মোট ২৫টি স্বতন্ত্র মৌজা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেই তালিকায় বীর্ণাবাড়ি হাটের উল্লেখ নেই, যদিও ১৮৯৮ সালের প্রথম সেটেলমেন্ট রিপোর্টে বীর্ণাবাড়িকে স্বতন্ত্র মৌজা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হয়ত প্রশাসনিক কারণেই বীর্ণবাড়ি তালিকা থেকে মুছে গিয়েছে। যেমন সেদিনের বাঘ চলাচলের পথ বাগডোগরা আজ হয়েছে একটি সমৃদ্ধ জনপদ। হাটকে কেন্দ্র করে যার পথ চলা শুরু। সেখানকার আকাশ আজ সর্বদা ব্যস্ত থাকে উড়োজাহাজোর পথচলায়। অতীতের হাটগুলো আজ এক একটি সমৃদ্ধ জনপদ। যা শিলিগুড়িকে মহানগরের পথে যাত্রা করতে শুরু করেছে। মানুষের জীবন সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে শিলিগুড়ি মহকুমার হাট। যেখানে রচিত হয়েছে সংহতির ,সেতু।

কৃতজ্ঞতাঃ

(১) SASI BHUSAN DUTTA, FINAL REPORT, DARJEELING TERAI SETTLEMENT, 1898.

(২) JURISDICTION LIST - POLICE STATION, SILIGURI 1921-1924

(৩) শ্রী চিত্তরঞ্জন দেবভূতি - বাসিন্দা, রূপসিংজোত, শিলিগুড়ি

(৪) Compendium : Shalbani Land Research Institute

(৫) DHE SUNDERS REPORT.

দুই তারে বাঁধা থাক...

প্রবীর চক্রবর্তী

ভালোবেসে নাম রেখেছিলাম ঃ 'শিলাঞ্জনা'। মনে মনে ডাকতাম শিলাঞ্জনা শিলিগুড়ি বলে। এ শহর আমার চোখে নতুন। কাজের সুবাদে আসা। কর্মস্থল যদি চ জলপাইগুড়ি জেলার এক দুরধিগম্য অজগাঁয়ে। কিন্তু, শিলিগুড়িকে খুঁটি করেই বসবাস, আর, নিত্যিদিনের যাতায়াত। শহরটাকে চিনতেই বহু বছর লেগেছে। এখনও এই গর্ভগৃহের অনেক সুড়ঙ্গ-শুঁড়ি-গলি-*অলিপথে* আমার হাঁটা হয়নি। সকাল-সকাল কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরোতে হত; গৃহস্থের সন্ধেবাতিগুলি পাটে যায় ফিরতি পথেই। এই তো ছিল দিনানুদিনের দিনলিপি। টিচার না হকার, না কি কোনও অফিসের চাবিদার?! কত-না কানাকানি! দীর্ঘদিন পাড়ায়-পাড়ায় ভাড়াবাড়ির মাধুকরী। পড়শিকুলে আমিই তো প্রকৃতপ্রস্তাবে পরবাসী! বেগানা! কিছু কিছু বাড়িমালিকের কাছে আবার জাত *ভাড়াইট্যা*।

আরে, আরে, আমিও যে তোমাদেরই লোক! জন্মেছি না হয় রসকষ বিরহিত বীরভূমে — অহল্যা মৃত্তিকার দেশে। বাস্তুবঞ্চনার রক্তবীজের উত্তরাধিকার আমিও বয়ে বেড়াই। চাই — প্রতিটি জল-মাটি-বাতাসের সংগতে আমি যেন সুরে-সুরে বাজি। মাটিতে মাটিতে তাই অর্পণ করে চলি, আমার সন্নতির অঞ্জলি। তোমার মুখের কথা আমার কথার ভাণ্ডারে জমা হলে পর...! আমি-ই যে ধনী। অনাঘ্রাত ফুল কিংবা অনাবিদ্ধ অলংকারের মতো অনাহত খাঁটি বলে বড়াই করার দাবিদার কটা কথাই বা খাস কথা?! *কথাসরিৎসাগর*-এ আমরা সাঁতার কাটি কেবল।

এবার অন্য কথায় ফিরি। শৈশব কেটেছে বীরভূমের সিউড়ির কাছে তিলপাড়া ব্যারেজের উপকণ্ঠে ছ'টি কোয়ার্টারের একটি ছোট্ট উপনিবেশে। অনতিদূরেই ময়ূরাক্ষীর ক্যানেল। খাঁড়ি। ছোট-বড় জলখাত। পুবে নিঝুম সাঁওতালপাড়া। সেই জল আর বাতাসের সম্মিলিত সুর ছেড়ে চলে আসতে হল প্রবল জলকষ্টের বোলপুর শহরে। কয়েক বছর পর আবার জলের কাছাকাছি ; শান্তিনিকেতনের গা-ঘেঁষা শ্যামবাটী সেচবিভাগের কোয়ার্টারে। অমারাত্রির অন্ধকারে কতবার-ই না ঘোর লেগেছে ঘরলাগোয়া ক্যানেলের জলপ্রপাতের শব্দে! একপাশে নিসর্গের নিঃসীমে খোয়াই। প্রান্তিক। অন্যপাশে সোনাঝুরির বিতীর্ণ বিরাম-বিতান।

ছোটোবেলাকার ভূগোল বইয়ের পাতায় লিপিবাহিত তরাই-ডুয়ার্স আমাকেও টেনে নেবে ; বুঝিনি তখনই। বড়দা (সমর চক্রবর্তীর নামের আগে সোজাসুজি প্রয়াত দেগে দেওয়ার কালিকলমটি পেলাম কই!) শান্তিনিকেতনের পাট-পাঠ চুকিয়ে ১৯৭৫সালের নভেম্বরে শিলিগুড়ি চলে আসে কলেজে চাকরি করতে। আমি তো এলাম আরও বছর দশেক পরে। ওর মুখে এখানকার বহু মানুষের কথা শুনেছি; জায়গাটার কথা শুনিনি তেমন। আমারও হয়তো আকর্ষণ ছিল না। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির অনেকেই ওর সঙ্গে শ্যামবাটী গিয়েছেন, থেকেছেন আমাদের সঙ্গে। ঢেঁ কিশাক চিনেছিলাম এমন ই কারও স্বভাব-ঔদার্যে।

পুরবার্তা ২০২১

ওই যে বলেছি ; খুঁটি করে বাস ! এই ধরনের মানুষই তো শহরটাকে দোহন করে, শোষণ করে শুধু। শোধন করতে ক'জন বা চায়? আমি হয়তো সেই দলেরই এক দাগি। (অবশ্য অধিকাংশ পরবাসীরাই পরে খুঁটি ঘিরেই পুরবাসী হয় এবং অধিবাসীও হয়ে যায়।) এখানে আমার প্রথম দিকের দিনগুলিও তো কিছুটা আড়ষ্ট, কিছুটা পরিযায়ী। যদিও ক্ষণস্থায়ী। স্বজনসান্নিধ্যে আমারও ভালো লেগে গেলো জায়গাটা। সমাসমবয়সি বন্ধুজনের ভালোবাসার অকৃপণ দানে ঋণী করেছেন তাঁরা আমাকে। বারান্তরে, সুযোগ মিললে, তাঁদের কথাও বলব বইকি। আমার ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই আমার বন্ধু বনে গেছে। আসা-যাওয়া করে, খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করে। বড়দার সুবাদে তার বন্ধুদের কেউ-কেউ আমার বন্ধু হয়ে গেছিলেন। সে-বাঁধুনি কিছুটা আলগা এখন। হয়তো আমারই দোষে। এসব এবার থাক।

ব্যক্ত হোক ব্যক্তি; ব্যক্ত হোক জীবনের জয়। সময় বড়ই সংকটে। 'অভেদ' বোঝাই আমরা; বিভেদ শেখায় পার্শ্বজন। যাবৎ ভেদাভেদের তাবৎ বেড়া ভেঙে দিয়ে সবার হয়ে যেতে পারে আর ক'জন ? ! অথচ সারাদিন এ শহরের বাঁকে-ঠেকে মানুষের সঙ্গে অজচ্ছল গুলতানি করেও পোষায়নি একজনের। মধ্যরাতের মোহনে গলি-ঘুঁজি-'অলি'-তেও যার গতায়াত। মানুষের অভাব ছিল না তার কোত্থাও। আবার বড়দার কথা বললাম। ক্ষমার্থী আমি। শিলিগুড়ি নিয়ে কিছু বলতে গেলে তাকে এত তাড়াতাড়ি বাদ দেওয়া বোধকরি, অনেকের কাছেই দুষ্কর। আর শহরটার ভূগোলটিকে *আদ্রাঘিমাক্ষ* চোখে চোখে ছকে নিতে একলা-একলি-ই ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত আমার আত্মজ। বড়দার অপসরের মাস পাঁচেকের মাথায় এই জুলাই মাসেই মাত্র ত্রিশে পা দিয়ে সে-ও চলে গেল। চেনা দিল না ; ধরা দিল না...। এবার যার কথা বলে ফেলেছি... ! পুনশ্চ ক্ষমা চাই। এই অবান্তর যোজনায় করুণার উদ্রেক চাই না। সমমর্মিতার সপ্রাণ স্পর্শটুকুই অনেক। জেঠুর বিদ্যে-বুদ্ধির বিন্দুবিসর্গ হয়তো তার ভাইপোর গায়ে লেগে গিয়েছিল। কেউ না-জানলেও জেঠু তা জানত।

এই নিজযাপনের প্রৌঢ়ত্বে বত্রিশ বছর আগের শিলিগুড়ি আজও আসে ; আমার কাছে। রৌদ্রছায়ায়। এখন বর্ষা। 'মেঘ না চাইতেই জল'-পাওয়ার দেশ দেখে দারুণ খুশি হয়েছিলাম। বরাবরের জলকাঙাল নদীর পাশের বাস ছেড়ে বড়ই মুষড়ে পড়েছিল। দৈনন্দিনের ব্যবহারের জলের অঢেল অপচয়ের শাস্তি এখানে এসে পেয়েছি প্রথমদিকে। সব কষ্ট ভুলে গেলাম আকাশের ঢলে। এ দেখি মাঝেমাঝেই দুয়ারে লাগে গঙ্গা ! হাইড্রেন উথলে জল থইথই পথ। পথচলতি মানুষের পায়ে-পায়ে ছোট মাছের পিলপিলানি। কেয়া ছিল না। কাদাও ছিল না। কদম ফুটতো তখনও বেশ কিছু গাছে। (বীরভূমের কাদায় আঠার টান, ছাড়ানো কঠিন। চপ্পলের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে ঘটুক, সর্বাঙ্গে লেগে থাকে তার লালিমা।) শহরে অনেক কাঠের বাড়ি ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। আর গাছ ? ! গাছের কথা বলতে গেলে আমার কষ্ট হয়। কানে করাতের শব্দ বাজে। শহরের গাছগুলির কথা এখন আর মনে পড়ে না। শুনেছি, ঝড়-জল-বজ্রাঘাতে আহত কিছু গাছকে নিধন করা হয়েছে। রক্ষা করা যায়নি। সারা শহর ঢুঁড়েও মিলবে না এক ফালি

বৃক্ষচ্ছায়া। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সড়কের (কতটা রাজ্যভুক্ত, কতটাই বা জাতীয়! অতশত বুঝি না। এশিয়ান ও আছে বলে!) পাশে সুপ্রাচীন বনস্পতিগুলির কর্তন উদ্‌যাপন নিজের চোখে দেখতে হয়েছে। দিনের পর দিন। এক-একটি গাছের বয়সের গাছপাথর নেই। যন্ত্রও তাদের ছেদন করতে পারে না। দু'তিনদিনও লেগে গেছে একটি গাছ কাটতেই। সেই কবেই গাছ কাটা হয়ে গেল! আর কবে হাত পড়ল পথপ্রসারণের কাজে! ঐতিহ্যের স্মারক কয়েকটি গাছকে বাঁচতে দিয়ে পথ কাটা যেত কি না আমার জানা নেই। কাটা গাছের গা বেয়ে যেন রক্তে ভিজেছে পথ। বৃষ্টির জলেও যেতে চায় না কলঙ্কের সেই ছোপগুলি। দিনে-দিনে পাহাড়েও বৃষ্টি কমেছে। তার কোলের শিলাঞ্জনা আগের মতো ভিজতে পায় না। (ঋতুচক্রে এখন পরিবর্তনের পদসঞ্চার। অরণ্যবিরল এই জনারণ্যে বীতাশ বাতাস কেবল তাপমান বাড়িয়ে চলে।) বৃষ্টি ইদানীং এখানেও নিম্নচাপনির্ভর। নববর্ষার দেয়াডাকে ভয় পেতাম শৈশবে। এখানে আসার পর বহুবছর ঘরের পাশের জলায় মণ্ডূকের ম্যারাথন মকমকে মৌজ এসেছে ঘুমের প্রহরে। ভেকাঃ গায়ন্তি — কথাটা শুনে হাসি পেত; এখন শুনতে না-পেয়ে কান্না পায়। আমি ফুলেশ্বরীর ভরাকাল দেখিনি। তার পারে পাখিও না। জলের খোঁজে চলে গেছি — ফুলবাড়ি, আমবাড়ি, গাজলডোবায়। নগরাজ অপেক্ষা ধারাবতী আমার চোখে গরীয়সী।

কাশের সকাশে যাই না আর শরতের দেখা পেতে। অবকাশ মিললেও কি তার সঙ্গে আগের মতো মিলতে পারি? জুড়তে পারতাম কাশে-অবকাশে? কথা তো ঠিকঃ কাশ আর কাছাকাছি কই? কবে কোথায় চলে গেছে বাস উঠিয়ে...! আশ্বিনের শেষে বুঝি বা জানান দেবে শরৎ। শেষরাতে তার সাদর শিরশিরানি এক-আধ বার শরীরে বিলি কাটুক।

বসন্ত আমার আজও ভালো লাগে। মধুঋতু বরণেরই ঋতু, মধুমাস বর্ণের মাস। শীত আর বৃষ্টির হুজুগেপনায় বসন্ত এখানে বিড়ম্বিত। বিলম্বিত। যেটুকু বা পাওয়া যায়, চৈত্র শেষে। বারান্দায় বসন্ত ফলাতে পারি না বলে দুঃখ করি না। মনে মনে চলে যাই — উত্তরের পর্বতপ্রদেশে — সানুদেশে। 'নিথরবৃক্ষতা'-র ঘন সন্নিধানে। কিংবা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার টিলায় — শাল-পিয়ালের আশেপাশে — মহুয়ার মদালসে। রঙের খেলায় মাতিনি কখনও। ফাল্গুনের হাওয়ায় আবিরের আগুন দোল খায়। আবিরের রঙে 'দোল' লাগে সবার মনে। যে-আবির আশ্লেষে আমাদের নিবিড় আত্মীয়তায় রঙ ধরে। মাঝে মাঝে মনে হয় — কবির তপোভুমির শাল-শিরীষ, শিমুল-পলাশ, কাঞ্চন-রঙ্গনের গাছগুলি থেকে একটি করে তুলে এনে যদি এই বনরাজির ফাঁকে-ফাঁকে রোপণ করতে পারতাম! আর তালপুকুর থেকে কিছু তাল-খেজুরের গাছ! রঙ্গে-ভঙ্গে তারা বেশ মানাবে — ধবধবে আতপে বা স্পৃহনীয় চন্দ্রাতপে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি যাতায়াতের পথে, এখন যেখানে 'উত্তরকন্যা', তার আশেপাশে কিছু পলাশে প্রায় প্রতি বছরই ফুল ফোটে। এক কালে 'উত্তরকন্যা' ছিল পলাশ-বিলসিতা। এখন এক-দুটি গাছ টিকে আছে মাত্র। এখানে নানা রঙের ফুলের জারুল ছিল অনেক। ছাতিমও ছিল কিছু। ফুলবাড়ি ক্যানেলের ধারে-ধারে। রাস্তার প্রয়োজনে নাজুক

হেমন্তের শরীরের সংগ্রামী গন্ধটুকুর কোন দাম দিল না কেউ।

আসলে এক একটি ঋতুকে আলাদা করে পেতে তো ইচ্ছে করেই। আবার তাদের মিলমিশেও মন্দ লাগে না। যাই হোক, আমার-আপনার খণ্ড খণ্ড জীবন যেন বিচিত্র সন্ধির একসূত্রটি খুঁজে পায়; বৈশাখে কী শ্রাবণে, যখন-তখন নিখিল কোকিল ডাকতে যেন পারে। সামনে স্বাধীনতা দিবস। আমাদের আজকের প্রার্থনা — স্বাধীনতা উদ্‌যাপন চিরজীবী হোক। স্বাধীনতা লাভ করা যেমন কঠিন, তার সুরক্ষাও একেবারে সহজ কাজ নয়। ইতিহাস সজীব। সবাক। শুধু ফিরে দেখাটাই জরুরি।

এলেবেলে কথায় অনেক পাতা অপচিত হল। এখন আর লেখাটিকে ব্যাপ্ততর প্রেক্ষিতে এগিয়ে নিয়ে চলার অপারগতা স্বীকার করি। শুধু বলি ঃ ছোট মন নিয়ে বড় ঘরে টেকা যায় না। সেই 'বড়-ঘর' বলতে আমাদের দেশ। আজকের অবস্থান থেকে এ কথার মর্ম এখন ঢের বুঝি। সেই কোন্ যুগে সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ সমাধা করেছিল, আমাদের মাঝের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধতে আমরা ততটুকুও করি কি? বিশ্ববোধের নিরিখেই নিজের দেশকেও জানতে হয়;নিজবাসের শহরটিকেও মন থেকে চিনতে হয়। যে-শহর শুধুই আকার ও আয়তনের সূচক নয় — নিছক এক ভৌমিক ধারণাও নয়। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে জেগে থাকে তাঁর শহর, তাঁর দেশ; যাকে ঘিরে প্রাণের প্রকাশ, হৃদয়ের আততি। অধিকাংশ মানুষের কাছে নিজের 'ঘর'-টাই তো চিরসত্য — কখনও আবার আদরের ঘরটাই প্রকাণ্ড এক মিথ্যে। শান্তির খোঁজে তখনই অবিরাম ঘর-বার। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীও পেরিয়ে গেছে কবেই। এখনও ভাষা-বিভাষার সমস্যা। ধর্মের ধ্বজার আড়ালে জিগির। জাতের নামে জুগুপ্সা। আমাদের বাতাসে মধু, জলে মধু; কেন বিষ ঢালি তাতে... !

'আজ যেমন ক'রে চাইছে আকাশ তেমনি ক'রে চাও গো।'

শত্রুর মুখে ছাই নয়, বরং সংঘাতের ভীষণ হাতে পরিয়ে দিই পরম সংহতির নরম রাখি — মালা গাঁথি ডালা-ভরা ফুলে। গুছিয়ে তুলি ছত্রখান সংসার — সামলে রাখি যেটুকু সম্বল। সংহতির কমতি নেই কোথাও। নরলোকে যেমন, নক্ষত্রলোকেও সংহতি বা সঙ্ঘশক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ! জলবিন্দুর দল জোট না বাঁধলে কী নামে ডাকতাম তাকে? ঘরের মধ্যে থেকে নয়, বিশ্বপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রাতিস্বিক মানুষ খুঁজে নেবে তাঁর জীবন; ভূগোলের এক অংশের মধ্যে নয়, '...আন্তর্জাতিকতায় মুক্তি নিয়ে দেশ খুঁজে নেবে তার ইতিহাস।' রবীন্দ্রগানেই ধ্বনিত সেই প্রার্থনা —

'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।'

আমার এই আবাহনে ত্রুটির অন্ত নেই। উত্তর আর দক্ষিণের দোলাচলে দিগ্‌ভ্রম ঘটে গেল! আসলে তো বিদিকজ্ঞানীর মানসপটে মানপটের বিশ্বজগৎ জটলা বাঁধায় কেবল। বিষয়বিদগ্ধ লেখকজনের আলেখগুলি 'পুরবার্তা'-র পাতায়-পাতায় বর্তিকা হয়ে জ্বলবে। শত অপরাধ সত্ত্বেও বুধমণ্ডলীর মহাপ্রাণতায় আমি বে-কসুর।

এই সময় ও শিলিগুড়ির থিয়েটার

পলক চক্রবর্তী

এ-যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ-পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূ তিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল;
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।

(জীবনানন্দ দাশ)

যে সময়ে এই লেখা লিখতে বসেছি, খবর এল ফাদার স্ট্যানস্বামীর রাষ্ট্রীয় হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হেফাজতে থাকাকালীন তিনি বারবার জামিনের আবেদন করেছেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। হেফাজতে তাঁর প্রতি যে নির্মম আচরণ হয়েছে, সভ্য সমাজে এমন ঘটনা বিরল, যা শুনলেও শিউরে উঠতে হয়। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি মৃত্যু না পরিকল্পিত হত্যা? এই মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ ঘিরে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, মানুষ রাস্তায় নেমেছে, প্রতিবাদ করছে। শিলিগুড়ির থিয়েটারের মানুষেরাও সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইসময় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শুধু মঞ্চে রং মেখেই নয়, প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে সরাসরি মিছিলে, প্রতিবাদে সামিল হওয়া, এটাই বোধহয় শহর শিলিগুড়ির নাট্যচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শহরের নানা সামাজিক , সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নাটকের মানুষেরা বিভিন্ন সময়েই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সামগ্রিকতায় না হলেও অন্তত, এটাই শিলিগুড়ির নাট্যচর্চার প্রধান অভিমুখ, একথা বলাই যায়। এই যে, মঞ্চ এবং রাস্তা, নাটক এবং সমাজ, জীবন এবং

পুরবার্তা ২০২১

থিয়েটার, নাট্য বিষয় এবং নাট্য আঙ্গিক এইসব মিলেমিশে এই শহরের থিয়েটারের বেড়ে ওঠা, এগিয়ে চলা। শিলিগুড়ির নাট্যচর্চার ইতিহাস প্রায় একশ বছরের। যদি কোনদিন শিলিগুড়ির নাট্যচর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যায়, তবে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই হয়তো ধরা পড়বে। শহরের নাট্যচর্চার ইতিহাস দীর্ঘদিনের, সেটা নিয়ে চর্চা পরে কখনও হবে। আমরা বরং যে ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিয়ে এখন চলেছি, জীবনের এই সময়ের উপলব্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের থিয়েটারে কেমন করে কাজ করছে, থিয়েটারের মানুষেরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে কি ভূমিকা নিচ্ছে, আপাতত এই প্রসঙ্গেই থাকি।

আমরা গত প্রায় দেড়বছরের বেশি সময়কাল ধরে ভয়াবহ এক অতিমারি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি। অতিমারির প্রথম ঢেউ অতিক্রম করে বর্তমানে আমরা দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যে আছি এবং শুনছি তৃতীয় ঢেউ নাকি আসন্ন। এই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন। এমন নয় যে, কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের দেশে আমরা সবাই খুব ভালো ছিলাম, মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত ছিল, সমাজে কোন বৈষম্য ছিল না, রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে কোন অসন্তোষ ছিল না। কিন্তু কোভিড ঝড় এসে সব এলোমেলো করে দিল। আচমকা লকডাউনে মানুষের আটকে পড়া, পরিযায়ী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, ক্রিকেটের স্কোরবোর্ডের মত লাফিয়ে বাড়তে থাকা মৃত এবং আক্রান্তের সংখ্যা, চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়া মানুষ, কর্মহীনতা, দেশের অর্থনীতির করুণ পরিস্থিতি, খেতে না পাওয়া মানুষ, সামাজিক দূরত্ব, মুখোশের ভার সবমিলিয়ে ভয়ঙ্কর দিশেহারা এক অবস্থা জনজীবনের। আচমকা অতিমারির প্রভাবে আমরা যেন সবাই একসারিতে দাঁড়িয়ে গেলাম আর মাইল মাইল অদৃশ্য দূরত্বও তৈরি হয়ে গেল মানুষে মানুষে। যদিও গরীবের কষ্ট যথারীতি আরও বাড়লই। কিন্তু আমরা অনুভব করলাম, আমাদের সবার জীবনই যেন বড় অনিশ্চিত। আসলে কোন কিছুই একবারে ঘটে না, তার আগে আড়ালে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া সচল থাকে। থিয়েটার নির্মাণে এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে চরিত্রের 'ডাইলেক্টিক্স' বোঝা খুব জরুরি। 'ডাইলেক্টিক্স' বলে কোন কিছুই স্থির নয়, সবকিছুই পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ কোন এক প্রক্রিয়ার মধ্যেই ঠিক তার বিপরীত ভাব বা প্রক্রিয়ার সূত্র অন্তর্নিহিত থাকে। বর্তমান সময়ে ডাইলেক্টিক্সের নিরিখে আর্থ-সামাজিক নানা স্তর সেইসঙ্গে তার মধ্যেকার অস্থিরতাগুলি আরও বেশি করে ধরা পড়ছে।

এই অস্থিরতার কথা, রাষ্ট্রের গলদ, আমরা থিয়েটারের মানুষেরা আমাদের কাজে সবসময়ে বলবার চেষ্টা করেছি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু শিল্পের তকমা পেয়েছি, জুটেছে সামাজিক উপেক্ষা। থিয়েটার এমন একটি শিল্পমাধ্যম, যা প্রতিমুহূর্তে ভীষণ জ্যান্ত, মুখোমুখি জ্যান্ত মানুষের উপস্থিতির মধ্যে দিয়েই থিয়েটার নামক ঘটনাটা ঘটে। সামাজিক দূরত্বের কোন কথা থিয়েটারে আসতেই পারেনা বরং থিয়েটারে সামাজিক নৈকট্য চাই। এমনকি অভিনয়ে শারীরিক দূরত্বও রাখা চলেনা। আর মুখোশ নয়, জ্যান্ত মুখ চাই, যে মুখে হাসি , কান্না , রাগ , দুঃখ , ভালবাসা

, আনন্দ , হতাশা সব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আসলে থিয়েটারে একটা স্পর্শ চাই। কিন্তু কোভিড এসে মানুষে মানুষে শারীরিক ও সামাজিক দূরত্বের নিদান দিল। এবং হঠাৎ ঘোষণা করা লকডাউনে অন্যান্য সবকিছুর পাশাপাশি বিনোদন এবং সংস্কৃতির চর্চাও দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের শহরের একটিমাত্র সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র দীনবন্ধু মঞ্চটিও যথারীতি বন্ধ হয়ে গেল। এমনিতেই মঞ্চটি নিয়ে আগে থেকেই কিছু সমস্যা, বিশেষত নাট্য মঞ্চায়নের বেশ কিছু অসুবিধা ছিলই। কারিগরি সমস্যা, কর্মচারীর অপ্রতুলতা এইসব নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনাও চলছিল, প্রশাসনের তরফ থেকে কিছু উদ্যোগও নেওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে সব বন্ধ।

হঠাৎ এই যে লকডাউন, এমন পরিস্থিতিতে সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষের মত থিয়েটারের মানুষদেরও স্বাভাবিকভাবেই দিশেহারা অবস্থা। আচমকা সবার মহলা কক্ষে তালা পড়ল। নতুন থিয়েটার, নতুন থিয়েটারের কাজ, ভাবনা, অভিনয়ের প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ, এসবই ছিল আমাদের জীবনে বেঁচে থাকবার অক্সিজেন। চারিদিকে অক্সিজেনের হাহাকারের মাঝে আমাদেরও অক্সিজেনে টান পড়ল। আমাদের থিয়েটারে কোন পুঁজির জোগান নেই। ফলে লাভেরও কোন গল্প নেই। ক্ষতির গল্প আছে এবং সেই ক্ষতিপূরণও চুপিচুপি নিজেদের পকেট কেটে পূরণ করার চল। সরকারি অনুদানের গল্প হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় বটে, কিন্তু ধরা দেয় ক'জনার কাছে? সরকারি চাকুরেই বা কজন? নাটকের সঙ্গে যুক্ত একটা বড় অংশের মানুষ বেসরকারি অথবা দৈনন্দিন রোজগারের ওপর নির্ভরশীল। এই অংশের অনেকগুলো মানুষের যে হঠাৎ করে রোজগার বন্ধ হোল, সেটাও নাট্যদলগুলির কাছে উদ্বেগের কারণ হল। প্রাথমিক স্থবিরতা কাটিয়ে দলের পক্ষ থেকে সাধ্যমত যেমন সবার মানসিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছিল, অন্যদিকে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও কি করে থিয়েটারের কাজে ফেরা যায়, সে আলোচনাও চলল। এবং এই আলোচনা কেবল নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যেই থেমে থাকেনি, সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর পরিসরেও তা ছড়িয়ে পড়ল। যোগাযোগের মাধ্যম হল ফোন এবং সোশাল মিডিয়া। এই পারস্পরিক যোগাযোগ একে অপরের মনোবল বাড়াতেও সাহায্য করেছে অনেকটা।

আমাদের শহরের ক্ষেত্রে যেটুকু জানা যাচ্ছে যে, শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্যসংস্থার সদস্যরা প্রাথমিক স্থবিরতা কাটিয়ে এপ্রিলেই একটি আন্তর্দলীয় একক নাট্য প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করে। জুলাই' ২০২০ তে ঋত্বিকের মহলা কক্ষে দলের সদস্য এবং মাত্র একজন আমন্ত্রিত বিচারকের সামনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দলের আটজন কলাকুশলী নিজেরাই নাট্য নির্মাণ করে এককাভিনয় মাধ্যমে 'কথকতা', 'পরিযায়ী', 'নিরুত্তাপ', 'যদিও সত্য', 'ছুটি', 'এক শঙ্কিত প্রহরে', 'বালি', 'আজকের সংবাদ' নাটকগুলি পরিবেশন করে। বিষয়ের দিক থেকে নাটকগুলি মানবজীবনের বিভিন্ন

পুরবার্তা ২০২১

ধরণের সঙ্কটকে প্রতিফলিত করে। ভাবনার দিক থেকে এই পরিকল্পনা সত্যিই অভিনব। যা অন্যদের সাহস জুগিয়েছে। পরবর্তীতে ঋত্বিক তাঁদের ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং সংগঠনের অন্যতম প্রাণপুরুষ মলয় ঘোষের ষষ্ঠ প্রয়াণ দিবসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে উত্তালের পাশাপাশি ঋত্বিকের বেশ কয়েকটি নাটক পরিবেশিত হয়। অগাস্ট'২০ তে শিলিগুড়ি সৃজনসেনা 'আনলক থিয়েটার' শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে একটি নাটক 'অন্ত্যজ ভারত কথা' একেবারে স্বল্প পরিসরে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আমন্ত্রিত দর্শক নিয়ে তারা প্রযোজনা করে। পরে হাথরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে একেবারে নতুন প্রজন্মের সম্মিলিত প্রয়াসে সৃজনসেনা আয়োজনে 'প্রজন্ম কোজাগর' নামে একটি অনুষ্ঠান করে। উল্লেখ্য, এই আয়োজনে একটা বড় অংশের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং উত্তাল, ঋত্বিক, ও সৃজনসেনা নাটক পরিবেশন করে। দুর্ভাগ্য, ২০২০ তে সৃজনসেনার আয়োজনে একটা বড় মাপের নাট্যোৎসব বাতিল করতে হয়, কোভিডের কারণে এবং তারা বড় অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়ে। সৃজনসেনা তাঁদের কাজে এই পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়েও যথেষ্ট সক্রিয়।

এদিকে উত্তালের সদস্যরা সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ শুরু করে। সেখানে থিয়েটার বিষয়ক নানা আলোচনা, দেশ বিদেশের নতুন নাটক পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ এবং আরও কিছু পরে এই মাধ্যমে মহলাও শুরু করে। বিশেষ করে বলবার, দলের নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই সময়ের মধ্যে নাট্য রূপান্তর, নতুন নাটক রচনার কাজ করেছে। সেপ্টেম্বর'২০তে মহালয়ার দিন বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল হওয়াতে উত্তাল শহরে প্রথম সাহস করে সরকারি স্বাস্থ্য বিধি মেনে সাধারণ দর্শকের সামনে অনুষ্ঠানে নতুন নাটক 'জ্ঞান' প্রদর্শন করল। অনুষ্ঠানে আরও দুটি নাটক ঋত্বিকের 'কথকতা', বলাকার 'ড্রাই ডে' প্রদর্শিত হয়। উল্লেখ্য তিনটি নাটক এবং কুন্তল ঘোষের লেখা একটি গান এই করোনা কালের মধ্যেই নির্মিত। কুন্তল ঘোষের রচনা, সুর এবং কণ্ঠের গানটি এই সময়ের বিপন্নতা, হতাশা কাটিয়ে উদ্দীপনার বার্তা দেয়। গানের কয়েকটি লাইন উল্লেখ করতে ইচ্ছে হল-

''তোমার হাতে হাত রেখে আজ এ পথচলা/ দূরত্ব নয় একসাথে আজ মিলিয়ে বলা/ মঞ্চে পথে সংলাপেরা ছড়িয়ে পড়ুক/ জীবন জুড়ে আবার সুরের ঝর্ণা ঝরুক/ ছন্দে ফিরুক, ছন্দে ফিরুক/ জীবন আবার ছন্দে ফিরুক''

পরবর্তী সময়ে ২১ ফেব্রুয়ারি' ২১, ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে উত্তালের সদস্যরা তিনটি নতুন নাটক রচনা ও নির্মাণ করে। 'হারানো পদক', 'ভাষা', 'একুশে'। উল্লেখ্য, এর মধ্যে প্রথম দুটি নাটক নবীন প্রজন্মের রচনা ও

নির্মাণ। তিনটি নাটকেই ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে ভাষা আন্দোলনকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে দুটো মনোজ্ঞ বক্তৃতারও আয়োজন ছিল। বিশ্ব নাট্য দিবসেও উত্তাল নাটক, গান, আবৃত্তি, ও বক্তৃতার আয়োজন করে। এছাড়াও জানুয়ারি'২১ উত্তাল একটি নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে।

এভাবেই বিভিন্ন নাট্যদল প্রথমাবস্থায় সরাসরি মঞ্চে না এলেও, কাজে ফেরার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকে। যেমন, 'রঙ্গমালঞ্চ' নাট্যদল ড. তপন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই একাধিক প্রযোজনা করে। কুন্তল ঘোষের উদ্যোগে শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমি ডিজিটাল মাধ্যমেও বেশ কয়েকটি কাজ করে। 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের নির্বাচিত অংশ ইউটিউবের জন্য এবং 'মেড ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি টেলি থিয়েটার 'সৃজনসেনা' পার্থপ্রতিম মিত্রের দায়িত্বে প্রযোজনা করে। শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্যসংস্থা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য রচিত এবং শুভঙ্কর গোস্বামী নির্দেশিত 'বোধোদয়' টেলিথিয়েটার প্রযোজনা করেন। এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে সৃজনসেনা'র পত্রিকা 'সৃজনপত্র', 'গণনাট্য ৭৫ সৃজনসেনা ২৫'। এমনি আরো অনেক দলই এই সময়ে তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করছিলেন, কাজে ফেরার চেষ্টা করছিলেন। তথ্যের ভিড় আর না বাড়িয়ে আমরা বিপন্নতার মাঝে নাট্যদলগুলোর অবস্থা ও অবস্থান খানিকটা ধরবার চেষ্টা করলাম মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওপরে যে নাটকগুলোর অভিনয়ের কথা বললাম, তা সবই করা হোল বিকল্প স্পেসে বা ডিজিটাল মাধ্যমে। অর্থাৎ, মঞ্চ বন্ধ থাকায় পরিস্থিতির প্রয়োজনে নাট্যদলগুলো বিকল্প ভাবনায় কাজ শুরু করছিল। এখানে শিলিগুড়ি মুক্তমঞ্চ প্রসঙ্গে দুএকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৯৭৯ সালের ২৭ মে স্থানীয় রোড ষ্টেশন ময়দানে (বর্তমানে যেখানে রেলওয়ে সিটি বুকিং অফিস অবস্থিত এবং কাছাকাছি চৌমাথাটি সফদার হাসমির স্মরণে হাসমি চক নামে খ্যাত।) সম্পূর্ণ দিনের আলোয় প্রতি রবিবার বিকেলে শুরু হোল মুক্তমঞ্চ নাট্যচর্চা। শহরে সরকারি উদ্যোগে একটি সম্পূর্ণ আধুনিক সুবিধাযুক্ত নাট্যমঞ্চের দাবীতে নাটকের মানুষেরা যুথবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেন এবং তারই ফসল আজকের দীনবন্ধু মঞ্চ। এই নাট্যমঞ্চের দাবিতে চলা আন্দোলনের মাঝে, বিকল্প ভাবনা হিসেবে মুক্তমঞ্চের আত্মপ্রকাশ। প্রায় পঁচিশ বছর নিয়মিতভাবে চলবার পর নানা কারণে মুক্তমঞ্চ নাট্যচর্চা বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তমঞ্চ নাট্যচর্চা আমাদের কাছে যৌথ নাট্যচর্চা ও নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। শিলিগুড়ি শহরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে ―মক্তমঞ্চ― র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বর্তমান সঙ্কটকালে বিকল্প ভাবনা থেকে নাট্যদলগুলো আবার 'মুক্তমঞ্চ' নাট্যচর্চার কথা ভাবতে শুরু করলো এবং ৬ই ডিসেম্বর ২০২০ স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে ভাষা শহিদ স্মারকের পাশে দ্বিতীয় পর্যায়ে শিলিগুড়ি মুক্তমঞ্চ নাট্যচর্চা শুরু হল। পথনাটিকার আঙ্গিকে মেঠো গন্ধের রেশ ধরে শ্রমিক , কৃষকের কষ্টের কথা, অধিকারের কথা বলার প্রত্যয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতি রবিবার বিকেলে খোলা

পূর্ববার্তা ২০২১

মাঠে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের অনুষ্ঠান শুরু হল আবার। ৬ তারিখে নানা প্রজন্মের নাট্যজনেদের পদযাত্রার মাধ্যমে শহর পরিক্রমার শেষে শুরু হয় মুক্তমঞ্চর অনুষ্ঠান। সূচনাদিনেই উত্তাল ও সৃজনসেনা তাদের নাটক প্রদর্শন করে। যে দলগুলির উদ্যোগে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তমঞ্চ শুরু হয়েছে - দামামা, উত্তাল, ঋত্বিক, বলাকা, ইংগিত, সৃজনসেনা, শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমি, গণনাট্য, থটস এরিনা, বনমালা, রঙ্গমালঞ্চ, নান্দনিক, নাট্যরঙ্গ, শিশু নাট্যম, ওপেন সিক্রেট, শিল্পীতীর্থ ও দর্পণ। ধীরে ধীরে শহরের নানা প্রান্তে অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এই পর্বে যে দলগুলি নাটক প্রদর্শন করেন - উত্তাল, সৃজনসেনা, ঋত্বিক, শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমি, বলাকা, ইংগিত, দামামা, থটস এরিনা, বনমালা, রঙ্গমালঞ্চ, নান্দনিক, নাট্যরঙ্গ, শিশু নাট্যম, শিল্পীতীর্থ ও দর্পণ। এরই মাঝে মুক্তমঞ্চের উদ্যোগে থিয়েটারের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি আলোচনা সভা এবং নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। নির্বাচনের ঘোষণার পর থেকে প্রশাযনিক অনুমতির সমস্যার কারনে মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠান বাধ্য হয়ে বন্ধ রাখতে হয়, নির্বাচনের পর আবার শুরু করা হবে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার কারণে আপাতত সমস্ত কর্মসূচী বন্ধ রয়েছে। এর মাঝে ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারী ২০২১ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি শিলিগুড়িতে ২০তম নাট্যমেলার আয়োজন করে, যেখানে উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলার নাট্যদল অংশগ্রহন করে। আমাদের শহর থেকে ইঙ্গিত এবং শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমি উৎসবে নাটক মঞ্চস্থ করে। কোভিড পরিস্থিতির মাঝে সেই প্রথম দীনবন্ধু মঞ্চের দরজা খোলা হয়। এরপর আবার দর্শকদের জন্য দীনবন্ধু মঞ্চের দরজা খোলে ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী আকাদেমির আয়োজনে প্রথম রাষ্ট্রীয় হিন্দী নাট্য উৎসব উপলক্ষে। সরকারি এই দুটো উৎসব বাদে অতিমারী এবং মঞ্চের কারিগরী ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কারণে দীনবন্ধু মঞ্চ বন্ধই রাখতে হচ্ছিল। এর মধ্যে 'ঋত্বিক' দীনবন্ধু মঞ্চে ১৮ এবং ১৯ মার্চ ২০২১ বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাটককার মান্নান হীরা'র 'একজন লক্ষীন্দর' নাটকটি পরিবেশন করে। বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনীর এক ভিন্ন আখ্যান দেখি আমরা এই নাটকে। নাটকের নির্মাণ, সমবেত অভিনয়, সঙ্গীত সবমিলিয়ে এই করোনাকালে আমাদের শহরে একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ণ দৈর্ঘের মঞ্চ প্রযোজনা। শুভঙ্কর গোস্বামীর নেতৃত্বে বিপন্ন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সাহসের সঙ্গে নাট্যশিল্পের প্রতি যে আবেগ, ভালোবাসা নিয়ে ঋত্বিকের কলাকুশলীরা এই প্রযোজনা নির্মাণ করেছেন এবং শিল্পগত উৎকর্ষের প্রতি অনুগত থাকবার চেষ্টা করেছেন, নাট্যজনেদের কাছে তা প্রেরণার। খারাপ লাগছে, ঋত্বিকের আয়োজনে গত কয়েকবছর ধরে চলা বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা ২০২০তে করাই গেল না। এবছরেও ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে হৈ হৈ করা এই নাট্যকর্ম হবার কোন সম্ভাবনাই আর নেই।

পুরবার্তা ২০২১

থিয়েটারের মানুষেরা যে এই সময়ে তাঁদের থিয়েটারে ফেরা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, হাহাকার করছিলেন, শুধুমাত্র তাঁদের কাজের কথাই ভাবছিলেন, এমনটা কখনোই নয়। নাট্যকর্মের কেন্দ্রে আছে মানুষ, মানুষের জীবনের প্রশ্নই সবার আগে। তবে থিয়েটারের মানুষের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। সারাবছর নাটকের কাজ চালাবার জন্য আমাদেরই জোগাড় করে চলতে হয়। তবুও এরই মধ্যে যে যার সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে লাগলো। কেউ তহবিল সংগ্রহে নামল, কেউ বা সরাসরি রাস্তায় নেমে কাজ শুরু করল। কোন নাট্যদল হয়ত কমিউনিটি কিচেন খুলে বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্র মানুষের খাবার জোগান দিতে শুরু করল। অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, ওষুধ বা অক্সিজেন দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া, এইসব সাধ্যমত চলল। কেউ আবার সাধ্যমত তহবিলের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল, পুরসভার তহবিল, দক্ষিণবঙ্গের বিপন্ন সর্বক্ষণের নাট্যজনেদের জন্য গঠিত তহবিল, বঙ্গ নাট্য সংহতির আমফান তহবিল এমন নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়াল। কেউ বা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাতে সরাসরি চিকিৎসা সামগ্রী তুলে দিল। এভাবে অনেকেই এগিয়ে এল, হ্যাঁ এই শহরেরই নাট্যজনেরা। যারা সারা বছর আপনাদের কাছে আবেদন করে থিয়েটারের পাশে থাকার জন্য, থিয়েটারকে বাঁচাবার জন্যে। এই প্রসঙ্গে কোন দলের নামই এখানে উল্লেখ করলাম না, কারন, অনেকেই এই বিষয়ে কোন প্রচার চাইছেন না। আবার কারো কারো কথা আমরা সবাই সংবাদ মাধ্যম থেকেই জেনেছি। অনেক নাট্যজন আবার এসবের বাইরেও একান্ত ব্যাক্তিগতভাবেই মানুষের পাশে থেকেছেন। এভাবেই থিয়েটারের জন্য লড়াই, মঞ্চের ভেতর মানুষের জন্য লড়াই, রাস্তায় নেমে আসে।

এর মাঝে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যেসময় সংক্রমণ হার উর্ধ্বমুখি, মানুষের জীবন জীবিকা দুর্দশাগ্রস্ত সেইসঙ্গে চারিদিকে অনবরত ভয়ের সাতকাহন রচিত হচ্ছে, এমতাবস্থায় এই শহরের কয়েকজন নাট্যবন্ধু মিলে গৃহবন্দী অবস্থায় টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে রোজ রাতে শুরু করল আড্ডা এবং নানা ব্যাক্তিগত কথাবার্তার মাঝেও স্বাভাবিকভাবেই থিয়েটারের বিপন্নতার কথা, ভবিষ্যতের কথা এসেই পড়ল। এই আড্ডার অন্যতম উদ্যোগে ছিল আমাদের নাট্যবন্ধু আনন্দ ভট্টাচার্য। আস্তে আস্তে এই আড্ডা ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরিত হোল। পোশাকি নাম হল 'থিয়েটারের আড্ডা'। প্রথমটা শুরু হয়েছিল নিছকই এক আড্ডার মেজাজে, পারস্পরিক যোগাযোগের প্রয়োজনে। চারিদিকের দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে এই যোগাযোগ আমাদের অক্সিজেন জোগাল। ধীরে ধীরে নাটকের ক্রাইসিস, ভবিষ্যৎ ভাবনা, কিভাবে পুনরায় কাজে ফেরা যায় এসব নিয়ে আলোচনা চলতে থাকল। কিছুদিনের মধ্যেই ডিজিটাল মাধ্যমকে হাতিয়ার করে ফোন ও ড্রামার সংমিশ্রণে 'ফোনোড্রামা' তৈরির কথা ভাবল আমাদের আড্ডাবন্ধু কুন্তল ঘোষ। তারই রচনা এবং নির্দেশনায় থিয়েটারের আড্ডার এগারোজন বন্ধুর অংশগ্রহণে যে যার বাড়িতে থেকেই অভিনয়ের মাধ্যমে তৈরী হোল ফোনোড্রামা 'অচেনা পাখি'। মাঝে মাঝে আমরা এই আড্ডায়

পুরবার্তা ২০২১

অতিথি হিসাবে শহরের সংস্কৃতি চর্চা এবং বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকলাম। সেখানে শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক থেকে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব, স্বেচ্ছাসেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা যোগ দিলেন। আমরা সমৃদ্ধ হতে থাকলাম। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নাট্যজনেদের সাথে আড্ডার মাধ্যমে নাট্যচর্চা বিষয়ক আলাপ আলোচনায় গড়ে উঠল একটা যোগসূত্র। আড্ডার পরিসর আরও বেড়ে কোলকাতা সহ গোটা রাজ্য ছাড়িয়ে অন্যান্য রাজ্যের নাট্যজগতের বহু গুণী মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা এগোতে থাকল। আমাদের দেশের থিয়েটারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে আলোচনায় এই সংকটে থিয়েটারের ভূমিকা, সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের ভূ মিকা, অতিমারীর প্রবল প্রকোপে ভয়ঙ্কর আর্থ সামাজিক এই পরিস্থিতিতে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ, মানুষের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ এইসব বিষয় নিয়ে নতুন আলোকে কথা হল। এই পর্যন্ত শিলিগুড়ি থিয়েটার আড্ডায় আমন্ত্রিত হয়ে প্রায় ১২৫ জন মানুষ যোগ দিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, অসিত বসু, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, গৌতম মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, মুরারী রায়চৌধুরী, পঙ্কজ মুন্সী, বাবু দত্ত রায়, অদ্রিজা দাশগুপ্ত, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, পরিমল ত্রিবেদী, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা বড়ুয়া, সুমন পাল, ওড়িষ্যার বিখ্যাত নাট্যব্যাক্তিত্ব সুবোধ পট্টনায়েক, হায়দ্রাবাদ থেকে সত্যব্রত রাউত, বাংলাদেশ থেকে প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ, সুদুর আমেরিকায় বসে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট নির্দেশক , অভিনেত্রী রোকেয়া রফিক বেবী, এসেছেন প্রখ্যাত নাট্য গবেষক আশীষ গোস্বামী এবং আরও অনেক মানুষ। এই মাধ্যমেই আমরা বিশেষ বিশেষ দিনে নানা ধরণের অনুষ্ঠানও করেছি। এরই পাশাপাশি, সময়ে সময়ে কখনো দীনবন্ধু মঞ্চের ঠিকাদারের অধীন অস্থায়ী কর্মীদেরপাশে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে দাঁড়ানো, বঙ্গ নাট্যসংহতির আমফান তহবিলে অর্থ প্রদান, ওড়িশার নাট্যচেতনার নাট্যগ্রামের মানুষদের পাশে থাকা, এমনকি দক্ষিণবঙ্গের বিশিষ্ট নাটককার যার সঙ্গে আমাদের কারুর সরাসরি কোন পরিচয়টুকু ছিলনা, শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে তাঁর সমস্যার কথা জেনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পাশে দাঁড়ানো, যদিও ওই বিশিষ্ট নাটককার কারও কাছেই নিজে থেকে কোন সহযোগিতা চাননি। এমনিভাবে সরাসরি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আরো অনেক কাজ হয়ে চলেছে। ২৮ মার্চ ২০২০ থেকে শুরু হয়ে এই আড্ডা নিয়মিতভাবে আজও চলছে। শিলিগুড়ি থিয়েটার আড্ডার উদ্যোগেই একটা বর্ধিত রূপ হিসেবে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের সব জেলার নাট্যজনেদের নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘উত্তরের থিয়েটারের আড্ডা’। যেখানে এই মুহূর্তে প্রায় ২০০ নাট্যজন সামিল হয়েছেন। ফলে উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে যোগাযোগ, আদানপ্রদান করোনা কালে আরও সুসংহত হয়েছে। আসলে এই অতিমারী পরিস্থিতিতে আমরা শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও সামাজিকভাবে সকলে একটা নাট্য সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। প্রবল সঙ্কটাপন্ন সময়েও থিয়েটার হয়তো এভাবেই তার চলার পথ খুঁজে পায়। হাতে হাত বেঁধে এগিয়ে চলে।

এদিকে এই সঙ্কটে সমস্ত ধরনের শিল্পচর্চার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা সম্মিলিত ভাবে ' শিলিগুড়ি আর্টিস্ট ফোরাম' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে সম্প্রতি। যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল শহরের দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে থাকা এবং এই বিষয়ে কিছু কিছু কাজ শুরুও হয়েছে।

এবার একটু অন্যদিকে তাকাই। সংকটের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে নাট্য নির্মাণ হচ্ছে, তা কি এই জ্যান্ত সময়কে কিছুমাত্র ধারণ করবার চেষ্টা করছে? বলে নেওয়া ভালো যে, এই সময়ের মধ্যেও শহরে নানা ধরণের বিষয় নিয়েই নাট্য নির্মাণ হয়েছে, তাই হবার কথা। তবে কখনও কখনও হয়ত সময়ই বাধ্য করে একেবারে সরাসরি চলমান সময়টাকে খামচে ধরতে। তা যদি না হয়, তবে শিল্পচর্চা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে যায়, বিশেষ করে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে। আমরা এই সময়কালে নির্মিত দু একটা নাটকের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি। যদিও একথা বলে নেয়া ভালো যে, খন্ডিতভাবে দুচার লাইন লিখিত সংলাপের শুষ্ক পাঠে যে অনুভূতি হয়, সেই একই সংলাপ এবং পূর্ণ একটি নাটকে অভিনেতার উচ্চারণে, থিয়েটারের সামগ্রিক আয়োজনে এক ভিন্ন ব্যঞ্জনা, এক ভিন্নতর অর্থ প্রকাশ করে। তবুও পাঠকের কাছে একটা সূত্র ঃ

সূত্রধরঃ এই ভাবে ২২ দিন চলার পর বিনোদ যখন এক রাজ্যের সীমানা পার করে আরেক রাজ্যে পা দেবে, তখন সে হাইওয়েতে লম্বা ব্যারিকেড দেখতে পায়। কিছু হাবিলদারকে দেখতে পেয়ে সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায়। বিনোদকে দেখে এক হাবিলদার জিজ্ঞেস করে, ''ক্যা রে, কিধার যা রাহা হে? পাতা নেহি হে ক্যা! পুরে দেশ মে লকডাউন চাল রাহা হে। জিধার সে আয়া হে উধার লট যা।''

বিনোদঃ সাব, হামলোগ মজদুর হে। হামে ঘর পউছনা হে। জানে দিজিয়ে না। জিধার রেহতা থা, উধার সে নিকাল দিয়া। অউর জাদা পায়সা ভি নাহি হে।

হাবিলদারঃ হাট রে শালা! দিমাগ মাত খা।

বিনোদঃ আপহি বাতাইয়ে কিধার যায়ে। উধার মেরে ঘর পে মেরা ইন্তেজার কর রাহা হে। যানে দিজিয়ে না স্যার।

হাবিলদারঃ ঠিক হ্যায়, তুঝকো ইধার সে যানা হে তো ইহা সে উস মোড় তক, ইয়ে ২০০ মিটার তেরেকো মেন্ডাক কি তারহা উছালকে জানা পরেগা।

বিনোদঃ সাব, চালতে চালতে মেরেমে তাকাত নেহি হে ।ইতনা জুলুম মত কিজিয়ে সাব।

হাবিলদারঃ দেখ দিমাগ মত ফিরাহ বোলা না, যা সাকতা হে তো যা, বারনা বাপাস যা।

সূত্রধরঃ বিনোদ ২০০ মিটার পার করে একটুও না থেমে আবার চলতে শুরু করে।

(নাটক।। পরিযায়ী/রচনা।।প্রসেনজিত সেন/প্রযোজনা।। ঋত্বিক)

(মুমূর্ষ এক ব্যক্তি পড়ে আছে, আর্তনাদ করছে। এক যুবক তাকে বাঁচানোর তাগিদে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগাযোগ করে চেতনা চায়। চেতনার স্টক না থাকায় সে জ্ঞান ইন্সটলেশানের আবেদন জানায়।)

যুবকঃ হ্যালো? হ্যালো? এটা কি চৈতন্য অপারেটর? আমি আনলিমিটেড চেতনা সাবস্ক্রাইব করতে চাই। আমার না চেতনার বড্ড অভাব পড়েছে। কি বলছেন? চেতনা নেই। ষ্টক শেষ। দাদা একটু দেখুন না? এই সময়ে। এই মুহূর্তের জন্য হলেও হবে। খুব চাপে আছি। কি বলছেন? ও জ্ঞান আছে। ফ্রি তে দেবেন? না না তা হয় নাকি! ও ভার্চুয়ালি পাঠাবেন। ইন্সটল করা খুব ঝামেলার। সবাই পারে না। আচ্ছা ইন্সটল হলে তারপর চার্জ নেবেন। আচ্ছা বেশ। পাঠান।

(ইন্সটলেশানের জন্য একজন আসেন, সঙ্গে ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সে ধাপে ধাপে নানা বিচিত্র প্রশ্ন করে, যুবক উত্তর দিতে থাকে।)

জ্ঞানঃ করছেন কি? করছেন কি? কোথায় যাচ্ছেন? সবে তো প্রথম ধাপ শেষ করলেন। এবার দ্বিতীয় ধাপ। ধর্মজ্ঞান। নিজের ধর্ম বলুন?

যুবকঃ আমার আবার ধর্ম কি? আমি মানুষ।

জ্ঞানঃ সেটা আবার কি রকম?

কোরাস ১ আমি প্যান্ট করি।

কোরাস ২ আমি ধুতি পরি।

কোরাস ৩ আমি লুঙ্গি পরি।

কোরাস ৪ আমি জোব্বা পরি।

কোরাসঃ ধর্মের ক্ষত আজ সমাজের বুকে/ বাজারি ঈশ্বরও ফতোয়ায় নাচে/ অন্ধ মানুষ মহামারীর অসুখে/ ধর্মের পা ধরে আজীবন বাঁচে।

জ্ঞানঃ গুড! আপনি দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন করেছেন। আর দুটো ধাপ বাকি। এবার তৃতীয় ধাপ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আপনার কি কি কাগজ আছে বলুন? মানে...নথিপত্র।

যুবকঃ কেন কাগজ দিয়ে কি হবে?

জ্ঞানঃ প্রমাণ হবে।

যুবকঃ কি?

কোরাস ১ আপনি কে।

কোরাস ২ আপনি কি।

কোরাস ৩ আপনি কখন।

কোরাস ৪ আপনি কেন।

যুবকঃ আমি মানুষ।

যুবকঃ আমার কোন কাগজ নেই।

কোরাসঃ কাগজ মানে কিছু লেখা/ কাগজ মানে কিছু ছবি/ কাগজ মানে কবিতা/ কাগজ মনের ভাবগতি।

জ্ঞানঃ আপনি পজিটিভ না নেগেটিভ?

যুবকঃ আমি... (ভাবে)

জ্ঞানঃ নেগেটিভ হলে বেঁচে গেলেন। পজিটিভ হলে নানা ঝামেলা। যেমন ধরুন-

কোরাস ১ শারীরিক দূরত্ব

কোরাস ২ মানসিক দূরত্ব

কোরাস ৩ সামাজিক দূরত্ব

কোরাস ৪ পারিবারিক দূরত্ব

যুবকঃ আমি দুটোই।

জ্ঞানঃ যেকোন একটা, দুটো দেওয়া যাবে না। নেগেটিভ মেরে দিন না। পজিটিভিটি তো পরে এই জ্ঞান দেবে।

যুবকঃ আপনি কি পজিটিভিটি দেবেন ? সামান্য একটা জ্ঞান দিতে পারেন না।

(নাটক।। জ্ঞান/ রচনা।। সায়ন্তন পাল/ প্রযোজনা।। উত্তাল) প্রসঙ্গত এই নাটকে প্রতিটি চরিত্রই মাস্ক পড়ে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই অভিনয় করেছেন। প্রযোজনা নির্মাণে স্বাস্থ্যবিধিকেই শিল্পের সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করার একটা চেষ্টা হয়েছে।

(কোরাসে একদল ছেলেমেয়ে কখনও সমবেত কখনও এককভাবে বলে যেতে থাকে)

- হ্যাঁ ওরা সেদিন পথ হেঁটেছিল।

- এক দুই তিন করে একশো, পাঁচশো, হাজার।

- পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার।

- তারপর সংখ্যাটা লক্ষ অঙ্কে পৌঁছে গিয়েছিল।

সমবেত- ওরা হেঁটেছিল। পথ হেঁটেছিল।

- এই লাখো মানুষের মধ্যে ছিল

- ঢেনকাবাড়ী চা বাগানের মানুষ সোমরা বড়াইক।

- ঘরে বউ আর তার শরীরে একটা বাচ্চা রেখে চা বাগান লক আউটের পর

- রাজধানী দিল্লী শহরে সোমরা মজুর খাটতে গিয়েছিল। (মঞ্চে তখন নির্মাণ কাজের মাইম চলছে)

- চা গাছে নতুন 'জনম' আসে, সোমরার ঘরেও একটা জনম এসেছে। বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল সোমরা। দিল্লীর মালিক ছাড়েনি।

বলে - নেহি অভি নেহি, বহুত কাম বাকী হ্যায়। কিন্তু তারপর ?

সমবেত , লকডাউন , লকডাউন , লকডাউন , লকডাউন - লকডাউন।

- তারপর অনেক মানুষের সাথে সোমরা বড়াইক দিল্লী থেকে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল।
- কারণ দুদিন আগে যে মালিক বাচ্চার মুখ দেখার জন্য ছুটি দেয়নি
- দুইমাস পর সেই মালিকই সোমরাদের ছাঁটাই করে দিয়েছিল। কারণ -
সমবেত , লকডাউন , লকডাউন , লকডাউন , লকডাউন - লকডাউন।

(নাটক।।পথ কতদূর/ রচনা।।কুন্তল ঘোষ/ প্রযোজনা।।শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমি)

(করোনা পরিস্থিতিতে মালিক কর্মী ছাঁটাইতে বাধ্য হয়েছে। মালিক ও কর্মীদের কথোপকথন)

কোরাস ২ ঃ স্যার এই লকডাউন পিরিয়ডে কে দেবে ওকে চাকরি ? তার মধ্যে ও প্রতিবন্ধী।

কোরাস ৩ ঃ সেদিকটা বিবেচনা করেই এটুকু দয়া করুন স্যার।

কোরাস ১ ঃদেখুন আপনাদের কথা সব বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কোন উপায় নেই, তাছাড়া শুধু তো সনাতন নয়। ওর সঙ্গে আরো চোদ্দজনকে টার্মিনেশান নোটিস ধরাতে হয়েছে।

কোরাস ২ ঃ ওদের জন্য তো কিছু বলছিনা আমরা, কিন্তু এই কথা না বলতে পারা লোকটা কোথায় যাবে বলুন ? কে ওকে সাহায্য করবে ?

কোরাস ৩ ঃ হয়তো ওকে শেষপর্যন্ত সুইসাইড করতে হবে।

কোরাস ১ ঃ তাতে আমার কি করার আছে ? এই কোম্পানিটা আপনাদের চালাতে হলে বুঝতেন আমার এখন কি পজিশন, মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

কোরাস ২ ঃ ঠিক আছে স্যার। আপনাকে আর বলতে হবে না। আপনাকে যে নাড়ানো যাবে না বেশ বুঝতে পারছি। এক মিনিট স্যার। (কি একটা আলোচনা করে মাইমে।)

কোরাস ৩ ঃ স্যার আমাদের একটা প্রস্তাব আছে।

কোরাস ১ ঃ না, না আমি কোন প্রস্তাব-টস্তাব শুনতে রাজি নই। সনাতন রায়কে নিতে আমি রাজী নই।

কোরাস ২ ঃ রাজী আপনাকে হতেই হবে স্যার। তবে তার জন্য আপনাকে আর্থিক দায়ভার নিতে হবে না।

কোরাস ১ ঃ মানে ! চাকরি করবে অথচ মাইনে নেবে না ?

কোরাস ৩ ঃ না, না, নেবে নাহলে আর চাকরি করবে কেন ?

কোরাস ২ঃ (কোরাস ৩-এর দিকে তাকিয়ে বলে) বলি তাহলে ওনাকে?

কোরাস ৩ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

কোরাস ১ কি সব হেঁয়ালি শুরু করলেন?

কোরাস ২ কোন হেঁয়ালি নয় স্যার। আপনি আমাদের দুজনকে বারো হাজার করে দেন, সামনের মাস থেকে আমরা ন'হাজার করে নেবো। আমাদের দু'জনের বাদ বাকি তিন - তিন ছ'হাজার সনাতনকে দেবো।

(সনাতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে সব শোনে , কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পরতে চায়।)

কোরাস ১ কি বলছেন এসব পাগলের মতো? এতকম টাকায় সারামাস চলবে আপনাদের?

কোরাস ৩ চলবে স্যার, না চললেও চালিয়ে নিতে হবে।

কোরাস ২ স্যার করোনাকালের সময়, আমাদের ভাবতে শেখাচ্ছে শুধু নিজের জন্যে বাঁচা নয়, সবাইকে নিয়ে বাঁচার নামই জীবন। তাছাড়া, অনেক অপ্রয়োজন, আমাদের দিন যাপনের সঙ্গী হয়েছে। সেগুলো ছেঁটে ফেলার বার্তাও দিচ্ছে এই সময়।

নাটক।।অন্ধকারের আলো/ রচনা।।পার্থ চৌধুরী/ প্রযোজনা।।দামামা

(কোরাসে বলতে থাকে সবাই)

মধ্যরাতের মায়া-জাল জোছনায়/ পাখসাট মারে ঈগল-বাজের দল,/পরিযায়ী পাখি বদলানো আয়নায়/পথ পাড়ি দেয় মানুষের কোলাহল।/ খিদের জ্বালায় মরে যায় শিশু পথে,/ তবু বাপ-মা থামেনা হাঁটে/পথ ,প্রান্তরে-অরন্য চষে ফেলে, থামেনা কোথাও পাড়ি দেয় দূর বাটে।/ দাঁতে দাঁত চেপে আঁকড়ে বুকের মাঝে/ চলে সবেধন ছেলের লাশের সাথে।/রসদ পথের নেই যে তাদের হাতে/পেটেতে ক্ষুধার আগুন,/পথেতে লুটায় শ্রমিক/ নাগরিক এবার ভাবুন,/ এত অন্যায় অনাচারে/সময় এসেছে, জাগুন।

(নাটক।।এখন অন্ধকার/ রচনা।।পার্থ চৌধুরী/ প্রযোজনা।। দামামা)

পরিশেষে বলা ভাল, এই লেখা খন্ডিত। যে সময়কাল নিয়ে এই লেখা লিখছি, সেই বিপন্নতার সময় এখনও

বহমান এবং ভয়ঙ্কর। সবটাই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা, কোথায় গিয়ে এর শেষ আমরা কেউই জানিনা। ফলে এই সময়কে নিয়ে, শহরের মানুষকে নিয়ে, তাঁর শিল্পচর্চা নিয়ে আরও নতুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন কোন কথা উঠে আসবে কিনা, সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু দীর্ঘ এই রোগাক্রান্ত সময়কে বইতে বইতে অনেকেই শুনছি গভীর অবসাদে চলে যাচ্ছেন। থিয়েটারের অনেক মানুষও দেখছি ভাবছেন, আর কি ফেরা যাবে? বিকল্প হিসেবে ডিজিটাল মাধ্যমেই ভরসা রাখতে চাইছেন। কিন্তু থিয়েটার তো মানুষের মুখোমুখি মানুষ। জ্যান্ত দেয়া নেয়া। থিয়েটারে ডাইলেটিক্সের কথা উঠেছিল। এই সময়ে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে যে দূরত্বের দিনলিপি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ঠিক তার উল্টো দিকে, সেই ব্যাবধান অতিক্রম করে রচিত হচ্ছে আত্মিক মেলবন্ধনের নতুন সংজ্ঞা। যে চূড়ান্ত অসমতা মানুষের অধিকারে, জীবন জীবিকায় ক্রমশ আধিপত্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে, তার মধ্যেই হয়ে চলেছে সেই বৈষম্য নিবারণের কাজ। আবার একে অপরের প্রতি চরম উদাসীনতার বিপরীতেও রয়েছে পারস্পরিক চেতনার হাতছানি। নিজেদের জীবন বাজি রেখে আর্ত মানুষদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে কতশত মানুষ। আমাদের জীর্ণ সামাজিক কাঠামোয়, মানুষের এই পারস্পরিক সহযোগ নিঃসন্দেহে টাটকা বাতাস। এই প্রাণশক্তি নিয়েই আমরা নিশ্চিত উঠে দাঁড়াব। বিশ্বাস করি জীবন আবার স্বাভাবিক হবে। বিশ্বাস করি দ্রুত মঞ্চের দরজাগুলো খুলে যাবে, অন্ধকার মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠবে, মানুষের কলরোলে ভরে উঠবে আমাদের থিয়েটার, আমাদের জীবন।

মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই আমাদের বুঝিয়ে দেয়
জীবনের উদ্দেশ্যটা কি। — উৎপল দত্ত

শিলিগুড়ির সিন্ধি সমাজ

সুজিত ঘোষ

দেশভাগের উত্তরপর্বে ছিন্নমূল একটি জাতি তথা সম্প্রদায় হল সিন্ধি। সিন্ধি নামটির উৎপত্তি হয়েছে ভ্রকাদা প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে। অখণ্ড ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের একটি প্রদেশ ছিল সিন্ধু। মহাভারতের যুগে সিন্ধু শাসক ছিলেন জয়দ্রথ। আরব কর্তৃক সিদ্ধু অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সিন্ধুর শাসক হিসেবে মোসাক রাজু, চাচ ও দাহির বিশেষ খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন *(কাউসেন হেনরী)*। সিন্ধুনামটি সংস্কৃত সূত্র সুভিয়ার সঙ্গে জড়িত। জৈন সূত্রে সিন্ধু অঞ্চলকে ম্লেচ্ছ অঞ্চল বলা হলেও পরবর্তীতে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আর্য নামে পরিচিত হয় *(রমিলা থাপার)*। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সিন্ধু অঞ্চল বোম্বে প্রেসিডেন্সির অংশ ছিল *(সি. জে. দসওয়ানি)*। এই প্রদেশের একটি ছোট অঞ্চলে বসবাসকারী ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠীর লোকেরা সিন্ধি নামে পরিচিত। বেনিয়া জাতি সিন্ধিদের মুখ্য পেশা ব্যবসা। এরা প্রাচীন ভারতের এক সুসভ্য জাতির বংশধর। প্রাচীন যুগে সিন্ধিরা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিল এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। খ্রীঃ পূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতে যে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল সিন্ধুঅঞ্চল।

ভারত বিভাগের ফলে সিন্ধুপ্রদেশ পাকিস্তানের করতলগত হওয়াতে প্রাচীন ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠীর বংশধর সিন্ধিরা স্বভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং বাস্তুহারা হয়ে অভিবাসিত হয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। ভারত বিভাগের সময়কালে ভারতে সিন্ধি জনসংখ্যা ছিল ৭৭৬২৯ জন *(সুষুমা কে, কাটারিয়া)*। ২০০১ সালে ভারতে সিন্ধি জনসংখ্যা ছিল ২৫৩৫৪৩৫ জন এবং ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে সিন্ধি জনসংখ্যা হল ২৭৭২৩৬৪ জন *(সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া-২০১১)*। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিন্ধিদের সংখ্যা আনুমানিক ৩০ হাজারের মতো। এর মধ্যে ২৫ হাজারেরও বেশি বসবাস করে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে *(বর্তমান, ২৯শে জুন, ২০০৩)*। শিলিগুড়িতে বসবাসকারী সিন্ধিদের সংখ্যা আনুমানিক দু'শোর মতো। সিন্ধু অঞ্চল থেকে ভারতে অভিবাসিত হওয়ার পর সিন্ধিরা সিন্ধি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য দাবী জানিয়ে আসে এবং অবশেষে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে তা মান্যতা পায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে বহু রাজনৈতিক ঝড় সিন্ধুর উপর দিয়ে বয়ে গেছে। হাক্কামনি, গ্রীক, ইন্দোগ্রীক,শক,আরব,গজনী এবং সর্বোপরি দিল্লী সুলতানদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে সিন্ধুবাসীরা,তবে তা কখনোই দেশ ত্যাগের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় কারণে ভারত বিভাজন ও সিন্ধুপ্রদেশ পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হলে হিন্দু সিন্ধিরা স্বভূমি ত্যাগ করে আভিবাসিত হয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এরা খুঁজে নেয় স্থায়ী আশ্রয়স্থল। আর

এই ভাবে স্বাধীনোত্তরকালে ধীরে ধীরে শিলিগুড়িও সিন্ধি জনগোষ্ঠীর একটি আবাসভূমি হয়ে ওঠে।

শিলিগুড়ির সিন্ধি জনসংখ্যা শিলিগুড়ির মোট জনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও প্রবাসী এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টা ও শ্রমশীলতায় কিভাবে নবরূপে ব্যবসা বৃত্তিকে আশ্রয় করে শিলিগুড়িতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অবশ্যই উল্লেখ করার মতো। অন্যদিকে সিন্ধিরা ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠীর তথা খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে গড়ে ওঠা সুমহান সিন্ধু সভ্যতার নবপ্রজন্ম। তাই ইতিহাসের দিক থেকে সিন্ধিদের সমন্ধে আলোচনার একটা গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাণিজ্যিক সুনাম ও সমৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশের বণিকদের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল বাংলা তথা উত্তরবঙ্গ। প্রাচীনকালে সময়ের পরিবর্তনে অখণ্ড উত্তরবঙ্গ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর,পুন্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি নামে খ্যাত ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের মাধ্যমে প্রাচীনকালে আসাম ও প্রতিবেশি দেশগুলির সাথে উত্তরবঙ্গের ব্যাপক বাণিজ্য চলত। আসাম-বার্মা বাণিজ্য পথ যেটির সূচনা পাটলিপুত্র নগর থেকে তা পুন্ড্রবর্দ্ধনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত ছিল *(এন.এন. আচার্য)*। অজ্ঞাত গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস অব্ দি এ্যারিথারিয়ান সি' গ্রন্থে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং হয়ে সিকিম ও চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়ে তিব্বত ও চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুঘল যুগে ভূটান, তিব্বত, আসাম ও লাসার সাথে তরাই অঞ্চলের পাদদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা জানা যায় *(ধর্মকুমার ও তপন রায়চৌধুরী)*। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল প্রসারে বাংলায় সমাগম ঘটে বিদেশী বণিকদের ও সেইসঙ্গে বাঙালি ও অবাঙালি বণিকরা হয়ে ওঠে বাংলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর অনুপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গে ক্রমশঃ বৃহত্তর মাড়োয়ার, বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধ প্রভৃতি ব্যবসা ক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসে *(হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)*। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার ফলে বাংলার অন্যান্য স্থানে কায়স্থ শ্রেণীর ব্যবসায় যেমন অগ্রগতি ঘটেছিল, এ অঞ্চলে কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। শিলিগুড়ি এবং তার পাশ্ববর্তী এলাকায় সে সময় ব্যবসায় বাঙালিদের জয়জয়কার ছিল না। কয়েকটি ধানকল,তেলকল এবং কাঠের ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল শিলিগুড়ির বাঙালিদের ব্যবসা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ব্যবসায় বাঙালির ধনভাণ্ডারের স্বল্পতা,সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন এবং সর্বোপরি ব্যবসা সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালির অনীহা প্রভৃতি আর্থ- সামাজিক পটভূমিতে উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়িতে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের সমাগম আশ্চর্যের কিছু নয়।

এক রাজনৈতিক পটভূমিকায় উপমহাদেশ বিভাজনে ভারতে সিন্ধি অভিবাসন ঘটেছিল। তবে কেবল রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ফলশ্রুতি নয়, দেশ বিভাজনের বহু পূর্বেই ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ব্যবসায়ী সিন্ধিরা প্রবেশ করেছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে তথা বঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে *(সি.জে. দসওয়ানি)*।১৮৪৯ সালে সিন্ধি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়লে বহু সিন্ধি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সিন্ধুপ্রদেশে ব্যবসা চালানো কষ্টকর হয়ে উঠলে ভাগ্য

পরিবর্তনের আশায় তারা সিন্ধুপ্রদেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে। সেই সূত্রে ১৮৮০ সালে বাংলায় প্রথম সিন্ধি অভিবাসন ঘটেছিল এবং সম্ভবত কলকাতার লালচাঁদ ছিলেন বঙ্গে অভিবাসিত প্রথম সিন্ধি *(বর্তমান, ২৯ জুন, ২০০৩)*। উত্তরবঙ্গে প্রথম সিন্ধি অভিবাসন ঘটেছিল ১৯৫২ সালে বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা শহর রায়গঞ্জে মঙ্গলময় সিন্ধি ও তার ভাই বেলামল সিন্ধির রায়গঞ্জে ভাগ্যপরিবর্তনের উদ্দ্যেশে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে (সাক্ষাৎকার মঙ্গলময় সিন্ধি, ২০০১)।

দেশ ভাগের উত্তর পর্বে বাংলা এবং উত্তরবাংলায় ব্যাপক ভাবে সিন্ধি অভিবাসন ঘটে। আজকের উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার,দার্জিলিং এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় সিন্ধি অভিবাসন ঘটেছে। তবে দেশ বিভাগের ফলে তারা কিন্তু কেউই সরাসরি উত্তরবঙ্গে আসেনি। পাকিস্তানের করাচী বন্দর থেকে তারা জলজাহাজে বোম্বে এসে উপস্থিত হন এবং বোম্বের সরকারি শিবির কল্যাণ ক্যাম্প এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তারা কেউ মধ্যপ্রদেশ,কেউ উত্তরপ্রদেশ, কেউ মহারাষ্ট্র, কেউ রাজস্থান, কেউ আগ্রা,কেউ বেনারসে পাড়ি দেন। পরবর্তীতে ঐ সকল স্থান থেকে তারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তথা উত্তরবঙ্গে এবং শিলিগুড়িতে এসে উপস্থিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে তারা ভারতের কোনও একটি নিদিষ্ট অঞ্চলে বা প্রদেশে অভিবাসিত না হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বা প্রদেশে অভিবাসিত হয়েছিলেন। সিন্ধিরা সহজেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে একটি নিদিষ্ট অঞ্চলে বা প্রদেশে সকলে অভিবাসিত হলে তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। দেশ বিভাগের উত্তর পর্বে শরনার্থী হিসাবে কর্মসংস্থানের জন্য তাদের তীব্র পেশা সংকটের সন্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ দেশভাগ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতে তাদের না ছিল কোন বড় ব্যবসা এবং না ছিল যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন।

১৯৫৩ সাল থেকে শিলিগুড়িতে সিন্ধিরা বসবাস করছেন *(সাক্ষাৎকার আত্মারাম আডবাণী, ২০২১)।* আত্মারাম আডবাণী শিলিগুড়িতে অভিবাসিত বা বসবাসকারী প্রথম সিন্ধি জনগোষ্ঠীর লোক। ১৯৪১ সালে এক রাজনৈতিক গোলযোগে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় আত্মারাম সিন্ধু প্রদেশ থেকে করাচী বন্দর হয়ে কানপুরে এসেছিলেন। সিন্ধু প্রদেশে তার ক্যানফেকশনারি ব্যবসা অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের লজেন্স,মিঠাই ইত্যাদির ব্যবসা ছিল। কানপুরে এসে তিনি ক্যান্‌ফেক্‌শনারি ও সেই সঙ্গে মিষ্টির ব্যবসা শুরু করেন। প্রায় এক যুগ কানপুরে থাকার পর ব্যবসায় ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ১৯৫৩ সালে তিনি শিলিগুড়িতে এসে উপস্থিত হন। শিলিগুড়ির খালপাড়া এলাকায় শুরু করেন নতুন করে ক্যান্‌ফেক্‌শনারি ব্যবসা অর্থাৎ লজেন্স, বিস্কুট মিঠাই এইসকল ব্যবসা করে তিনি ধীরে ধীরে শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বর্তমানে আত্মারামের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় তার পুত্র কিশোর আডবাণী এবং গোবিন্দ আডবাণী শিলিগুড়ির সুপ্রতিষ্ঠিত সিন্ধি ব্যবসায়ী। ক্যান্‌ফেক্‌শনারি ব্যবসা

ছাড়াও আত্মারামের পুত্রদ্বয় প্রিন্টিং এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের যোগানদারী ব্যবসার সাথে যুক্ত। কিছুদিনের মধ্যে আত্মারামের সমসাময়িক লছ্মনদাস আডবাণী শিলিগুড়িতে আসেন এবং তিনিও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হন। বর্তমানে লছ্মনদাসের পুত্র কভি আডবাণী লজেন্স এবং নিমকি ফ্যাক্টরি ব্যবসায় শিলিগুড়িতে বেশ নাম করেছে। পরবর্তীতে আত্মারাম ও লছ্মনদাসকে অনুসরণ করে একে একে বহু সিন্ধি জনগোষ্ঠীর মানুষ শিলিগুড়িতে অভিবাসিত হয়েছেন। এদের মধ্যে কানাইয়ালাল সিতলানী ইটভাটা ব্যবসা ও কণ্ট্রাকটারী ব্যবসায় বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বর্তমানে শিলিগুড়ির ইটভাটা ব্যবসায় অজিত কাসওয়ানী ও রাকেশ কাসওয়ানী দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। বর্তমানে ব্যবসা থেকে অবসর নেওয়া রেলওয়ে কণ্ট্রাকটর দিলীপকুমার ক্ষেত্রি ১৯৮৮ সাল থেকে শিলিগুড়িতে বসবাস করছেন। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ধানবাদ থেকে পুরুলিয়া হয়ে অবশেষে তিনি শিলিগুড়িতে এসে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্তমানে শিলিগুড়িতে সিন্ধিদের মধ্যে ৭ থেকে ৮টি পরিবার রেলওয়ে কণ্ট্রাকটারী ব্যবসার সাথে যুক্ত। দিলীপকুমার ক্ষেত্রির বাবা এবং ঠাকুরদার পুরুলিয়াতে ইটভাটা ব্যবসা ছিল। একথা উল্লেখ করতে হয় যে ইটভাটা ব্যবসার প্রতি সিন্ধিদের একটা ঝোঁক আছে। লক্ষ্য করা যায় যে পশ্চিমবাংলা তথা উত্তরবাংলায় এরা যেখানে যেখানে বসবাস করছে প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই ইটভাটা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে। একসময় কলকাতায় ইটভাটা ব্যবসা সিন্ধিদের একচেটিয়া ছিল *(বর্তমান, ২৯ শে জুন, ২০০৩)*। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে ইটভাটা ব্যবসা সিন্ধিদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন। ইটভাটা ব্যবসার সাফল্য হয়তো তাদের অজ্ঞাত কর্মকুশলতা কাজ করে থাকতে পারে। কারণ সিন্ধি-প্রজন্ম তো সিন্ধু সভ্যতারই উত্তরসুরী, যে সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল পোড়া ইটের ব্যবহার। একসময় সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা যে উন্নত মানের পোড়া মাটির ইট তৈরি করতে জানতো তেমনটি আর বিশ্বের অন্য কোন অঞ্চলের মানুষ সে সময় পারতো না। কানাইয়ালাল সিতলানীর পুত্র মোহনলাল সিতলানী শিলিগুড়ির একজন প্রতিষ্ঠিত সিন্ধি ব্যবসায়ী। শিলিগুড়িতে তিনি হোটেল ব্যাবসার সাথে যুক্ত। শেঠ ওটনমল শিলিগুড়িতে কণ্ট্রাকটারী ব্যবসায় একজন প্রতিষ্ঠিত সিন্ধি ব্যবসায়ী। আর একজন, বর্তমানে প্রয়াত, উল্লেখযোগ্য সিন্ধি ব্যবসায়ীর নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন রাধাকৃষ্ণ রায়তানী। রাধাকৃষ্ণ কণ্ট্রাকটারী ব্যবসার সাথে সাথে প্রমোটিং ব্যবসায় শিলিগুড়িতে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে কভিশ আডবানী গুজরাট থেকে আসামে এসেছিলেন। আসামে তার জামাকাপড়ের পাইকারী ব্যবসা ছিল। আসামে ব্যবসায় সফলতা না আসায় তিনি ২০০২ সালে আসাম থেকে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় শিলিগুড়িতে উপস্থিত হন। শিলিগুড়িতে নূতন করে জামাকাপড়ের পাইকারী ব্যবসা শুরু করে সাফল্য লাভ করেন। বর্তমানে শিলিগুড়িতে সিন্ধিদের মধ্যে ৯টি পরিবার জামাকাপড়ের পাইকারী ব্যবসা ও খুচরো ব্যবসার সাথে যুক্ত। শিলিগুড়িতে ক্যন্‌ফেক্‌শনারি, ডালমুট ফ্যাক্টরী, ইটভাটা ব্যবসা, কণ্ট্রাকটারী, প্রমোটিং এবং জামাকাপড়ের ব্যবসা ছাড়াও এরা নানারকম পাইকারী ব্যবসার

সাথেও যুক্ত। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড চা বাগিচা ব্যবসার সাথে এরা নিজেদের এখনও যুক্ত করে তুলতে পারে নি। তবে চা বাগিচা ব্যবসার সাথে যুক্ত না থাকলেও শিলিগুড়িতে চা এর পাইকারী ব্যবসার সাথে এরা যুক্ত। দীপক মুলচান্দানী শিলিগুড়িতে একজন সিন্ধি পাইকারী চা ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাত। সিন্ধিদের মুখ্য পেশা ব্যবসা হলেও এদের অনেকেই আজ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছেন। তবে শিলিগুড়িতে সিন্ধিরা এখনও নিজেদের ব্যবসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। শিলিগুড়ির সিন্ধিদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কিন্তু কম নয় তবুও এরা পারিবারিক বা পরিচিত ব্যবসা ছেড়ে চাকুরী কিংবা অন্য পেশায় যেতে তেমন আগ্রহী নয় *(সাক্ষাৎকার দিলীপ কুমার ক্ষেত্রী, ২০২১)*। অন্যদিকে শিলিগুড়ির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা বৃহৎ কোন উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হলেও প্রভূত পরিমাণ আর্থিক সংগতি না থাকায় তা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

সংস্কৃতি মনাভোবাপন্ন সিন্ধিদের ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিশেষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি প্রাচীন সিন্ধুবাসীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বভূমি ত্যাগ করলেও সিন্ধিরা এখনও সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি। পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গে বসবাস করলেও এদের বৎসর বাংলা বৎসরের বৈশাখ মাস দিয়ে শুরু হয় না, শুরু হয় চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিন থেকে। বাঙালিদের রামকৃষ্ণ,বামদেব,লোকনাথবাবা এবং চৈতন্য দেবের মতো ঝুলেলাল সমগ্র সিন্ধি সমাজের আরাধ্য দেবতা ও অবতার রূপে পূজিত হন। ঝুলেলালকে কেন্দ্র করে সিন্ধি সমাজে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের বড় বড় বাণিজ্য তরী নিয়ে জলপথে বাণিজ্যের যেমন উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনই সিন্ধি কাহিনী ও কিংবদন্তিতে জলপথে বাণিজ্য করতে গিয়ে সিন্ধিদের বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখিন হওয়া এবং অবশেষে ঝুলেলালের কৃপায় রক্ষা পেয়ে গৃহে ফিরে আসা এমন বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। শুক্রবার সিন্ধিদের কাছে খুবই পবিত্র দিন। কারণ ঝুলেলালের জন্ম শুক্রবার। প্রতি বছর ঝুলেলালের জন্ম দিনকে এরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধুমধাম করে পালন করে চটি চাঁদ উৎসবের মাধ্যমে।

ঝুলেলাল মুখ্য দেবতা হলেও ধর্মের ব্যাপারে কিন্তু সিন্ধিদের মধ্যে কোন কঠোরতা কিংবা গোঁড়ামী নেই বরং যে অঞ্চলে এরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে সেখানকার হিন্দু ধর্মকে আপন করে নিয়েছে *(সি.জে. দসওয়ানি)*। হিন্দুদের উপাস্য কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, নারায়ণ, গনেশ, সরস্বতী সকল দেবতারই এরা উপাসনা করেন। তবে উত্তরবঙ্গে সিন্ধিদের ধর্মাচারণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বৃক্ষপূজা, গরু ও ষাড়ের প্রতি ভক্তি এবং গৃহের মূল প্রবেশ পথে মাঙ্গলিক চিহ্ন 'স্বস্তিক'এর ব্যবহার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সিন্ধু সভ্যতার এই প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতিগুলি সিন্ধিরা এখনও সযত্নে অনুসরণ করে চলেছে। সিন্ধি সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এরা বিধবা বিবাহ নিজ পরিবারের মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠী সিন্ধিরা এ ক্ষেত্রে আর্যসমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে

ঋকবৈদিক যুগে সন্তানহীনা বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করার যে প্রথা ছিল আজও তা অনুসরণ করছে।

প্রথাগত ভাবে সিন্ধি সমাজ দুভাগে বিভক্ত - আমিল বা শিক্ষিত শ্রেণী এবং ভৈবন্দ বা ব্যবসায়ী শ্রেণী। বর্তমানে শিলিগুড়িতে ৫০টি সিন্ধি পরিবার রয়েছে , সকলেই ব্যবসার সাথে যুক্ত *(সাক্ষাৎকার, দীপক মুলচানদানী, ২০২১)*। সিন্ধি সমাজ বিভিন্ন কর্মভিত্তিক শ্রেণী যেমন ধোপা, নাপিত প্রভৃতি পেশাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সিন্ধিদের কাছে কোন পেশাই ছোট নয়। তবে ভিক্ষাবৃত্তি সিন্ধি সমাজে নিন্দনীয়। উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়িতে সিন্ধিদের মধ্যে ধোপা, নাপিত প্রভৃতি পেশাভুক্ত লোক নেই। অন্যদিকে সিন্ধিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণী থাকলেও তা খুবই কম। কলকাতায় কেবলমাত্র পাঁচটি সিন্ধি ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, তবে উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়িতে কোন সিন্ধি ব্রাহ্মণ নেই। সিন্ধিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণী কম থাকার পিছনে ঐতিহাসিক কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে সিন্ধুর হিন্দু শাসকদের প্রধান পরামর্শদাতা ছিল ব্রাহ্মণ শ্রেণী। আলেকজান্ডারের সিন্ধু অভিযানের সময় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পরামর্শেই সিন্ধুর শাসক মোসাক রাজু আলেকজান্ডারের আক্রমণকে প্রতিরোধ করেছিলেন। ফলে ক্রুদ্ধ আলেকজান্ডারের নির্দেশে নির্বিচারে সিন্ধুর ব্রাহ্মণদের হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে মহম্মদ বিনকাশিম কর্তৃক সিন্ধু অধিকারের সময়ও সিন্ধুর শাসকদের প্রধান পরামর্শদাতা বহু ব্রাহ্মণ প্রাণ হারিয়েছিল। এই সকল কারণে সিন্ধিদের মধ্যে পরবর্তীতে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কমে যায়।

বিবাহ সিন্ধি সমাজের অন্যতম উৎসব। পূর্বে বিবাহের ব্যাপারে সিন্ধিদের মধ্যে কঠোরতা থাকলেও পরবর্তীতে সিন্ধি সমাজে বিবাহে অনেকটাই শিথিলতা এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অতীতের কংগ্রেস নেতা জে. বি. কৃপালনি বিবাহ করেছিলেন বঙ্গতনয়া সুচেতা মজুমদারকে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করেছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনি। শিলিগুড়ি এবং রায়গঞ্জে সিন্ধি বাঙালি বিবাহের বহু নজীর মেলে। সাধারণত বৈদিক মতে অথবা গ্রন্থসাহেব সামনে রেখে বিবাহ কর্ম সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় নববিবাহিতা নারীদের মাথা ও মুখ ওড়না দিয়ে ঢাকা থাকে এবং নাকে অবশ্যই নাকছাবি ব্যবহার করতে হয়। সিন্ধি সমাজের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল বিবাহের পর পুত্রকে ব্যবসার একটি অংশ হস্তান্তরিত করে তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়। তবে এ রীতি বা প্রথা পারিবারিক অশান্তির আশঙ্কায় নয় - ব্যবসায় যাতে সে স্বনির্ভর ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ জীবিকায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে সেই পথকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইউরাপে ও পূর্ব এশিয়ার মতো সিন্ধি সমাজে পেশা সাফল্যই মুখ্য বিষয়, জন্মকৌলিন্য নয় এবং পেশা মুখ্য হওয়াতে সিন্ধি সমাজের একজন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে *(সি. জে. দসওয়ানি)*।

সিন্ধিরা সাহিত্য প্রেমিক, তবে ১৯২০ সালের পূর্বে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সিন্ধি সাহিত্য প্রকাশিত হয়নি *(এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)*। নৃত্য, গীত, অভিনয় এবং সাহিত্যে কলকাতায় একাধিক সিন্ধি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৯৭ সালে কলকাতার লক্ষীচাদ থাইলানি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। বাংলা চলচ্চিত্রে সিন্ধি যুবক

জিৎ মালদানি বেশ নাম করেছে। তবে সিন্ধিরা সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ হলেও শিলিগুড়িতে সিন্ধিদের সাহিত্যপ্রেম তেমন লক্ষ্যণীয় নয়। সিন্ধু অঞ্চলের লিখিত ভাষা ছিল পারসী ও আরবী। তবে হিন্দু সিন্ধিরা লিখিত ভাষা হিসাবে ব্যবহার করত দেবনাগরী ভাষা এবং কথ্য ভাষা হিসাবে ব্যবহার করত সিন্ধি ভাষা। শিলিগুড়ির সিন্ধিদের মধ্যে বর্তমান প্রজন্ম খুব কম সংখ্যক আজ সিন্ধি ভাষা ব্যবহার করে। বাংলার সাথে হিন্দি ও ইংরাজীকে এরা কথ্য এবং লিখিত ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। নবপ্রজন্মের খুব কম সংখ্যকই মাতৃভাষা তথা সিন্ধি ভাষা না জানার চিত্র শুধু শিলিগুড়িতে নয় ভারত তথা বিশ্বের যেখানে যেখানে সিন্ধিরা বসবাস করছে সর্বত্র। ২০০৬ সালে বোম্বেতে সারা ভারত সিন্ধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গ থেকে এই সম্মেলনে সিন্ধি প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলেন বর্তমানে প্রয়াত শিলিগুড়ির রাধাকৃষ্ণ রায়তানি। কলকাতায় সিংহভাগ সিন্ধি সম্প্রদায় বসবাস করার ফলে গড়ে উঠেছে সিন্ধি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, সিন্ধি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন, সিনিয়র সিন্ধি সোসাইটি। কলকাতায় সিন্ধিদের একত্রিত হওয়ার মূলকেন্দ্র ৬১ নং পার্ক স্ট্রীট- এর সিন্ধি পঞ্চায়েত। এখানে সিন্ধিদের সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে উত্তরবঙ্গে সংস্কৃতি, সাহিত্য এমনকি সামাজিক ভাবে সিন্ধিরা সংগঠিত নয়। শিলিগুড়িতে বসবাসকারী সিন্ধিদের মধ্যে দু-একজন বিশেষ করে বর্তমানে প্রয়াত রাধাকৃষ্ণ রায়তানি সিন্ধিদের সংগঠিত করে উত্তরবঙ্গ সিন্ধি সমাজ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন *(সাক্ষাৎকার, রাধাকৃষ্ণ রায়তানি, ২০০৭)*। তবে ব্যবসার কর্মব্যস্ততা এবং এ বিষয়ে তাদের উদাসীনতা ও তেমন আগ্রহ না থাকায় সংগঠিত হয়ে গড়ে ওঠেনি উত্তরবঙ্গ সিন্ধি সমাজ। তবে খুবই সাম্প্রতিক শিলিগুড়ির নবপ্রজন্মের সিন্ধি যুবকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুটা সচেতনতা ও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দীপক মুলচানদানী, অমিত মানধ্যানী, অনু বাসানদানী, নিশান্ত ক্ষেত্রি প্রমুখ সিন্ধি যুবকদের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে শিলিগুড়ি সিন্ধি সেবা সমিতি। এই সমিতির সম্পাদক দীপক মুলচানদানী সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে তাদের সমিতি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে প্রতিদিন ১৫০ জন লোকের খাদ্য দান করে চলেছেন। ভবিষ্যতে এই সমিতি আরোও নানা রকম সেবামূলক কাজ করতে আগ্রহী। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ সুমহান সিন্ধু সভ্যতার ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠীর তথা সম্প্রদায়ের উত্তরসূরীরা শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে তথা সাত দশক থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তা শিলিগুড়ির ঐতিহ্য ও গৌরবকে আরোও শ্রীবৃদ্ধি করেছে।

তথ্যসূত্র--

১। সি,জে,দসওয়ানি এন্ড এস,পিরচানি -- সোসিওলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান সিন্ধি, সেন্ট্রাল ইনসটিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ,ফাস্ট পাব্লিসড,অক্টোবর ১৯৭৮,পৃঃ৩,পৃঃ৯, পৃঃ২১ পৃঃ২৩

২। সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ২০১১,অফিস অব দি রেজিস্টার জেনারেল,২ এ মানসিংহ রাডে, নিউদিল্লি, ১১০০১১,পৃ-৭

৩। রমিলা থাপার--কালচারাল পাস্ট এসেস ইন আরলি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি,অক্সফোর্ড ইউনি ভারসিটি প্রেস,২০০০,পৃঃ২৯২-৯৩

৪। সুষুমা,কে,কাটারিয়া ও অন্যান্য --প্রবন্ধ,কমপেরেটিভ স্টাডি অফ প্রসাপেিক ইনডেক্স অফ সিন্ধি কমিউনিটিস এন্ড রেসেস ইন ইনটারন্যাশানাল জার্নাল অফ অ্যানাটমি এ্যান্ড রিসার্চ, ২০১৩,ভলিয়ম-(৩),পৃঃ ১৭১

৫। এন,এন,আচার্য --দি ট্রেড রুটস্ এন্ড মিনস্ অফ ট্রান্সপার্টে ইন অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু আসাম ইন ডি,সি সরকার এডিটেড--আরলি ইন্ডিয়ান ট্রেড এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস ,ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটা , ১৯৮২,পৃঃ ৪২-৪৫

৬। ধর্মকুমার ও তপন রায়চৌধুরী (সম্পাদিত) — দি কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া,ভলিয়ম-১, ওরিয়েন্ট লং ম্যান, নিউ

দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ. ৪৯

৭। হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় --ইনটারন্যাল মাইগ্রেসন ইন ইন্ডিয়া,এ কেস স্টাডি অফ বেঙ্গল,কে,পি,বাগচি এন্ড কোম্পানী,ক্যালকাটা, ১৯৭৮,পৃঃ৫৪২

৮। বর্তমান সংবাদ পত্র,তাং ২৯শে জুন,২০০৩ মিলন কুমার সেনগুপ্তের প্রবন্ধ।

৯। কাউসেন হেনরী--দি অ্যানটিকুয়েটি অফ সিন্ধ উইথ হিস্টরিক্যাল আউট লাইন,পাব্লিশ বা আরকলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া,জনপথ,নিউদিল্লি, ১৯৯৮,পৃঃ ১৬-২৭

১০। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিয়ম-৯, পৃঃ ২২৪-২৫।

১১। সাক্ষাৎকার ঃ-

ক) মুরলীমল সিন্ধি ও বেলামল সিন্ধি,কুমারডাঙ্গি,রায়গঞ্জ,উত্তর দিনাজপুর, বয়স ৭৩, তাং ৫।৮।২০০১

খ) আত্মারাম আডবানি, শিলিগুড়ি,২২/৭/২০২১ বয়স ৮০, খালপাড়া, শিলিগুড়ি।

গ) রাধাকৃষ্ণ রায়তানি,বয়স ৬২,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, তাং ২৩/৭/২০০৭

ঘ) দিলীপ কুমার ক্ষেত্রি , বয়স ৬৮,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, তাং ১৭।০৭।২০২১

ঙ) দীপক মুলচানদানী , বয়স ৪০, মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি, তাং ২০/০৭/২১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার --

নারায়ণ দাস, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি। অশেষ দাস, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি,অধ্যাপক সমীর সাহা,অধ্যাপিকা স্পন্দিতা সাহা, শিলিগুড়ি।

ঔপনিবেশিক স্মৃতির সমাবেশে শিলিগুড়ি মহকুমা প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য

শেষাদ্রি বসু

ঔপনিবেশিক আমলের নগরায়ণের ধাঁচ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় অনুপ্রাসে গড়ে উঠেছিল। কৃষির পণ্যায়ন, তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ তীর্থক্ষেত্রগুলি ঘিরে, রেল এবং তৎসংলগ্ন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি নগরের বিস্তৃতি ঘটায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষে। যেমন আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা, তেমনি বিশেষ করে নগরচর্চার ইতিহাসের সালতামামিতে পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রাণবিন্দু কলকাতাকে নিয়ে যেমন চর্চার ধারাবাহিকতা আছে; উত্তরবঙ্গের শহরগুলি নিয়ে বিশেষভাবে তেমন করে জোয়ার আসেনি। যদিও রণজিৎ দাশগুপ্ত, অসীম চৌধুরী, আনন্দগোপাল ঘোষ, রতন দাশগুপ্তরা জলপাইগুড়ি, মালদা নিয়ে মূল্যবান কিছু সংযোজন করেছেন; কিন্তু অহল্যাদশা এখনও কাটেনি। তাই বলা যায় ছোট শহরগুলির গবেষণা এখনও জায়মানদশায়।

ঔপনিবেশিক আমলে জনপদকে পুরসভায় পরিবর্তিত করার একটা অদ্ভুত পাটিগণিত ছিল (ক) যদি তিন-চতুর্থাংশ জনগণ কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে নিযুক্ত থাকে, (খ) যদি জনসংখ্যা তিন হাজারের কম না হয়, (গ) যদি প্রতি স্কোয়্যারমাইলে এক হাজারের মত জনসংখ্যা কম না হয়; সেক্ষেত্রে সেই জনপদকে পুরসভায় তকমা দিতে কোন অসুবিধা নেই। ফলে এই সুযোগে অনেক গন্ডগ্রামও পুরসভায় পরিণত হয়ে যায়। ১৯০১ সালের সেন্সাসে তাই মন্তব্য করা হয়, ''The ordinary town in Bengal is usually to a great extent urban only in name and many of the Mofussial Municipalities are either overgrown villages, or contain on their outskirts considerable areas of purely rural character" (Census of India 1901– Bengal Part éôé III, Table - III)

সুতরাং এই সুযোগেই শিলিগুড়ি শহরের মর্যাদা লাভ করল ১৯৩১ সালে, যদিও পুরসভার তকমা পেতে আরও উনিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৫০ সাল। প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত যেখানে তিন হাজারের মতো জনসংখ্যার মাপকাঠি ছুঁতে পারলেই শহরকে পুরসভা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হত না, শিলিগুড়িকে এত বছর অপেক্ষা করতে হল কেন?

তরাই তথা শিলিগুড়ি শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অতটা লাভজনক না বলেই কি দেরীতে স্বীকৃতি! তাছাড়া ঔপনিবেশিক আমলে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা—এই ত্রয়ী শহরে যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি ঔপনিবেশিক আমলে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, শিলিগুড়িতে তা সেই অনুপাতে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং শিলিগুড়ির হয়ে গলা ফাটানো শ্রেণীরও তুলনায় স্বল্প উপস্থিতি, ফারাকটা গড়ে দেয়। জোসেফ ডাল্টন হুকার,

ও ম্যালে, ডোজের মতো পর্যবেক্ষকরা এককথায় তরাই, ডুয়ার্স অঞ্চলকে ম্যালেরিয়া প্রবণ এবং চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। জোসেফ ডালটন হুকার ১৮৪৮ এর ১৩ই এপ্রিল শিলিগুড়িতে প্রবেশ করেন এবং তিনি চিহ্নিত করেন এই অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অরণ্যের সমাহারে আকীর্ণ এক রম্য জনপদ হিসেবে। মহানন্দা নদীর স্বচ্ছতা তাকে স্কটল্যান্ডের নদীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরণ দেখে আর্থার জুলে ড্যাশ তাঁর দার্জিলিং গেজেটিয়ারে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এমন অস্বাস্থ্যকর জনপদে ১৯০৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ৭৩শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি করে সম্ভব হল! এই ৭৩ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে ড্যাশের ব্যাখ্যা ছিল যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি।

১৮৮১ সালে শিলিগুড়ি মৌজা এবং তার কিছু সংলগ্ন এলাকা জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দার্জিলিং জেলার সাথে যুক্ত করলে, তরাই মহকুমার সদর দপ্তর শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও ১৮৯১ সালে কার্শিয়াং মহকুমার সঙ্গে তরাই অঞ্চলের সংযুক্তিকরণ ঘটে; কিন্তু ১৯০৭ সালে তরাই মহকুমাকে আবার কার্শিয়াং মহকুমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিলিগুড়ি মহকুমার সৃষ্টি করা হয়।

শিলিগুড়ির তুলনায় দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের শৈলাবাসগুলির মধ্যে বিশেষ করে দার্জিলিং এবংকালিম্পং এর প্রশাসনিক গুরুত্ব বেশী ছিল। ১৯০৭ সালে ও, ম্যালির প্রতিবেদনে প্রকাশ দার্জিলিং জেলায় "There are three offices for the registration of assurances, viz, Darjeeling– Kurseong and Siliguri. The Deputy Commissioner is ex-officio Registrar of the district– and the office of Sub-Registrar is filled at Darjeeling by the senior Deputy Magistrate as Kurseong by the sub-divisional officer and at Siliguri by the Deputy Magistrate in charge of the Tarai". (L.S.S. O Malley Bengal District Gazetteers Darjeeling, published by Logos Press Second reprint ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১৬১) উল্লেখযাগ্যে ব্যাপার ১৮৯৫-৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে দার্জিলিং, কার্শিয়াং তাে বটেই, এমনকি শিলিগুড়ির জমির নিবন্ধিকরণের অফিসগুলিতে নিবন্ধীকৃত জমির প্রমাণপত্রগুলি জমা দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ ৫৪১ থেকে একেবারে ১৯০৪ সালে ৭২১। এই প্রবণতা থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় , দার্জিলিং, কার্শিয়াং-এ নগরায়ণের শ্রীবৃদ্ধির কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তরাই জনপদে রাজবংশী, মেচদের কায়িক শ্রমের নির্যাসে গড়ে ওঠা কৃষিসভ্যতার বিস্তার। শিলিগুড়িতে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, যাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিধি তরাই অঞ্চলে ব্যপ্ত ছিল। "Besides these, there is a strong bench at Hononary Magistrates at

Darjeeling, some of whom are vested with first class powers and have authority to try cases singly– another at Kurseong, and a third in the Tarai, which is known as the Naksalbari bench of Honorary Magistrates– but holds its court at Baghdogra" (L.S.S.O Malley Bengal District Gazetters Darjeeling– published by Logos Press Second imprint ১৯৯৯, পৃষ্ঠা -১৬২) বলাবাহুল্য এইসব সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেটরা সবাই ইউরাপেীয়ান ছিলেন। দার্জিলিং, জোড়বাংলো, কার্শিয়াং এবং শিলিগুড়িতে যদিও একটি পুলিশ থানা ছিল; কিন্তু কারা এই তরাই জনপদে পুলিশের কাজ করতেন তা নিয়ে উল্লেখ নেই। জেলা জেলখানা দার্জিলিং এবং অন্যান্য জেলখানাগুলি কার্শিয়াং এবং শিলিগুড়িতে ছিল। কার্শিয়াং, শিলিগুড়িতে মাত্র ৪৮ থেকে ২৪ জন কয়েদীকে এক রাতের মতো জেলে রাখার বন্দোবস্ত ছিল। শান্তিপ্রিয় রাজবংশী, মেচ এবং নেপালী জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলার অভাব ঘটেনি। শিলিগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের সবাই মনোনীত। দু'জন সরকারী আধিকারিক, চারজন চা-বাগানের মালিক, প্রতিনিধি, ছয়জন বেসরকারি প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছিল। ১৯৪০-৪১ সালে বারোজন সদস্যের মধ্যে তিনজন ইউরোপীয় ছিলেন। ১৯৩৮ সালের মার্চে শিলিগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ''ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে ছিল পার্শ্ববর্তী চা-বাগানগুলিতে খাদ্যদ্রব্যাদি, কয়লা সরবরাহ, পরিবহন, কাঠের করাতকল, ধানভাঙ্গা কল (Rice Mill)– পাটের কারবার তথা পাটের গুদাম, দুইটি প্লাইউড কারখানা এবং কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দোকান, স্বল্পসংখ্যক হলেও আইন ও চিকিৎসা ব্যবসা ছিল বঙ্গসন্তানগণের করতলগত। নগণ্যসংখ্যক বিত্তবান বাঙালীর কিছুসংখ্যক চা-বাগিচা, কাঠ ও কয়লার কারবার ও ভূসম্পত্তি।" (শ্রী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'শিলিগুড়ির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস', প্রকাশক অরুণ রায়, হিমালয় পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১লা জানুয়ারী, ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৬) শিলিগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম সভাপতি আইনজীবী লক্ষীনারায়ণ মজুমদার সরকার মনোনীত ছিলেন। যদিও এই বোর্ডের মুখ্য কাজ ছিল ছোটখাট সড়কগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা, কিন্তু জনহিতকর কাজগুলিও পরিকল্পনায় ছিল। শহরের পয়ঃপ্রণালী এবং শৌচাগার ব্যবস্থার চূড়ান্ত দৈন্যদশার প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন বোর্ডের বাজেট আশাব্যঞ্জক ছিল না।

	Rs.
Roads	350
Drainage	325
Conservancy	4500
Sanitation	540

Schools	400
Dispensaries	200
Miscellaneous	1300

তথ্যসূত্র - আর্থার জুলে ড্যাশ, দার্জিলিং বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারস, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং (বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস, আলিপুর, বেঙ্গল, ১৯৪৭, পৃঃ ২৪৫)

দার্জিলিং যেহেতু শ্বেতাঙ্গ শৈলাবাস ছিল; তাই স্বাস্থ্যবিধি প্রয়োগে সেখানে বেশী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। শিলিগুড়িকে আর্বান তকমা দিলেও, তার গুরুত্ব ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে বিন্দুমাত্র ছিল না। ১৯১৪/১৫ খ্রীষ্টাব্দে শহরের প্রখ্যাত আইনজীবী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে স্যানিটারী কমিটির কাজ আরম্ভ হয়। যেহেতু আধুনিক শৌচাগার বলে কিছুই ছিল না; কমিটির কাজ ছিল শহরের বর্জ্যবস্তুগুলি মেথরদের দিয়ে মহানন্দা নদী এবং ফুলেশ্বরী নদীর পাড়ে ফেলে আসা। রাস্তার জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলা হত। ১৯২৫/২৬ সালে জর্জ মেহবার্ট স্যানিটারী কমিটির সভাপতি হওয়ার পরেও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। খালি ট্রেজারী ভবন, পুলিশ থানা এবং কয়েকটি স্থানে কাঠের খুঁটি পুঁতে আলোর বন্দোবস্ত করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে শিলিগুড়িতে একটি হাসপাতাল ছিল, সেখানে একজন সাব-এ্যাসিসটেন্ট সার্জেন ছিলেন। তার বাড়তি দায়িত্বের মধ্যে ছিল হাটগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করা। মূল উদ্দেশ্য যাতে এই মহকুমায় মহামারীর প্রকোপ যেন না হয়।

ডোজে রেলের কর্মচারীদের জন্য নির্মিত শিলিগুড়ি বাজারের উল্লেখ করেছেন, যা পরবর্তীতে জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যাতে পয়ঃপ্রণালী এবং শৌচাগার ব্যবস্থার উন্নতি হয়, তার জন্যেই এই হস্তান্তর তাতে সন্দেহ নেই। পরে এই বাজার Darjeeling Improvement Fund এবং অবশেষে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও ইউনিয়ন বোর্ড দুই হাজার টাকার সংস্থান করে, তাও পয়ঃপ্রণালী এবং জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি।

ও ম্যালি জেলা এবং শিলিগুড়ি শহরের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার যে শান্তিপূর্ণ ঐতিহ্যের বিবরণ দিয়েছিলেন; ডোজে তারই পুনরুচ্চারণ করেছিলেন। ডোজে বিশেষ করে ইন্দো নেপাল সীমান্তে দেবীগঞ্জ, অধিকারী, নকশালবাড়ী, রাণীগঞ্জ, পানিঘাটা, মিরিক এবং টাংলুর আইনশৃঙ্খলাব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কারণ শুকনো মরশুমে, মোরং-এর গভীর জঙ্গল থেকে সীমান্ত পার হয়ে রাত্রিতে দস্যুরা জোতদারদের ভিটেগুলিতে লুটপাট চালাত। তাছাড়াও শিলিগুড়ি সংলগ্ন চা-বাগানের শ্রমিকদের কার্যকলাপও সন্দেহের ঊর্দ্ধে ছিল না।

শিলিগুড়ি শহর তথা মহকুমার উন্নতির লক্ষণ দেশভাগ পরবর্তীতে দেখা যায়। ঔপনিবেশিক আমলে কৃষির পণ্যায়নের অভিঘাত কিম্বা অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ দেখা যায় না। তাই শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ হিসেবে গড়ে উঠবারও সম্ভাবনা ছিল না শহরে। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়িতে যেমন সাহেবপাড়া গড়ে উঠেছিল, শিলিগুড়িতে তা হয়ে ওঠেনি। অবশ্য হলেও শহরের উন্নতিতে তার কোন ছাপ পড়ত। সাহেবপাড়া একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, যেখানে ঔপনিবেশিক পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যবিধি প্রয়োগে পুঁজির অভাব থাকবে না, কিন্তু শহরের অন্যান্য জায়গায় তার আদৌ কোন প্রভাব পড়বেনা। এই ক্ষেত্রে প্রতিবেশী জলপাইগুড়ি শহর একটি উদাহরণ।

—০—

প্রয়োজন নেই সকলের সেবা করার, তুমি অন্তত একজনের সেবা কর।
— মাদার টেরেজা

বইমেলা এবং আমার শহর

শুভময় সরকার

বহুদিন আগের একটা বইমেলাকেন্দ্রিক ঘটনার কথা নেহাতই প্রসঙ্গক্রমে মনে এলো। আমি তখন এ শহরের বাসিন্দা নই, তবে পারিবারিক সূত্রে বছরে অন্তত দু'বার তো আসা হয়ই। তো সেবার আসার আগেই তুতো-দাদার চিঠিতে (চিঠিলেখা তখনো লস্ট আর্ট হয়নি) জানলাম শিলিগুড়িতে সেবার বইমেলা হচ্ছে প্রথমবার। তার আগে কলকাতা বইমেলা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু যতদূর জানি উত্তরবঙ্গের কোনো শহরেই তখনো বইমেলা শুরু হয়নি (এ জানা ভুলও হতে পারে, নিশ্চিত নই যদিও,কিন্তু যতদূর জানি এটাই সত্যি)। খবরটা পেয়েই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম, উত্তেজনায় ভরপুর সেই কিশোর মন। যথাসময়ে বড়দের সঙ্গে গিয়েওছিলাম সেবারের সেই বইমেলায়, সেটাই শিলিগুড়ির প্রথম বইমেলায়।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাক, বরং আজকের 'উত্তরবঙ্গ বইমেলা' নিয়ে কিছু অনুভূতি লেখা যাক। তবে আজকের বলে তো কিছু হয় না, এই 'আজকের' কোনোকিছুই একদিনে গড়ে ওঠেনি, এর একটা অতীত থাকে, ইতিহাস থাকে, গড়ে ওঠার দিন থাকে। আজকের 'উত্তরবঙ্গ বইমেলা' বা শিলিগুড়ি বইমেলারও তেমন একটা অতীত আছে, একদিনে আকার,আয়তন আর কলেবরে বাড়েনি সে। বেশ মনে পড়ে সেই প্রথম উত্তরবঙ্গ বইমেলার তথা শিলিগুড়ি বইমেলার স্মৃতি,সম্ভবত ১৯৮৪ সাল সেটা। সেবারের বইমেলা হয়েছিল শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের ক্লাসঘরগুলোতে। একেকটা প্রকাশন সংস্থা তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে বসেছিল একেকটা ঘরে আর গেট দিয়ে ঢোকার মুখেই বাঁদিকে দেবদারু গাছের তলায় বয়েজ স্কুলের একঝাঁক ছেলে চায়ের স্টল করেছিল, যতদূর মনে পড়ে স্টলের নাম ছিল 'দেবুতলায় কিছুক্ষণ'। আমার তুতো-দাদাও সেই দলের এক পান্ডা সে'সময়। এ লেখা লিখতে গিয়ে কত স্মৃতি ভেসে আসছে চোখের সামনে। মনে পড়ে একটা ক্লাশঘরের দরজায় চক দিয়ে কেউ লিখে রেখেছিল 'অন্তর্জলী যাত্রা', বড়দের মুখে শুনেছিলাম এটা বিখ্যাত লেখক কমলকুমার মজুমদারের একটি উপন্যাসের নাম, উপন্যাসটি পড়েছি যদিও অনেক পরে, সিনেমার পর্দায় দেখেছি তারও পরে।

সত্যি কথা বলতে কী, এ শহরের বইমেলা সংগঠিত হয়েছিল যে কতিপয় মানুষের উদ্যোগে তাদের মধ্যে অন্যতম অধ্যাপক হরেন ঘোষ এবং অধ্যাপক বিমলেন্দু দাম। এছাড়াও ছিলেন আরও কিছু মানুষ, যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শুরু হয়ে সেদিনের সেই 'উত্তরবঙ্গ বইমেলা', যা আজ কলেবরে এ রাজ্যে কলকাতা বইমেলার পরেই।

পুরবার্তা ২০২১

ব্যক্তিগতভাবে আমার এ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস অনেক পরে কিন্তু লেখালেখির কারণে আজ এই বইমেলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিবিড়। এখন ভেবে দেখলে মনে হয়, এশহর আজ যে আমার এতো আপন হয়ে উঠেছে, তার যোগসূত্র সম্ভবত এই বইমেলা। এই বইমেলা কলেবর বৃদ্ধির কারণেই হয়তো বা তার পুরনো জায়গা বাঘাযতীন পার্ক ছেড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলাপ্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন শীতকাল মানেই আমাদের এই বইমেলা আর মেলার ক'টা দিন এশহরের বইপ্রেমীরা মেতে ওঠেন মেলাকে কেন্দ্র করে। কলকাতা বইমেলার মতোই এখানেও লিটল ম্যাগাজিন চত্বর মুখরিত হয় গানে, কবিতায়,গল্পে,তর্কে, বিতর্কে! সন্ধেবেলা কবি,লেখক,গায়ক,শিল্পীদের আড্ডায় মেলাপ্রাঙ্গণ বুঝিয়ে দেয় এশহর শুধু বাণিজ্যের নয়, এশহর সংস্কৃতির শহরও বটে। এই 'উত্তরবঙ্গ বইমেলা' ছাড়াও সরকারি উদ্যোগেও আরেকটি বইমেলা সুদীর্ঘকাল ধরে সফলভাবেই সংগঠিত হয়ে চলেছে এ জেলায়। কখনো সেই মেলা শহরে হয়, কখনোবা শহর সংলগ্ন অঞ্চলে।

আজ এ লেখার প্রসঙ্গেই আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' এবং এ শহরের আমাদের মতো কিছু অক্ষরকর্মী,সাহিত্যপ্রেমী মানুষের সহযোগিতায় সংগঠিত হয় উত্তরবঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন মেলা। প্রথমবার মেলা হয় শিলিগুড়ি শহরেই (তথ্যকেন্দ্র চত্বরে)। উদ্বোধন করতে এসেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর প্রতিবছর নানান জেলায় এই লিটল ম্যাগাজিন মেলা হয়, সব জেলা ঘুরে আবার শিলিগুড়িতে শেষবারের মতো হয় বাঘাযতীন পার্কে। এখন আর সে মেলা হয় না। কারণ জানিনা। তবে এবছর 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি'র কিছু তরুণের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন মেলা সফলভাবে সংগঠিত হয়েছে এই শহরেই। দু'দিনের এই লিটল ম্যাগাজিন মেলায় উত্তরের সব জেলা থেকে এসেছিলেন কবি,সাহিত্যিকরা।

সত্যি কথা বলতে কী,একটা শহর বড় হয়ে ওঠে,পরিচিত হয়ে ওঠে শুধুমাত্র বাণিজ্য, বড় বড় দোকান,শপিংমল,তারকাখচিত হোটেল আর আকাশচুম্বি অট্টালিকায় নয়, সেই শহরের সংস্কৃতি আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অহংকার করে বলতে পারি,এ শহর গুণীর শহর, সৃষ্টিশীলতারও শহর, নেহাতই বাণিজ্যিক শহর নয়। সবকিছুর সুন্দর সহাবস্থানে আমাদের শিলিগুড়ি একদিন তিলোত্তমা হবেই, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—০—

গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো
— স্বামী বিবেকানন্দ

আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি শহরের ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই — এরকম শুনতে শুনতে হীনম্মন্যতায় ভুগেছি অনেকদিন। তবে জন্মসূত্রে না হলেও কর্মসূত্রে এই শহরকে নিজেদের ধাত্রীভূমি হিসেবে গ্রহণ করে যাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন জ্ঞানচর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্রে, তাঁরাই এই শহরের পরিচিতি। এরকম একজন মানুষের কথা আজ উল্লেখ করতে চাই এই লেখায়, যিনি বাইরের জগতে জ্ঞানমার্গের উচ্চতম সোপানে স্থিত আলোকপুরুষ, কিন্তু আমার কাছে শ্রেণিকক্ষের মাস্টারমশাই। তিনি অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার।

কলেজবেলায় ক্লাসঘরে কিংবা লাইব্রেরিতে যাঁর বই সাহিত্যের অলিগলিতে নিয়ে গেছে হাত ধরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে তাঁকেই পেলাম সরাসরি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক হিসেবে। অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁর শেষ ব্যাচের ছাত্র হিসেবে গর্ব অনুভব করি। নিজের মেধা, মনন এবং ব্যক্তিত্বের তীব্রতায় তিনি বারবার কেন্দ্রকে আকর্ষণ করেছেন প্রান্তের দিকে। শহর শিলিগুড়ি তাঁর জন্মভূমি নয়, কিন্তু তাঁর স্কুল জীবন অতিবাহিত হয়েছে এখানেই এবং দীর্ঘ কর্মজীবন এই শহরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। বিশবিদ্যালয়ে রাশভারি এই মানুষটির খুব ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছি এমন বলা চলে না। কারণ তখনও এখনকার মত শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্র-ছাত্রীর বন্ধু হয়ে ওঠেন নি, তাঁদের সঙ্গে সম্ভ্রমের দূরত্ব রক্ষা করাই ছিল স্বাভাবিক অভ্যাস। কণ্ঠস্বরের অসুবিধের কারণেই তিনি মাইক্রোফোনের সাহায্যে ক্লাসে পড়াতেন। আমাদের দায়িত্ব ছিল ক্লাসের আগেই তাঁর ঘর থেকে সেই মাইক্রোফোন এবং বক্স নিয়ে আসা। আনতে গিয়ে দেখেছি, প্রতিদিন ক্লাসের আগে তিনি পাঠনিবিষ্ট। তিনি সেই অধ্যাপক, যাঁর জ্ঞানের সৌরভ তখন সুদূরবিস্তৃত, যাঁকে দেখবেন বলে এবং যাঁর মেধার স্পর্শ পাবেন বলে পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বাংলাদেশ থেকে প্রতিথযশা সাহিত্যিকেরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা চক্রে আসতেন, যিনি সুদীর্ঘ অধ্যাপনাজীবন শেষ করবেন সে বছরই, তিনি প্রতিদিন ক্লাসে যাবার আগে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এ শিক্ষা আমাদের শিক্ষকতা জীবনে সবসময় রক্ষা করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। শিলিগুড়িবাসী হবার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আলোচনাচক্রে তাঁকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব সাধারণত পড়ত আমার ওপর। যতবার গেছি, দেখেছি, নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে থেকে বাইরের ঘরে বসে কোন একটি বই পড়ছেন। কোনদিন এক মুহূর্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনাচক্রে এসে বিভাগীয় প্রধানের ঘরে যখন অপেক্ষা করছেন তখনও দেখেছি, অন্য অতিথিরা হয়ত নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, তিনি আলাপে অংশগ্রহণ করলেও হাতে রয়েছে কোনো একটি বই। সেরকমই এক অপেক্ষা-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়র তখনকার নবীন অধ্যাপক নিখিলেশ রায়ের (তিনিও আমার মাস্টারমশাই) একটি কবিতার বই দেখছিলেন। হঠাৎ ডেকে উঠলেন — 'নিখিল, নিখিল— এই কবিতাটা বেশ ভালো।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের পর যতবার গেছি স্যারের কাছে, বারবার বলেছেন, 'প্রতিদিন অন্তত কিছু সৃজনমূলক সাহিত্য এবং কিছু সমালোচনা সাহিত্য পড়বে।' এই উপদেশ সবসময় রক্ষা করতে পেরেছি এমন নয়। ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞান কীভাবে একজন সম্পূর্ণ শিক্ষক গড়ে তোলে তার সার্থক উদাহরণ অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার। জ্ঞান জগতের এই অধিবাসী কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কেও সমান সচেতন ছিলেন। যে কোন রাজনৈতিক-সামজিক বিষয়ে সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শহর শিলিগুড়িতে যখন 'সৃজন' গড়ে ওঠে, তখন প্রতিবাদী মিছিলে পা মিলিয়েছেন তিনি, সৃজনের সভাপতি হিসেবে পালন করেছেন গুরুদায়িত্ব। শহরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নাট্য আয়োজনে তাঁর উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল। আমাদের

দলের (শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থা) একাধিক নাট্য উৎসবে এবং প্রযোজনায় তিনি অতিথি হয়ে এসেছেন, নিজের প্রতিক্রিয়া সংযত এবং সুনির্বাচিত শব্দে ব্যক্ত করেছেন। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম তাঁর প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য। অধ্যাপক সিকদারের বিস্তৃত কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, মাত্র দু'টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর 'বঙ্গরত্ন' পুরস্কার প্রচলন করেন। প্রথম বছর 'বঙ্গরত্ন' প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সিকদার। কর্মসুবাদে আমি তখন বালুরঘাটে, টিভিতে পুরস্কারপ্রদানের অনুষ্ঠান দেখছিলাম। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান সূচনার সময় তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব মহাশয় তাঁকে হাত ধরে সামনে না নিয়ে আসা পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন একপাশে। প্রদীপ জ্বালানো হয়ে যেতেই আবার পিছিয়ে গিয়ে সকলের পেছনে। সম্মান নেবার সময়ও অতিরিক্ত কোন উচ্ছ্বাস নেই। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে হাত ধরে নিয়ে এলেন, আবার নিজের জায়গায় পৌঁছে দিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দ্রুত আমার মাষ্টারমশাই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন আলোকৃত্তের বাইরে। নিজে শিক্ষকতা করতে গিয়ে বুঝতে পারি, যে কোন শিক্ষক সব সময়ে থাকেন ছাত্র-দৃষ্টির আতসকাচের নিচে। প্রতি মুহূর্তের আচরণ সেখানে লক্ষিত এবং পরীক্ষিত হয়। কখন কোন প্রেক্ষণবিন্দু থেকে কোন ছাত্র তাঁর মাস্টারমশাইকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন তা বোঝা কঠিন। তাই সচেতন থাকতে হয় সব সময়। এই সচেতনতা চেষ্টাকৃত হলে তার ফাঁকি ধরা পড়তে বেশি সময় লাগে না। যাপিত জীবনের অভ্যাসে যদি তা গড়ে ওঠে তবে তা হয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন হয়েছিল অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদারের। দূর থেকেও সেদিন তাঁর আচরণে সংযমের যে শিক্ষা পেলাম তা সত্যিই দুর্লভ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় (কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়) যখন সিদ্ধান্ত নেয় স্যারকে সাম্মানিক 'ডি.লিট.' উপাধি দেবার, তখনও শিলিগুড়ির অধিবাসী হিসেবে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়। স্যার তখন শয্যাশায়ী, চেতন-অবচেতনে মুহুর্মুহু গতায়াত। সেই অবস্থায় তাঁর সম্মতি গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাই। তখনও তিনি আক্ষেপ করছেন, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা নিয়ে (যে আক্ষেপ প্রথম শুনেছিলাম বেশ কয়েকবছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসবে। দৃষ্টির কারণে পড়তে না পাড়ার কষ্ট ব্যক্ত করেছিলেন।) দুর্ভাগ্য, সমস্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও সমাবর্তনের আগেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক। বিশ্ব বিদ্যালয়ের আশা অপূর্ণ থেকে গেল। পরে ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আয়োজন করি 'বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ও অশ্রুকুমার সিকদার' শীর্ষক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র। শিক্ষক দিবসে এই আলোচনা চক্রের মাধ্যমে আমরা শ্রদ্ধা জানাই আমাদের প্রিয় শিক্ষক মহাশয়কে। তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাদের চলার পথের পাথেয়। একজন শিক্ষক শুধু নিজের মেধা এবং জ্ঞানের জোরেই শিক্ষক হয়ে ওঠেন না, হয়ে ওঠেন নিজের যাপিত জীবন ও ব্যক্তিত্বের জোরে। জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বের অপূর্ব সমাহারে অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার যেন ছিলেন দীপ্ত সূর্য, যে সূর্য আলোকিত করেছেন শহর শিলিগুড়ির মেধা চর্চা এবং সমাজ সচেতনতার যৌথ ক্ষেত্রকে। তাঁকে জানাই অন্তরের প্রণতি।

'পুরবার্তা'র পরবর্তী সংখ্যায় শিলিগুড়ির আর একজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লেখার ইচ্ছে রইল, যিনি আমার কলেজবেলার সদাহাস্যমুখ মাস্টারমশাই। তিনি অধ্যাপক সমর চক্রবর্তী— শহরের প্রিয় সমরদা।

বাঘাযতীন পার্ক

সেবন্তী ঘোষ

বাঘাযতীন পার্ক। একসময়ে এই পার্ক ছিল পাড়ার মানুষদের। একদিকে বড় রাস্তা, অন্যদিকে সরু রাস্তার পাশে লাল গোলাপি হলুদ কৃষ্ণচূড়া অমলতাসের সারি। সত্তরের দশক। স্কার্ট পরা লম্বা একটা মেয়ে দাদা বা ভাই কারো একটা সাইকেল নিয়ে দম লাগিয়ে প্যাডেল মেরে চক্কর কাটছে। দরদরিয়া ঘামছে আর মাঝে মাঝে ছেলেদের সাইকেল থেকে আধঝোলা হয়ে এর ওর সঙ্গে গল্প করছে। না, কেউ তাকে ডানপিটে, বেহায়া বলে দেগে দিচ্ছে না। কিন্তু সে সময় সে পাড়ায় ছেলেদের সাইকেল চালানো ষোলো সতেরো বছরের একলা মেয়েই ছিল। এই পাড়ার ও আশেপাশের কজন মহিলা মিলে জাতীয় মহিলা সমিতি করেছেন। উদ্যোক্তা বাঘাযতীন পার্কের শ্রীযুক্তা শঙ্করী চৌধুরী। এইসব মহিলাদের নাতনি ও মেয়েরা বিরাট দলবেঁধে নাটক নৃত্যনাট্যের মহড়া দেয়। শংকরী চৌধুরীর দুই শান্তিনিকেতন ফেরত কন্যা মঞ্জুদি, রত্নাদির তত্ত্বাবধানে সে সব হইচইময় রিহার্সাল চলে। সে এক বিরাট মেয়েদের দল। কুচো থেকে আঠারো সবার জন্য পার্ট রেডি। সমাজের সব স্তরের মেয়েরা ছিল সে দলে। কারো বাবা-মা ডাক্তার, অধ্যাপক, উকিল, ব্যবসায়ী তো, কারো বাবার মুদির দোকান। পার্ট পাওয়ার জন্য দক্ষতাই ছিল বিবেচ্য। সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে আসা মেয়েদের বাড়িতেও এই নাচ গান রিহার্সালে কোন আপত্তি দেখিনি। মহিলা সমিতিতে মায়েদের যে দলটি ছিল তাঁদের দেখেছি ঘর সামলে এক মুক্ত আড্ডা ও কাজের জগতে আনন্দে মেতে থাকতে। ওঁদেরও একটা নাটকের দল ছিল। বলাবাহুল্য পুরুষের চরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করতেন। পরিচিত কাকিমাদের বরেদের শার্ট প্যান্ট পরে পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখে আমরা হেসে কুটোপাটি হতাম। সেখানে পরচর্চার বদলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য দান, পুজোয় দুঃস্থদের জন্য নতুন শাড়ি জামা কাপড় দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম।

আমাদের মেয়েদের দলে প্রশিক্ষণ ও সেই ফাঁকে ঈষৎ দুষ্টুমি ছাড়া অন্য আলোচনাও নেই। হয়তো পুঁজিবাদের দেখানোপনায় তখন শ্রেণিস্বাতন্ত্র্য এত প্রকট হয়নি বলেই আপাত সরল মফস্বলের জীবনে একটা সামঞ্জস্য ছিল। এইসব মেয়েরা সবাই প্রায় গান নাচ আঁকা আবৃত্তি ও খেলার ক্লাসে চলে যেত। সবাই কিছু না কিছু শিখছে। তাই বলে কোনো সময়কালই কি তপোবনের মত শুচিশুভ্র থাকে? মোটেই না। সেখানেও দেখি দু- চারজন জন রাক্ষসের উৎপাত চলে! প্রতিটি শহরেরই দুটি তল থাকে। উপরের এই কেকের আইসিং-এর নিচে এখনকার মতো না হলেও, অসাধুতা, জমি জায়গার দলাদলি ও তজ্জনিত খুন-জখম ছিলই। পাড়াতে বসেই বেশ সম্ভ্রম উদ্রেককারী গুন্ডাদের নাম শুনতাম। তবে তাদের যে চোখে দেখা যায় তা মালুম হলো পাশের বাড়ির এক দিদির সঙ্গে তথাকথিত এক গুন্ডার প্রণয়

পরিণয়ে! এখনো মনে পড়ে নতুন জামাই বাবুর হাড় হিম করা ঠান্ডা চোখ! আমার জন্মদিনে অন্তরা চৌধুরীর এক রেকর্ড উপহার দিয়ে নিরীহ ভঙ্গীতে লুচি মাংস খেয়েছিলেন তিনি! হয়তো ঐ বয়সে কল্পনার দৌড়ে অমন ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল! পরে ভদ্র অমায়িক মধুর হাসির কতো বড়ো বড়ো অসৎ লোক দেখে ফেললাম!

বাঘাযতীন পার্ক মানেই আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। সেই একতলা, প্রচুর গাছপালাওয়ালা বাড়িতে সব সময় কিছু না কিছু ঘটতো। উঠানের একপাশে আতা গাছ।

তারপাশে বাঁধানো চাতালের মাঝে কুয়ো। কপিকল দিয়ে জল তোলা হতো। সেই জল লোহার বালতিতে ভরে ভরে পাশের চানঘরে চৌবাচ্চায় ঢেলে রাখা হতো। তিনধারিয়া কার্শিয়াং থেকে আসা আমার পরিবার কুকুরের গন্ধ ছাড়া থাকতে পারে না। ফলে উঠোনে ইয়া বড়ো কাঁঠাল গাছ তলায় কুকুরের বাড়ি। কুকুরদের নামকরণ প্রায়শই হত ঠাকুমার ইচ্ছা অনুযায়ী, জ্যাক জলি ও ল্যাসি। তিনধারিয়ার লোকো অফিসের বড়বাবু আমার ঠাকুরদার উর্দ্ধতন সাহেব অফিসার ছিলেন স্কটিশ। তাছাড়া দার্জিলিং পাহাড় জুড়েই স্কটিশদের বাড়বাড়ন্ত ছিল। পরে দেখেছি স্কটিশরা মেয়ে অর্থে 'ল্যাসি' 'লাসে' শব্দ ব্যবহার করে। ইংরেজি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তাদের ভাষা, উচ্চারণ। সম্ভবত আদর করে মেয়ে কুকুরের নাম ল্যাসির উৎপত্তি ওখানেই। তো, এই ল্যাসি রাতে ছাড়া থাকলেও বেদম ঘুম কাতুরে। দিনে সে রুটি পেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখত। রাতে সেটা তুলে খানিক ছিঁড়ে, খানিক চিবিয়ে আলস্য দূর করত।বাঘাযতীন পার্কের আরেক বৈশিষ্ট্য তার ছিঁচকে চোরের উপদ্রব। প্রায়শই আমাদের বাড়িতে চোর ঢোকার চেষ্টা করত। ঘুমন্ত ল্যাসির অস্তিত্ব টের না পেয়ে চোর নিচু গলির পাঁচিলের ওপর দিয়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকে, ভিতর থেকে গলির কাঠের দরজার শিকল খুলে, প্রয়োজনে দ্রুত দৌড়ে যাওয়ার পথ প্রস্তুত রাখত। দুবার ক্রমান্বয়ে বালতি, কপিকল ও বাবার ঘড়ি চুরি হয়েছে। তৃতীয়বার ল্যাসির কর্তব্যবোধ জেগে উঠেছিল। সে যাত্রায় পলায়নোদ্যত চোর মহাশয় লুঙ্গি ও একপাটি চপ্পল ফেলে গেছিল।

আমাদের শৈশবে পার্কে নানা অনুষ্ঠান হতে দেখেছি। প্রকাশ পাড়ুকোনকে দেখেছিলাম এই মাঠে। নিয়ম করে যাত্রার আসর বসতো। আমার কলকাতার এলিট বন্ধুরা হতভম্ব হয়ে যেত যাত্রা বিষয়ে আমার জ্ঞান শুনে! শিবদাস মুখার্জি থেকে স্বপন কুমার, স্বপ্না কুমারী, অরুণ ও বীনা দাশগুপ্ত, শান্তিগোপাল - কে না এসেছেন! এখানেই নাটক করতে আসা উৎপল দত্তর রাশভারী ব্যক্তিত্বর মুখোমুখি হয়ে অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ও কণ্ঠস্বরে ওই শৈশবেই বজ্রাহত হয়েছিলাম প্রায়! আমার জন্মের সময় সিনিয়র পি.সি সরকার এখানেই ম্যাজিক দেখিয়ে মঞ্চ থেকে হাতি ভ্যানিস করেছিলেন। মঞ্চের পিছন দিকে থাকা বাড়ির বারান্দা থেকে আমাকে কোলে নিয়ে আমার মা সেই হাতিকে মঞ্চের অন্য ধার দিয়ে দিব্যি নেমে আসতে

পুরবার্তা ২০২১

দেখেছিলেন ! কীই না হতো বাঘাযতীন পার্কে ! তখনো ছোটছোট খাঁচায় জীবজন্তু নিয়ে মেলায় আসত ছোট সার্কাসদল। এক বর্ষা রাতে বাঘ বা সিংহের গুমরানো গর্জনে কেঁপে উঠেছিলাম ! বৃষ্টিতে তার খাঁচা ভিজে যাচ্ছিল।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এলে আমাদের বাড়ি থেকে গদিওয়ালা একটি চেয়ার ও চা যেত। তখনো নেতারা এতো দূরের মানুষ হয়ে যাননি। জ্যোতি বসু থেকে রাজীব গান্ধীর জন্যে সেই চেয়ার গিয়েছিল। ইন্দিরার শোচনীয় মৃত্যুর ঠিক আগে রাজীব এই বাঘাযতীন পার্কের জনসভায় এসেছিলেন।

আমার বাবার উদ্যোগে শুরু হওয়া এই বাঘাযতীন পার্কে বইমেলা দেখেছি। ছোট সেই বইমেলার আনন্দ কখনোই ভুলবার নয়।

বাঘাযতীন পার্ক নিয়ে লিখতে বসলে এক মহাভারত লিখে ফেলা যায়। জীবনের প্রথম ষোলো বছর এপাড়ায় কাটিয়ে পরের কুড়ি বছর শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় কাটিয়েছি। মাঝের এই দীর্ঘ সময়টা আমার জানা নেই। ফিরে এসে দেখি বাদবাকি পৃথিবীর মতো বাঘাযতীন পার্ক ও বদলে গেছে। সে পার্ক আর আমাদের পাড়ার লোকের নেই। অপরিচিত, বেপাড়ার নানা যুবক-যুবতী বাইক আড্ডায় সেই মাঠে প্রবেশ করা যেত না। ঢাউস এক মঞ্চ হয়ে আমাদের ছোটবেলার দোলনা, স্লিপ সব হারিয়ে গেছে। মাঠের সবুজ এর অস্তিত্ব নষ্ট হতে বসেছিল। পরবর্তীকালে এই মাঠটিকে পুনরায় সবুজ করে তোলার জন্য মাননীয় গৌতম দেব মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সবুজ অংশটুকুই এখনকার ঘিঞ্জি বাঘাযতীন পার্কের ফুসফুস।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রকাশিত পুরসভার এই পুরবার্তা পত্রিকায় ফেলে আসা সময়ের কথা লেখার পরে এই স্বাধীনতা দিবস নিয়ে কয়েকটি কথা লিখতে ইচ্ছে করল।

স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর জন্মেছিলাম বলে আমার শৈশবে স্বাধীনতা দিবসও নবীন ছিল। পরাধীন দেশ দেখেছেন এমন বহু তরুণ ছিলেন সে সময়। পনেরোই আগস্ট ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো প্রখর। শুধুমাত্র একটা ছুটির দিন মনে করতেন না কেউ। বাড়িতে হরিপদ ভট্টাচার্যের মতো চট্টগ্রাম আন্দোলনের মাস্টারদা সূর্যসেনের সহযোগী বিপ্লবীকে দেখে শিহরিত হয়েছি। তাঁর প্রতিটি আঙুলের নখের নিচে সূচ বেঁধাবার চিহ্ন দেখেছি। যে বিপ্লবী বাঘা যতীনের নামে এই পার্ক, এই পাড়া, ছাত্রদের মুখে তার বি.জে.পি নাম শুনে মরমে মরে গেছি। সময় তো ক্রমশ ইতর হয়েই আসে।

১৫ আগস্ট বললে আরেক পনেরো — ওই মনে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকার বত্রিশ নম্বর সড়কের বাড়িতে বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার ও ঘনিষ্ঠ ষোলোজনকে হত্যা করে সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসার। পৃথিবীর একমাত্র বাংলাভাষী দেশটি চলে যায় মৌলবাদী সামরিক শাসনে। শেখ

মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে দেখি মাউন্টব্যাটেনের ভারত ভাগের গল্প। তখন 'হিন্দুস্তান পাকিস্তান' ঘোষণা হয়ে গেছে। চলছে শহর ভাগাভাগি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছা তিনি ভারত ও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়ে বসবেন। জিন্না রাজি হলেন না। লর্ড ক্ষেপে গিয়ে পাকিস্তানি সর্বনাশ করার চেষ্টা করলেন। মানে পাকিস্তানের কিছু প্রাপ্য স্থান ভারতে ঢুকিয়ে দিলেন। 'ইংরেজ তখনো ঠিক করে নাই, কলকাতা পাকিস্তানে আসবে, না হিন্দুস্তানে থাকবে'। এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে আরো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আছে।

একজন ইংরেজ গভর্নর হয়ে ঢাকা আসতে রাজি হচ্ছিল না কারণ ঢাকার আবহাওয়া খুব গরম। তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল ''পূর্ব পাকিস্তানে দুনিয়ার অন্যতম পাহাড়ি শহর, থাকার কোন কষ্ট হবে না'' অর্থাৎ আমাদের সাধের এই দার্জিলিং আরেকটু হলেই যাচ্ছিল ! ভাগ্যিস কোন কারণে মাউন্টব্যাটেনের মন পরিবর্তন হয়েছিল !

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মনে হয়, গিদ্দা পাহাড়ে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের অন্তরীণ অবস্থার স্মৃতিচিহ্ন, দার্জিলিংয়ের চিত্তরঞ্জন দাশ, গান্ধীজির স্মৃতিচিহ্নিত স্টেপ অ্যাসাইড বাড়ি, পাঙ্খাবাড়ি রোডে শের এ বাংলা ফজলুল হকের বাড়ি- এমন অনেক বাড়ি নিয়ে একটি ট্যুরিজম স

ার্কিট করা যায়।

ভালোবাসার কথাগুলো হয়ত খুব সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতে পারে
কিন্তু এর প্রতিধ্বনী কখনো শেষ হয় না।
— মাদার টেরেজা

দেশভাগ, উদ্বাস্তু আগমন ও জনবিন্যাসের রূপরেখা ঃ প্রসঙ্গ শিলিগুড়ি

ডঃ সুপম বিশ্বাস

দেশভাগ ও পরবর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল উদ্বাস্তু আগমন। দার্জিলিং ও পার্বত্য এলাকা ও তরাই অঞ্চল এই প্রভাব থেকে বাইরে ছিল

ভৌগোলিক কারণে শহর শিলিগুড়ি উদ্বাস্তুদের কাছে প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এর কারণই ছিল উত্তর-পূর্ব ভারত ও সমগ্র ভারতের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সীমারেখা বা তার কাছাকাছি অবস্থান।

১৯৪৬ সাল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দু বাঙ্গালীদের উদ্বাস্তু স্রোত বিভক্ত উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো দার্জিলিং জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। তবে এটা সত্য যে, এই উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালীদের সিংহভাগই শিলিগুড়ি শহরে স্থিত হয়েছিলেন। পাহাড়ে সেরকম ভাবে তাদের আগমন ঘটেনি, সমতল থেকে মূলত অবাঙ্গালিরাই (মাড়োয়ারি, বিহারি) ব্যবসা সূত্রে পাহাড়ে স্থিত হয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে তরাই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ছিল ১১৬৪৭৫ (শিলিগুড়ি ৬৪২৮০ জন), (খড়িবাড়ী ২৪৮৭৬ জন), (ফাঁসিদেওয়া ২৩৩১৯ জন)। এর মধ্যে বেশীরভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গ আসা শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা। এরা এখানে এসে মূলতঃ কৃষিজীবী হিসেবে জীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে এদের অনেকেই ব্যবসায়ী, ডাক্তার, আইন ব্যবসায় অবতীর্ণ হন। ১৯৫১ সালে তরাই। এলাকার জনসংখ্যার ১.৪৪ শতাংশ ছিলেন মুসলিম। এরা মূলত কৃষিকেই তাদের পেশা। হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬০ এর দশকে আসামে বঙ্গাল খেদা আন্দোলন সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রভাব ফেলেছিল। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে অসমীয়াদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ (মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙ্গালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে প্রকট হয়েছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। All Assam Students Union (AASU) ছিল এর পুরোভাগে। এছাড়া সমসাময়িক অহম সরকার, পুলিশ সহ প্রায় সমাজের সকলেই বাঙালি বিতাড়ন এই যজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। আসামের সমস্ত প্রশাসনিক উচ্চপদ থেকে বাঙ্গালিদের বিতাড়ন করা এবং বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় (কাছার) অসমীয়া ভাষার সরকারি স্বীকৃতি ছিল মূল লক্ষ্য। ফলে ১৯৪৭ সালের মত আরও একবার হিন্দু বাঙালিদের উদ্বাস্তু

হতে হয় এবং এই ইভাকুয়ীরা উত্তরবঙ্গে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আশ্রয় নেয়। অনেকে আবার আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান সংলগ্ন রিফিউজি ক্যাম্পগুলিতে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী সময়ে এদের সিংহভাগই আর আসামে ফিরে যায়নি। দার্জিলিং জেলার মূলত সমতলে এদের অনেকেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠে। এদের অধিকাংশ ছিল কৃষিজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হলে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৬.০৭.১৯৬০ থেকে ৩১.০৭.১৯৬০ পর্যন্ত দার্জিলিং জেলায় প্রায় ৭২৫ জন বাঙালি হিন্দু এসেছিলেন, যাদের মধ্যে ২৪০ জন পুরুষ, ৯৯ জন স্ত্রী এবং ৩৪৬ জন শিশু ছিল। ঐ বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৮৯-এ। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলায় ৪৯৭৫ এবং কোচবিহার জেলায় ৪২৮৩ জন বাঙালি হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে তারা আশ্রয় খুঁজে নেয়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশের জেলাগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় তা হল, বাংলা ভাগ নিয়ে সাহিত্যিক প্রতিফলন/চর্চা যতটা লক্ষ্য করা যায়, সেই তুলনায় আসাম থেকে উত্তরবঙ্গে আসা এই বাঙালি শরণার্থীদের নিয়ে সাহিত্যচর্চা বা ইতিহাস চর্চা নেই কেন, তা প্রশ্নাতীত নয়।

পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও বহু হিন্দী ভাষী মানুষ আসায় জনবিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এরা আসেন মূলত ব্যবসায়ী ও শ্রমিক হিসেবে। মূলত মাড়োয়ারিরা ব্যবসায়ী হিসেবে সমতলে আসা শুরু করে। আবার পূর্ব পাকিস্থান থেকে বাঙালি উদ্বাস্তুর সঙ্গে অবাঙ্গালি উদ্বাস্তুও এসেছিল। খালপাড়া ও মহাবীরস্থানের অবাঙ্গালিরা পূর্ব পাকিস্থান থেকে এসে ছিলেন। এদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ভুক্ত। যারা পূর্ব পাকিস্থানে মূলত পাটের ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও তারা প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে দেয়। জমি বিক্রি করার অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। এইভাবে বাংলাদেশের মাড়োয়ারিরাও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এরপর তারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এদের একটা বিরাট অংশ ডুয়ার্সের চা-শিল্পের সাথে যুক্ত হয়। যারা বিভিন্নভাবে বাঙ্গালিদের হাত থেকে এই বাগানগুলি কিনে নিয়েছে। শিলিগুড়ি শহরে এই অবাঙ্গালিদের একটা সিংহ ভাগই স্থিত হয়েছেন। তার নেপথ্যে অবশ্যই নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের আবির্ভাব, Assam Railway Link Project নামক নতুন পরিকল্পনার সূত্রপাত এবং কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় শিলিগুড়ি শহরের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক গুরুত্ব অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করেছিল। তাছাড়া দেশবিভাগ হওয়ার ফলে শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের

কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। একদিকে বালুরঘাট-মালদা অপরদিকে কোচবিহার-আলিপুদুয়ারের মধ্য স্থলে শিলিগুড়ি। এভাবে শিলিগুড়ি ক্রমশ বাণিজ্যের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। তবে শিলিগুডির উন্নতিতে সিকিমের অবদানও ভোলার নয়। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, শিলিগুড়িতে বরাবরই অবাঙ্গালিদের সংখ্যা একটু বেশি। ১৯৫১ সালে শিলিগুডি শহরের লোকসংখ্যা ১০৪৮৭ জন। এর মধ্যে বিহারি ছিল ২৯৬৪ জন, মাড়োয়ারি ছিল ১২০০ জন। অর্থাৎ ৪০ শতাংশ অবাঙ্গালি ছিল। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিহার থেকে ৪০২৮৭ জন। মধ্যপ্রদেশ থেকে ২২০৬ জন এবং উড়িষ্যা থেকে ২২৩১ জন শিলিগুড়ি শহরে স্থিত হয়েছেন। এদিকে ভারত-পাক যুদ্ধের সময়। (১৯৬৪-৬৫) পূর্ববঙ্গ থেকে বহু উধাস্তু শিলিগুড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল।

এবার আসছি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক রনবীর সমাদ্দার তার গবেষণাধর্মী গ্রন্থে "The Marginal Nation Transborder Migration from Bangladesh" (1999– New Delhi) তে দেখিয়েছেন যে "The War of Liberation in 1971– the deadly famine of 1974-75 severely affected the Bangladesh. The tragic death of S.K. Mujibar Rahaman in 1975– the demolition of Babri Masjid in Ayodhya in India in December 1992 had spill-over its effects in Bangladesh. Moreover– the rising fundamentalism during the tenure of Khaleda Zia Govt. since 2002 have accelerated the desire of the Bengali Hindus to free their places of origin." তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ায় হিন্দু আগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার একটি সিংহভাগ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকার মতো সমতল অঞ্চলে অর্থাৎ শিলিগুড়ি শহরে স্থিত হয়। বাঙালি হিন্দু ছাড়াও বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসীদের বিতাড়ন যজ্ঞ শুরু হয়। শিলিগুড়ি শহরে বলরাম নাথ, অরুণা ভট্টাচার্য, গোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে উলেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। গড়ে ওঠে 'শক্তিগড় পুনর্বাসন উন্নয়ন সমিতি'। উদ্বাস্তুরা বাড়ি তৈরির জন্য জমি পান, গৃহঋণ হিসেবে পান ১২৫০ টাকা। গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইংরেজ শাসনকালে ব্রহ্মদেশে গিয়ে ভারতীয়রা চাকুরী ও ব্যবসার সূত্রে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। ব্রহ্মদেশ ইংরেজ শাসনমুক্ত হয় ১৯৪৮ সালে। তারপর থেকেই শুরু হয় ভারতীয়দের উপর বিমাতৃসুলভ আচরণ। ১৯৬৪ সালের পর অধিকাংশ বাঙালি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ফিরে আসে। এদের মধ্যে অনেকেই ভাগ্যান্বেষণে চলে আসেন শিলিগুড়িতে, যারা "Burma Refugee" নামে পরিচিত ছিলেন। এরা অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী। অনেকেই শহরে এলোপ্যাথিক ওষধের দোকান প্রতিষ্ঠা করে।

পুরবার্তা ২০২১

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবন জীবিকার সন্ধানে উত্তরবঙ্গে চট্টগ্রামবাসী থেরবাদী বড়ুয়া বৌদ্ধদের আগমন শুরু হয়। এদের বেশীরভাগই চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী হযে ডুয়ার্স-তরাইয়ে বসবাস শুরু করে। অনেকেই চা বাগানে কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। এদের ছিল না কোন সমাজ, সংগঠন, বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষাসংস্কৃতির নিদর্শন। এই বড় বৌদ্ধদের দুর্দিনে ভিক্ষু অতুল সেন মহোদয় তাঁদের ত্রাতারূপে আবির্ভূত হন। সকলের সহযোগিতায় সর্বপ্রথম মালবাজারে প্রতিষ্ঠা করেন 'উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সেবাসংঘ'। পরবর্তীকালে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরবঙ্গে আরও ১০-১২ টি বৌদ্ধ সংঘ গড়ে ওঠে। ১৯৫০ সালের পর অতি অল্প সংখ্যক বড়ুয়া বৌদ্ধ শিলিগুড়িতে এসে জীবিকা অর্জনের পথ গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি শহরে গড়ে তোলেন বুদ্ধ ভারতী বিহার, বিদর্শন ধ্যান আশ্রম, গুরুংবস্তি বৌদ্ধ সমাজ মন্দির। এছাড়া ২০০৫ সালে শালুগাড়ায় গড়ে ওঠে "Humanistic Buddhist Mission"। ১৯৭০ সালে শ্রী দেবপ্রিয় বড়ুয়ার উদ্যোগে বুদ্ধ ভারতী বৌদ্ধ বিহারে 'বুদ্ধ ভারতী হাই স্কুলের' শুভারম্ভ হয়। শিলিগুড়িতে প্রায় দুই শতাধিক বৌদ্ধ বড়ুয়া পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।[৬]

শিলিগুড়ি শহরের একটি গ্রাম থেকে শহরে রূপান্তরের পেছনে এই উদ্বাস্তুদের আগমন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ সমীর কুমার দাস লিখেছেন-Siliguri- Once a large village comprising a few thousand inhabitants in the early twentieth century- turns into a city of Migrants pouring in from all sides and settled in." দেশভাগের পূর্বে শিলিগুড়িতে বসবাসকারী জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯৩০ সালে রাজস্ব রিপোর্টে দেখা যায়, বর্তমান দেশবন্ধুপাড়ার নাম ছিল রাজরাজেশ্বরী জোত। হাকিমপাড়ার নাম ছিল ব্রজসিং জোত। মিলনপল্লীর নাম ছিল কালীপ্রসন্ন সিং জোত। মহানন্দাপাড়ার পূর্ব নাম ছিল লম্বদাস মোহন জোত। বাবুপাড়ার নাম ছিল। সবুর জোত। তাহলে বর্তমানে যে মানুষদের দেখি তারা কারা? এদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত। তবে এদের পাশাপাশি অবাঙ্গালি উদ্বাস্তুরাও এসেছিল। খালপাড়া ও মহাবীরস্থানের অবাঙালিরা (বিশেষত মাড়োয়ারি সম্প্রদায়) পূর্ব পাকিস্থান থেকে এসেছিলেন। তাছাড়া ১৯৪৭ সালের পর জীবিকার অন্বেষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক লোক এসে এখানে বসবাস করছেন। এদের সংখ্যা উদ্বাস্তুর চেয়ে একেবারে কম নয়। এখানকার জনবিন্যাসে জোত সংখ্যক জাতি ও উপজাতির সংমিশ্রন ঘটেছে, তার সিকিভাগও গঙ্গার ওপার বাংলায় হয়নি। এই কারণে অনেকেই শিলিগুড়ি শহরকে "A Migrants Town" বলে থাকেন।[৭]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় ভারত-ভুটান ও ভারত-নেপাল মৈত্রী চুক্তি ভারত ও ভুটানে নেপালি অনুপ্রবেশে অণুঘটকের কাজ করে। ভুটানের নেপালিরা গঠন করে Bhutan State Congress। তাঁদের দাবী ওঠে ভুটানে বসবাসকারী সকল নেপালিদের নাগরিকত্ব প্রদান ও সরকার প্রশাসনের বিভিন্ন পদে তাঁদের নিয়োগ। এই সকল দাবী নিয়ে তারা ভুটানের সরভং জেলাতে ১৯৫৪ সালে সত্যাগ্রহে সামিল হয়। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভুটান সরকার কড়া হাতে দমন করে এবং বলে যে, এই সকল সত্যাগ্রহী অনাবাসী নেপালিরা ভারত বা নেপালে গিয়ে বসবাস করুক। ভুটানের দ্রুকপারা মনে করে যে, তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতি আজ বিপন্ন এবং এজন্য এই নেপালিরাই দায়ী। ১৯৫০ সালে শুরু হয় বিক্ষোভ আন্দোলন। ফলস্বরূপ ভুটান থেকে অনাবাসী নেপালিরা দার্জিলিং পাহাড়, ডুয়ার্স, তরাই, সিকিমে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ১২০০০০ উদ্বাস্তুর মধ্যে ৮৯০০০ জন নেপালের ঝাঁপা ও মোরং জেলাতে আশ্রয়। নেয়। আবার বিশ শতকের আশির দশকে আসামে AASU (All Assam Students Union) কর্তৃক নেপালি বিতরণ এবং মেঘালযে আলি-কুলি-নেপালি বিরোধী আন্দোলনের ফলে বহু নেপালি পাহাড়, ডুয়ার্সের মতো শিলিগুড়িতে এসেও আশ্রয় নেয়। ফলে এখানকার জনবিন্যাস দ্রুত পাল্টাতে থাকে।

শিলিগুড়ি শহরে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে নেপালি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু ১৯৮৬ সাল থেকে জি.এন.এল.এফ আন্দোলনের সময় থেকে সমতলে নেপালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা বাগডোগরা, শিবমন্দির, মেডিক্যাল সংলগ্ন এলাকায় স্থিত হয়েছেন। চাঁদমনি চা বাগানে যে অত্যাধুনিক আবাসন কমপ্লেক্স 'উত্তরায়ণ' গড়ে উঠেছে, তার অধিকাংশই বাসিন্দা হলো প্রাক্তন গোর্খা সৈনিক। চম্পাসারি এলাকাতেও প্রচুর নেপালি মানুষের বাস। ফলে শিলিগুড়ির জনবিন্যাস দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বর্তমানে গোর্খা জনমুক্তি মাচো গোর্খাল্যান্ডের প্রস্তাবিত যে মানচিত্র পেশ করেছে, তাতে শিলিগুডিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তা এই নেপালিভাষী মানুষের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে। আসলে দার্জিলিং পাহাড়ে আর নতুন করে বসতি স্থাপনের সুযোগ নেই। অথচ ১৯৫০ সালে ভারত-নেপাল মৈত্রী চুক্তির সুযোগ নিয়ে নেপাল থেকে লোক এসে ভিড় করেছেন। এই নব্য নেপালিরাই শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স, তরাইয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, শিলিগুড়ি দেশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরাপত্তার কারণে। এখান থেকে মাত্র ৫০০ কিমি দূরত্বে রয়েছে সিকিম ও ভুটানের সংযাগে স্থলে অবস্থিত তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা। চিন এখানে স্থায়ী সেনা কাঠামো গড়ে তুলেছে। এছাড়া রেলব্যবস্থারও সম্প্রসারণ করেছে। সেজন্য দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নিরাপত্তার স্বার্থে এই অঞ্চলকে বিশেষ পরিচয় পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। (উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৩/০৩/২০১২)। অতি সম্প্রতি বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলার দাবি তোলা হয়েছে। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, শিলিগুড়ি জেলা হলে প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য এখানকার মানুষকে আর পাহাড়ে যেতে হবে না, তেমনি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়বে। ভবিষ্যৎই এর উত্তর দেবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. S. A. Mitra- West Bengal District Census Handbook– Darjeeling– 1954

২. আনন্দ গোপাল ঘোষ, কার্তিক সাহা- ১৯৪৭-পরবর্তী উত্তরবঙ্গ/১, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, শিলিগুড়ি, ২০১৩, পৃষ্টা-১৩৪-১৪১.

৩. বাবুল কুমার পাল - বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য, মিত্রম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্টা-৬৩,

৪. আনন্দ গোপাল ঘোষ, নির্মল চন্দ্র রায়- ১৯৪৭-পরবর্তী উত্তরবঙ্গ/২, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, শিলিগুড়ি, ২০১৪, পৃষ্টা-৫৩,

৫. শ্রী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়- শিলিগুড়ি (পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস), হিমালয় পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, তৃতীয় সংস্করন, ২০০৪, পৃষ্টা-৩৯

৬. বরুণ বিকাশ বড়ুয়া- উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধবিহার ও কিছু বৌদ্ধ আচার, শিলিগুড়ি, ২০০৯, পৃষ্টা-৪৮

৭. আনন্দ গোপাল ঘোষ, নির্মল চন্দ্র রায়- প্রাগুক্ত, পৃষ্টা-১০৩।

৮. মনিদীপা নন্দী বিশ্বাস- অস্থিরতার উৎস সন্ধান- প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি, তিতির, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০৯, পৃষ্টা-১৫৫

৯. J.B. Bhattacharjee (ed.) - Social Tension in North-East India– Research India Publications– Calcutta– 1982

মিত্রসম্মিলনী ঃ শিলিগুড়ির নাট্যপ্রবাহের শতাব্দীর স্রোতস্বিনী এক

পার্থপ্রতিম মিত্র

ইতিহাসের চর্চাতেই ইতিহাসের সজীবতা। ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে অকথিত ইতিহাসের অন্বেষণ অভিযান, ইতিহাসের উপাদানসুত্রে অনালোকিত জনপদ-প্রতিষ্ঠান -ব্যক্তির ভূমিকার মূল্যায়ন সূত্রে ইতিহাসের বিনির্মাণ এবং লিখিত স্বীকৃত ইতিহাসের পটভূমি-প্রভাবক-প্রেক্ষিত বিচারে প্রয়োজনীয় সংযোজন-সংশোধনের জরুরি দাবি-দাওয়ার মধ্যেই আছে ইতিহাসের হৃদয়স্পন্দন। নচেৎ ইতিহাস মৃত। ইতিহাস অনুশীলনেও তাই কেম্ব্রিজ মেথড, সাব অলটার্ন মেথড, মার্কসিয়ান হিস্ট্রি — হরেক শিরোনামে পদ্ধতিগত দিকের (Methodology) বিবিধ মনোভঙ্গী। আমরা এখানে বঙ্গনাট্যশালার এক অনালোকিত অধ্যায়ের সংযোজনের অভীষ্টে অন্বিষ্ট ।

এ এক জনপদের আখ্যান। জনপদের সাংস্কৃতিক চালচিত্র — একটি রঙ্গমঞ্চের নির্মাণ কথা। একটি প্রতিষ্ঠানের পল্লবিত হয়ে ওঠার গল্প। বাংলার উত্তরের পাহাড়তলির জনপদ শিলিগুড়ি। দার্জিলিং জেলার ৯১৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের সমভূমি জুড়ে শিলিগুড়ি মহকুমার সদর শহর শিলিগুড়ি মহানগরীর ঠাট-বাঁট-জৌলুসে আজ উত্তরের অলিখিত রাজধানীর গুমোরে বাণিজ্য নগরীর শিরোপা চাপিয়েছে বেশ। এ এক অদ্ভুত বিভাজন। কলকাতা সংস্কৃতির মহানগর আর শিলিগুড়ি বাণিজ্য নগরী। এ যেন কলকাতায় বড়বাজারের ঝুনঝুনওয়ালার গদিতে ডালদার টিনের ফাঁকে ফাঁকেও সংস্কৃতির হদ্দমুদ্দ আর উত্তরের এই তরাইভূমি যেন চৌদ্দটি নাটকের দল, অসংখ্য সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, নৃত্য প্রতিষ্ঠান, বাচিক শিল্পীদের প্রতিষ্ঠান, চিত্রশিল্পী আর ভাস্করদের আখড়া, লিটিল ম্যাগাজিন, সিনেক্লাব সবনিয়েই বুঝি বেনিয়ার গর্ভে লীন। আমাদের কেউ কেউ বলে শহর শিলিগুড়ির এতসব সাংস্কৃতিক আয়োজন হচ্ছে আসলে বাণিজ্য শিরোপায় সংস্কৃতির কটি রঙিন পালক লাগানো। তাই সই! বাণিজ্যনগরী ফ্লোরেন্সের সংস্কৃতির সাথে কোন বিরোধ না থাকলে শিলিগুড়িরই বা থাকবে কেন? সিটি অফ ট্রেড-টি-ট্রান্সপোর্ট-টিম্বার-ট্যুরিজমের অভিধা নিয়ে বড়াই করা এই শহর শিলিগুড়িকে ক্রীড়াঙ্গনের মানুষেরা বড় দরদ দিয়ে ডাক পেরেছিল 'সিটি অফ টেবিলটেনিস'। আর আমাদের মঞ্চের মানুষদের বলা কওয়াতে 'সিটি অফ থিয়েটার'। সেই 'সিটি অফ থিয়েটার' উৎসের খোঁজেই এ এক উজানযাত্রার অভিযান।

বড়গলায় যে জনপদের সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে বড়াই করলাম, সেকি তার মাটির সংস্কৃতি? এ বড় নবীন মাটি। নিজস্ব সংস্কৃতির কথাকৃতি সাজানোর মতো বয়সটাও পেরোয় নি বুঝি!

পুরবার্তা ২০২১

আজকের শিলিগুড়ির গোটা অঞ্চলটাই ছিল জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। এ ছিল বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের ভূ -সম্পত্তি। আজকের শিলিগুড়ি-শহরের অস্তিত্বই তখন ছিল না। ১৮৩৫ ! সিকিমরাজের হাত থেকে দার্জিলিং জেলা আসল ব্রিটিশের অধীনে। শিলিগুড়ি যুক্ত হ'ল দার্জিলিং জেলার সঙ্গে। তখন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত ফাঁশিদাওয়াতে। তখনকার শিলিগুড়ি এখনকার শিলিগুড়ি শহরের দক্ষিণদিকে শক্তিগড় এলাকায় রাজবংশী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এক ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। ১৮৭২ ! দক্ষিণ বঙ্গের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনে মিটার গেজ আর শিলিগুড়ি থেকে তিনধারিয়া যোগাযোগ সূত্রে (দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডি এইচ আর) বসানো হ'ল ন্যারোগেজ। নির্মিত হ'ল সাবেক ই বি রেলওয়ের স্টেশন ভবন। স্টেশনের নাম দেওয়া হ'ল শিলিগুড়ি। ফাঁসিদাওয়া থেকে মহকুমা আদালত ও অন্যান্য সরকারি অফিস স্থানান্তরিত হ'ল শিলিগুড়িতে। অরণ্যসঙ্কুল, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত শিলিগুড়ি। কর্মসূত্রে আসল রেল কর্মচারীরা, অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়ারা, ব্যবহারজীবী, কাষ্ঠ ব্যাবসায়ী, চা-বাগান বাবুরা, চিকিৎসক এবং বেশ কটি পাট কোম্পানীর গুদাম ঘরের সুবাদে পাট কোম্পানীর কর্মচারীরা। সব মিলিয়ে জনসংখ্যা হাজার তিনেক। সেইসময়, মহানন্দা তীরে গণেশ রামের আমবাগানের আটচালায় শুরু হয় এক সান্ধ্য আড্ডা। এই আড্ডার থেকেই ক্রমে গঠিত হয় 'ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন' নামে এক সাধারণ মিলনস্থল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন মোক্তার কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, মোক্তার হরসুন্দর মজুমদার, ডাঃ ভাগবত বিশ্বাস, মন্মথ নাথ সরকার, চন্দ্রমোহন রায় প্রমূখ।

এঁদের মধ্যে মোক্তার কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ছিলেন নাট্যপ্রাণ মানুষ। বর্ধমান জেলার করুই থেকে এসেছিলেন পেশাসূত্রে। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলকে দৃষ্টিগোচরে আনার ক্ষেত্রে বর্ধমান মহারাজার বুঝি পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ৫০ ফুট চওড়া শিলিগুড়ির প্রথম রাজপথটি নির্মিত হয়েছিল বর্ধমান মহারাজার সৌজন্যে। এই পথ দিয়েই বর্ধমানের রাজমাতার জন্য গরুরগাড়ী করে গঙ্গাজল নিয়ে আসা হ'ত। যাই হোক, ১৯০২-০৩ সাল নাগাদ কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে 'ফেন্ডস ইউনিয়ন' চাতালেই শুরু হয় এক নাট্য প্রযোজনার উদ্যোগ। ততদিনে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ পেরিয়ে এসেছে বেশ কিছু চড়াই উৎরাই। মূলত মহানগর কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণ আন্দোলন এবং তার সাংস্কৃতিক অভিমুখে একের পর এক নাগরিক থিয়েটার প্রযোজনায় আগুন-ঝড়ের পর্ব পেরিয়ে এসেছি আমরা। মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য বাংলার নানা অংশ থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের আলোকপ্রাপ্ত যুবকেরা কলকাতায় থাকার সুবাদে, মঞ্চাভিনয়ের প্রক্ষোভকে ধারণ করে, শিক্ষা শেষে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাংলার নানাপ্রান্তে। কালীপ্রসন্ন বাবুও বুঝি বহন করতেন এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এই চেতনাই তার নাট্য নিমগ্নতার উৎসমুখ। দিনের পর দিন ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আট চালায় নাটকের মহলা চললেও এই নাটক শেষপর্যন্ত প্রযোজিত হতে পারে নি। প্রযোজনার জন্য কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় পোশাক ও সাজসজ্জা কিনতে কলকাতায় পাড়ি দেন। সেখানে কলেরা

রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। অসম্পূর্ণই থেকে যায় সেই নাট্য প্রযোজনা।

কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের জামাতা সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের আদি নিবাস বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের কাটোয়া সাব ডিভিশনে। সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য নিজে ছিলেন একসময়ের প্রেসিডেন্সীর ছাত্র। একাধারে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি-তে সম্মাননা লাভ করেন তিনি। তিনি ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ ছাত্র। এই ভট্টাচার্য পরিবারের নিজস্ব এক স্বর্ণালী ইতিহাস আছে, সপ্তপুরুষ আগে এই পরিবারেরই শিবরাজ বাচস্পতি ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর বাবা গয়ারাম সিতিকণ্ঠ ছিলেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক। তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ নেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আইন পাশ করে এসে ব্যবহারজীবী রূপে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যোগ দেন বহরমপুর কোর্টে। সেখান থেকে তার শিলিগুড়ি আগমন ও শিলিগুড়ি আদালতে যোগদান। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যই ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে বঙ্গীকরণ করে নামকরণ করেন 'মিত্র সম্মিলনী'। নির্মীয়মান শহরে একটি স্থায়ী মিলনস্থানের প্রয়োজন অনুভবে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রদান করেন একখন্ড জমি। মিত্র সম্মিলনীকে জমি প্রদানের শর্তরূপে ছিল প্রতিবছর একচালা দুর্গাপ্রতিমার পুজো এবং নিয়মিত নাট্যচর্চা, নুন্যতম পক্ষে বিজয়া সম্মিলনীতে একটি এবং সমাবর্তনে একটি নাট্যপ্রযোজনার অলিখিত নির্দেশিকা। বাংলা ১৩১৫, ইংরাজী ১৯০৯ সালের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মিত্র সম্মিলনীর যাত্রা শুরু। নিয়মিত নাট্যচর্চার শর্তে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রদত্ত জমিতে একেবারে শুরুতে মঞ্চটুকুই নির্মিত হয়েছিল। কেমন ছিল সে মঞ্চ? ''শালকাঠের খুঁটি, শালকাঠের মেঝে, তিনদিকে টিনের দেওয়াল, টিনের চাল এবং সামনে কয়েকটি টিনের ঝাপ, অনেকটা কোনও গঞ্জের একটা বড়সড় দোকানঘরের মতো।'' তবে মিত্র সম্মিলনী প্রযোজিত প্রথম নাটক 'হরিশচন্দ্র' প্রযোজিত হয় ১৯১৪-তে। মিত্র সম্মিলনী মঞ্চের সামনে ছিল উন্মুক্ত সবুজ গোচারণভূমি। অভিনয়ের দিনে এখানে বাঁশের উপর ত্রিপল খাটানো হোত। দর্শকদের বসার জন্য ছিল ঘাসের উপর ত্রিপলপাতা, মহিলাদের জন্য পিছন দিকে চৌকী পাতা হত। আর ছিল চিকের ব্যবস্থা। ভিনরাজ্যের মানুষেরা এই মঞ্চটিকে বলত 'নাচঘর'। এইসময়ের অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন অতুল দত্ত, কার্ত্তিক চন্দ্র দে, মন্মথনাথ সরকার প্রমুখ। মহিলা চরিত্রে রূপদান করতেন রাজেন সরকার, রাজেন বক্সী প্রমুখ। পরবর্তীতে অভিনেতা রূপে যোগদান করেন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র অবনীনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার প্রমুখ। প্রথমযুগে প্রযোজিত অন্যান্য প্রযোজনাগুলি হল 'বনবীর', 'হরিরাজ', 'মেবারপতন', 'ময়ূর সিংহাসন', 'রঘুবীর' ইত্যাদি। দুর্গাপুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, শ্রীপঞ্চমী, দোলযাত্রা উপলক্ষে নিয়মিত নাট্যপ্রযোজনার সাক্ষী মিত্র সম্মিলনী। প্রায় নাটকই ছিল পঞ্চমাঙ্ক। নাটক শুরু হতো রাত ১০টা নাগাদ। শেষ হতে হতে ভোর হয়ে যেত। নাটক শুরুর আগে বা বিরতিতে ছোট ছেলের দল মেয়ের বেশ নিয়ে সখীনৃত্য করত। মঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় দেখা যেত রোল সীনের ব্যবহার। মঞ্চালোক বলতে ছিল মঞ্চে টাঙানো একটি চোদ্দ বাতি আর সামনে একসারি মোমবাতি। ১৯১৭-তে মঞ্চালোক উন্নীত হয়

দে-লাইটে (দে-কোম্পানীর লাইট) আর ফুটলাইটে মোমবাতির পরিবর্তে আসে কার্বাইডস্টিক ল্যাম্প। দর্শকাসনে থাকতেন শহরের সীমিত সংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়, রেলকর্মচারী, পদস্থ সরকারী কর্মচারী, এস ডি ও বা বিভাগীয় কমিশনার প্রমুখ আমন্ত্রিত বৃটিশ রাজপুরুষ।

১৯২৪! প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'হরিশচন্দ্র' নাট্যপ্রযোজনা বিঘ্নিত হলে মিত্র সম্মিলনীর পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনগণের কাছে অর্থ সংগ্রহে নেমে পরেন সম্মিলনীর প্রথম সারির সদস্য সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অবনীনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার, কার্তিকচন্দ্র দে প্রমুখ। রঙ্গমঞ্চর নক্সা ও নির্মাণ কাজে তদারকি করেন সুরেন্দ্রনাথ রায়, বামাচরণ ঘটক,লালমোহন মৌলিক প্রমুখ। রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে প্রবেশ মূল্য ধার্য হয় এক টাকা, আট আনা ও চার আনা। ব্যালকনি বা প্রেক্ষাগৃহের দ্বিতল থাকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তার প্রবেশ মূল্য থাকে আট আনা।

মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের সাথে সাথেই উদ্বর্তিত হয় নাট্য প্রযোজনার আঙ্গিক। রোল সিনের পাশাপাশি দ্বিমাত্রিক মঞ্চ স্থাপত্য সৃজিত হতে থাকে। সিঁড়ি সহ দোতালা বাড়ি, প্রাচীরসহ কোঠাবাড়ি, দরজাসহ চালাঘর, অশ্বসহ রথ, 'সীতা' নাটকে মঞ্চের পাটাতন ফুড়ে সীতার পাতাল প্রবেশ, 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে ইবি রেলের ট্রেনের কামড়া ও স্টেশন প্ল্যাটফর্ম, 'কর্ণার্জুন' নাটকে রোল সীনের ফোকড় দিয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে অবিরাম বস্ত্র জোগান দেওয়া ইত্যাদি, আঙ্গিকগত চমক দর্শককে আপাত মোহিত করে তোলে। আবহ সৃজনে ব্যারেলে পাথর ভরে গড়িয়ে দিয়ে মেঘগর্জন, দুইটি নাড়কেল মালাকে দড়ি বেঁধে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, হ্যাকল হর্ণ বাজিয়ে মোটর গাড়ির সংকেত ইত্যাদি লোক প্রযুক্তির পরিমিত ব্যবহার উল্লেখের দাবি রাখে। ত্রিশের দশকে এসে এক ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানী (বিজলি টকিজ) নিজস্ব জেনেরেটর সহ মিত্র সম্মিলনী প্রেক্ষাগৃহ সিনেমা ব্যবসার জন্য ভাড়া নেওয়ার সুবাদে মঞ্চে দে-লাইটের পরিবর্তে ইলেকট্রিক বাল্বের একটি টপচেইন এবং স্নেকহুড শেড্-এ কয়েকটি বাল্বের ফুটলাইট ব্যবহার শুরু হয়। মহানগর কলকাতার সঙ্গে রোজকার সরাসরি যান যোগাযোগ না থাকা একটি প্রান্তিক শহরে, মঞ্চপ্রযুক্তি নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা নিরীক্ষার ঋত্বিক পুরুষ থিয়েটার মাষ্টার বলে পরিচিত অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। মিত্র সম্মিলনীর প্রযোজনা মিছিলে, একের পর এক আসতে থাকে 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মহানিশা', 'বিজয়া', 'মন্ত্রশক্তি', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'মাটির ঘর', 'রক্তের ডাক', 'দুই পুরুষ', 'ভালো মাস্টার', 'কালিন্দী', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'রণজিত সিংহ', 'টিপুসুলতান', 'বঙ্গেবর্গী', 'আলিবাবা', 'শাজাহান', 'বঙ্গে নারী', 'রাষ্ট্র বিপ্লব', 'দ্বীপান্তর', 'পরিচয়', 'শতবর্ষ আগে' ইত্যাদি।

বিশের দশকে মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চ শিশির কুমার ভাদুরীর 'সীতা' নাটকের প্রযোজনা ধন্য। ত্রিশের দশকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নিহারবালা ও সম্প্রদায়ের নাট্যভারতী 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মিশরকুমারী', 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রশেখর'

প্রযোজনা করেন। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও সম্প্রদায় এসেছিলেন 'সাজাহান' প্রযোজনা নিয়ে। চল্লিশের দশকে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শিলা হালদার গণনাট্যর পক্ষে মিত্রসম্মিলনী মঞ্চে অভিনয় ও সংগীত পরিবেশন করেন। চারের দশকে প্রযোজিত হয় তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ঋত্বিকরা বারবার পদচিহ্ন এঁকেছেন মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চে। আমাদের মননের আয়োজনকে পূর্ণতা দিতে মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য মুখ। অসংখ্য সংঘের সৃজনের সমারোহ। কতই না দুর্লভ মুহূর্ত! স্মৃতি-বিস্মৃতির ধোঁয়া ধুলোর মাঝে মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চকে ঘিরে সেইসব কথাকৃতি বঙ্গরঙ্গমঞ্চর বিস্মৃত ইতিহাস রচনার উপচাররূপে নেহাত অকিঞ্চিৎকর নয়। এই মঞ্চেই বহুরূপীর 'পুতুল খেলা' প্রযোজনায় তৃপ্তি মিত্রর গুমরানো কান্না-লুটিয়ে পরা আঁচলে মঞ্চে শাঁওলি মিত্র ছুটছে 'পাগলা ঘোড়া' — প্রযোজনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাপুটে পদচারণা- আন্দ্রিয়া হয়ে 'মা'কে পড়াচ্ছে জ্ঞানেশ মুখার্জী-'জন্মভূমি'তে সিগারেটের রিঙ ছাড়ছে বিডিও চরিত্রে শেখর চ্যাটার্জী-অ্যান্টনি কবিয়াল সবিতাব্রত দত্ত উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে যাচ্ছে গান- এই মঞ্চেই শরীর হিচড়ে মনোজ মিত্র 'সাজানো বাগান' প্রযোজনায় -'রাজরক্ত'তে ফেরীওয়ালা হয়ে নাচছে বিভাস চক্রবর্তী - 'মেরী বাবা মেরী বাবা' গানে মাতাচ্ছে 'মারীচ সংবাদ' — লাল হলুদ পতাকা নাড়তে নাড়তে নান্দীকার গাইছে ''বাপ নেই তোর বাপ নেই তোর বেজন্মা তুই রেফারী''-সত্যের আমসত্ব ফেরী হচ্ছে 'সায়ক' প্রযোজনা 'দুই হুজুরের গপ্পো'- এই মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চেই 'শৌভনিক'-এর 'গোরা', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', অভিনেতৃ সঙ্ঘের 'বিদেহী' ও 'শেষরক্ষা', থিয়েটার গিল্ডের 'গৃহদাহ', 'যদুবংশ', থিয়েটার কমিউনের 'কিংকিং', 'দানসাগর' এবং এইভাবেই আরো আরো অনেক প্রযোজনার পর প্রযোজনা। যাটের দশকের শেষে মিত্র সম্মিলনীর সংগঠনায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রান্তের প্রত্যন্তের নাটকের দলেরা এসেছে- মিত্র সম্মিলনী মঞ্চের স্পটবাতির আলোকবৃত্তে বাঁধা পরেছে তাদের শৈল্পিক মঞ্চভাষা। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি, শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ, বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর পূর্তিতে মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চ সাক্ষী থেকেছে নাট্যোৎসবের।

শহর শিলিগুড়িতে বহিরাগত মানুষের পাঁচ-মিশেলি সমাজে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ছিল। যদিও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতে এ ভূমিও সময়ে সময়ে আন্দোলিত হয়েছে। মিত্র সম্মিলনীর প্রথম পর্বে প্রযোজনার জন্য কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটক নির্বাচন করতেই দেখা গিয়েছে। মিত্র সম্মিলনীর কর্মকর্তারা আপাতভাবে বৃটিশরাজের প্রতি আনুগত্যই প্রদর্শন করেছেন। অন্যতম কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন রায়সাহেব উপাধি প্রাপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশরাজের লালচোখকে উপেক্ষা করে মিত্র সম্মিলনী 'নীলদর্পণ' প্রযোজনা করবে এটা প্রত্যাশিত নয়। তবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় এক অন্তঃসলিল প্রবাহ ছিল। ১৯২৫

সালে মহাত্মা গান্ধী দার্জিলিং যাওয়ার আগে শিউমঙ্গল সিং-এর বাড়ীতে রাত্রিবাস করেন। সন্ধ্যেতে মিত্র সম্মিলনী মঞ্চেও এক ঘরোয়া সভায় মিলিত হন। ওই বছরই শিশির ভাদুড়িও এসেছিলেন তাঁর 'সীতা' নাটক নিয়ে। ইতিমধ্যেই শিশির কুমার ভাদুড়ি ও চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে একটি জাতীয় নাট্যশালা নিয়ে মত বিনিময় হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাশ শিশির ভাদুড়ির কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন দার্জিলিং থেকে ফিরে এলে জাতীয় রঙ্গমঞ্চর নির্মাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবেন। গান্ধীজির দার্জিলিং পরিভ্রমণ কালে চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন দাজিলিঙেই। ১৬ জুন দার্জিলিঙে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। তার প্রয়াণের পনেরো দিনের মাথায় মিত্র সম্মিলনী 'দেবলা দেবী' নাটকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে প্রদান করে। কুশিলবদের মধ্যে দু'একজন স্বরাজ দলের অনুগামী ছিলেন। ১৯৩১-এর এপ্রিলে দেশপ্রাণ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য শিলিগুড়িতে আসেন এবং মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চেই সভা করেন। এর উত্তরপর্বে পৌরাণিক নাটকের সাথে সাথে ঐতিহাসিক নাটক নির্বাচনের প্রবণতাও লক্ষণীয়, যে নাটকগুলিতে দেশপ্রেম-সিঞ্চিত জাতীয়তাবাদী চেতনার বার্তা উচ্চকিত ছিল। চল্লিশের দশকে আই পি টি এ-র অনুষ্ঠান হয় মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চে। পঞ্চাশের দশকে একদল তরুণ সদস্য সামন্ত সংস্কৃতি আর রক্ষণশীল মনোভাবে আঘাত হানে। এতদিন পুরুষেরাই নারীচরিত্রে রূপদান করত। প্রথম 'কালিন্দী' নাটকে অংশ নেন শহরের পাঁচ মুক্তমনা নন্দিনী। ষাটের দশকে ম্যাক্সিম গোর্কির 'নীচের মহল' প্রযোজনাকে কেন্দ্র করে প্রবীণ-নবীনের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত বাধে। সেইসময় নক্সালবাড়ি আন্দোলন খ্যাত চারু মজুমদার এবং সৌরেন বসু দুজনেই মিত্র সম্মিলনীর নাট্যবিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে মিত্র সম্মিলনীতে কোনোদিনই দলীয় রাজনৈতিক সংকীর্ণতার অনুপ্রবেশ ঘটে নি। বরঞ্চ ভিন্ন রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসী মানুষদের এক সাংস্কৃতিক সহাবস্থান লক্ষ করার মতো। ১৯৭২ সালে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তিতে 'নীলদর্পণ', 'প্রফুল্ল', 'সাজাহান' থেকে 'তিন পয়সার পালা' পর্যন্ত মোট বারোটি নাটকের নির্বাচিত অংশ প্রদর্শনে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ধারাটিকে সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়। যার গ্রন্থনার দায়িত্বে ছিলেন ডঃ অশ্রুকুমার শিকদার। প্রতিটি নাট্যাংশের সাথে ছিল স্লাইড প্রক্ষেপণে পটভূমি বর্ণনায় ভাষ্য। 'তিন পয়সায় পালা'-র নির্বাচিত অংশে অভিনয়ে অংশ নেন কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে আগত নান্দীকারখ্যাত অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মিত্র সম্মিলনীর তিনটি প্রযোজনা-- বাদল সরকারের 'কবি কাহিনী' জোসেফ কেডেনলরিং -এর 'বীতংস' এবং ডঃ অশ্রুকুমার সিকদারের 'এক যে ছিল ঘোড়া' কলকাতার রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে মিত্র সম্মিলনীর তিনদিনের নাট্যাৎসবে প্রযোজিত হয়। এই নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন শম্ভু মিত্র, সফল তিনটি নাট্যপ্রযোজনা দেখে সেদিনের Statesman মন্তব্য করেছিল "It appears to be the sacreduty duty of North Bangal to send over every year– a group to save theatre in Calcutta from inarticulate glumness..." আশির দশকের শুরুতে

মিত্র সম্মিলনীর নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে একসময়ে বাদল সরকারের 'শতাব্দী' দলের নাট্যকর্মী ড. শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'স্পার্টাকুস' ও 'মিছিল' প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে এই জনপদের থার্ড থিয়েটার চর্চার দিশারী করেছেন মিত্র সম্মিলনীকেই।।

শোভা সেন 'নবান্ন থেকে লালদুর্গ' শীর্ষক বইতে লিখছেন ''শিলিগুড়ির মানুষ চিরকালই নাট্যপ্রেমী, দর্শক হিসাবে চমৎকার।" এর উৎসে রয়েছে মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চ। যে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের পটভূমিতে এক আলোকপ্রাপ্ত পরিবার। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পৌত্র প্রথমে সিকিম হাইকোর্ট ও পরবর্তীতে মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত আনন্দময় ভট্টাচার্য ছিলেন আমৃত্যু মিত্র সম্মিলনীর সদস্য। শতবর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে মিত্র সম্মিলনীর রঙ্গমঞ্চ পুনর্নির্মিত হয়। যদিও প্রমোটারের মাধ্যমে না হয়ে শহরের মানুষের সহযোগিতায় মিত্র সম্মিলনী কর্তৃপক্ষই নির্মাণ কাজের দায়িত্ব নিলে পুনর্নির্মিত মঞ্চও নাট্য প্রযোজনার উপযুক্ত হয়ে উঠত। নবনির্মিত মঞ্চে নাট্যচর্চার জন্য নানা সীমাবদ্ধতা, নানা প্রতিবন্ধকতা। বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাসে একটি সংঘ পরিচালিত রঙ্গমঞ্চর শতবর্ষপূর্তির গরিমা কম নাকি?

বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাসে শিলিগুড়ির নাট্যমোদী মানুষের যূথবদ্ধ প্রয়াসের ফসল মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চ আজও এক জীবন্ত ইতিহাস।

আশ্রয় /--

১) বাংলার শতাব্দী বরণে মিত্রসম্মীলনী রঙ্গমঞ্চে পঠিত নানু মিত্রর বক্তব্য

২) মিত্রসম্মীলনী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ

৩) মিত্রসম্মীলনী প্যাটিনাম জুবিলি স্মারক গ্রন্থ

৪) মিত্রসম্মিলনী শতবার্ষীকী স্মারক গ্রন্থ

৫) মধূপর্ণী --- দার্জিলিঙ জেলা সংখ্যা

৬) শিলিগুড়ী নাট্যমেলা ২০০৮ বুলেটিন

৭) আলাপচারিতায় তথ্য সংগ্রহ—

নানু মিত্র, ডঃ অশ্রু কুমার সিকদার, ডঃ শ্যামা প্রসাদ ভট্টাচার্য, পীযুষ ঘটক (বিশ্ব বাগচী ছদ্মনামে দৈনিক বসুমতি তে শিলিগুড়ির নাট্য ইতিহাস লেখার সূত্রে), সৌরেন বসু, ডাঃ লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (সিসিএন পরিচালিত সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুবাদে), অজিত চক্রবর্তী, জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য, সৌরেশ মিত্র, রঞ্জিত মিত্র, রুণু মিত্র প্রমূখ। এবং

৮) শৈশব ও কৈশোরক দিনের দর্শক স্মৃতি।

শহর শিলিগুড়ির পরিবেশ ভাবনা

অনিমেষ বসু

জনপদ থেকে নগর বা শহর গড়ে ওঠে । কিন্তু শিলিগুড়ির মতো আর কোন জায়গায় এমন অস্বাভাবিক দ্রুততায় জসংখ্যা ও শহরের বৃদ্ধি ঘটেনি । যদিও উত্তরবঙ্গে আরও একটি জায়গায় একবারে গ্রাম থেকে নগর হয়েছে দ্রুততম সময়ে , সেটা ভুটান সীমান্তের জয়গাঁ ।

ফিরে আসি শিলিগুড়ির কথায় , এত কম সময়ে এই শহরের বৃদ্ধি দেখে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মানস দাশগুপ্ত মজা করে বলতেন , ''যেন ম্যাজিক ! ছিল রুমাল, হল বেড়াল '' । যেহেতু শিলিগুড়ির নগরায়ণ ঘটেছে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই এবং বেসরকারি উদ্যোগে , এবং দ্রুত বৃদ্ধির কারণে কোন সরকারি পরিকল্পনা বেশিদিনের জন্য কার্যকর হয়নি । আর পরিকল্পনাহীন একটি শহর গড়ে ওঠার কারণে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয়েছে তা এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের । ভারসাম্য রেখে ''উন্নয়ন'' , বা ''সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট '' এখানে গাল ভরা কথাতেই রয়ে গেছে। মাত্র পাঁচটা দশকের মধ্যে যে ''উন্নয়ন ' এই শহরে হয়েছে তার বেশিটাই ''কংক্রিটের জঙ্গল '' বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে । বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জনসংখ্যার চাপে আবাসনই হয়ে উঠল শহরের প্রধানতম 'উন্নয়ন'' ,দোকান , বাজার বাড়তে লাগল হু হু করে । অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার উত্তরের যে কোন জায়গার তুলনায় তর তর করে বাড়তে থাকল । রোজগারের সহজলভ্যতায় আরও ভির বাড়তে লাগল। ফাঁকা কোন জায়গা পড়ে থাকলো না। পাঁচকাঠা জায়গায় পাঁচ জনের পরিবারের বদলে ঠাই হোল ১৫০ জনের । তার জন্য নূন্যতম পাঁচটি বড় গাছ বা বৃক্ষ কাটা পড়ল । আর একই জায়গায় পাঁচ জনের পরিবর্তে ১৫০ জনের জন্য ভূ গর্ভস্থ জল তোলা শুরু হল প্রতিদিন । ৫ কাঠা জায়গায় গাছপালা যেমন থাকলো না , তেমনি মাটিও থাকলো না, যার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল ভূগর্ভের জলকে রিচার্জ করবে ।

এই শহরে একের পর এক শপিং মল , বাণিজ্য কেন্দ্র আর অসংখ্য বড় বড় আবাসন প্রকল্প গুলির জন্য বৃক্ষ ছেদন হোল । যেখানে একটি গাছ কাটলে তিন থেকে পাঁচটি গাছ লাগানোর আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নাম কে ওয়াস্তে সৌন্দর্য বর্ধক বাহারি কিছু গাছ লাগানো হোল । কোনও কোনও জায়গায় কিছুই গাছ লাগানো হোল না। আইন মোতাবেক বানিজ্যিক এলাকা বা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স গুলিতে ফাঁকা জায়গায় সবুজায়ন করার কথা, সেখানে গাছ তো দূরের কথা, ঘাসও তুলে দিয়ে টাইলস বা কংক্রিটে ঢেকে দেওয়া হোল । আর প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লিটার জল তুলে ফেলা এবং বৃষ্টির জল রিচার্জ না হবার কারণে শিলিগুড়ি শহরের ভূ গর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে । বেশ কিছু ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই মারাত্মক জলসংকট দেখা দিয়েছে।

যদিও বোরিং করে প্রাকৃতিক এই ভৌম জল উত্তোলন করতে হলে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয়। শহরে বেশিরভাগ আবাসন, অট্টালিকা ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সেই নিয়ম মানে নি। যেমন সরকারি বা বেসরকারি ইমারত গুলিকে ''রেইন ওয়াটার হারভেসটিং '' বা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা যায়নি । বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করতে হলে নির্দিষ্ট জায়গা যেমন ছাড়তে হয় , তেমনি বড় ও বিশেষ করে বানিজ্যিক আবাসন ও প্রতিষ্ঠান গুলিকে সবুজায়ন ও 'রেইন ওয়াটার হারভেসটিং '' বাধ্যতামূলক না করতে পারলে , শহরকে বড় ধরণের পরিবেশগত সমস্যায় পড়তে হবে ।

ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বৃষ্টির জল যেমন পুষ্ট করে, বিভিন্ন খাল ,বিল পুকুর নদীও ভূ গর্ভের জলস্তরকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখে । ভৌগোলিক কারণেই এখানে নদী ছাড়া অন্য জলাভূ মির প্রায় অস্তিত্ব নেই । আর নদীগুলি বেদখল হতে হতে দূষণের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে নাব্যতা কমতে কমতে এখন নর্দমায় পরিণত হয়েছে । নিজেরাই প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় , জলস্তরকে তারা আর কিভাবে পুষ্ট করবে । আগামীতে শহরে ভয়ংকর জলকষ্ট থেকে রক্ষা পেতে হলে এখন থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

আবার আসি শহরের নদীগুলির কথায়। পূর্বে সাহু, পশ্চিমে পঞ্চানই আর উত্তরে মহিষমারি। মাঝখানে জোড়াপানি , ফুলেশ্বরী আর মহানন্দা । এরা হয়তো বা কত শত সহস্র বছর ধরে প্রবাহিত হচ্ছিল স্বচ্ছ জলধারা নিয়ে । সঙ্গে কত জলজ উদ্ভিদ আর কত বৈচিত্রের মাছ ও জলজ প্রাণীকূল সহ । জলই তো জীবন । প্রকৃতির আশীর্বাদের মতো কত প্রাণের জীবন , জীবিকা রক্ষা করেছে এই নদীগুলি। স্বচ্ছ , বহতা নদীগুলি শহরের নীল পাহাড়ের ব্যাকড্রপকে সৌন্দর্যময় করে মনকে প্রশান্ত করতো । একটি সুন্দর শহরে থাকার আনন্দ হোত ।

মাত্র পাঁচ দশকের মধ্যে শহরবাসীরা অবহেলায়, অবজ্ঞায়, অজ্ঞানতায় , ধৃষ্টতায় তোয়াক্কা না করে প্রকৃতির এই অমূল্য দান এই নদীগুলিকে তিলে তিলে পুতি গন্ধময় নর্দমায় পরিণত করলাম।

নদীর চর দখল করে যে লক্ষাধিক মানুষের বসতি ,নদীমধ্যে তাদের খাটা পায়খানা , শহরের সব হাইড্রেন গুলি নদীগুলিতে যুক্ত হওয়া, খাটাল থেকে শুরু করে মৃত পশুর শবদেহ, ট্রাক বাস ধোওয়ার কারণে নির্গত পেট্রোল, ডিজেল , মোবিলের দূষণ , বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালের কাপড় কাঁচা , ধর্মীয় পুজো উপচারের আবর্জনা আর অগুনতি বাজারের ময়লা , থার্মোকল ইত্যাদিতে নদীগুলি দূষণের চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। ভাবা যায় , এখনও এই নদীগুলিতে প্রতিদিন নূন্যতম ২৫ হাজার মানুষ প্রাতঃকৃত্য সারেন ।

ছোট নদীগুলি চরম দূষিত হওয়া সত্ত্বেও সমীক্ষায় স্থান পায়নি । তবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষায় 'মহানন্দা' কয়েক বছর আগেই উত্তরবঙ্গের দূষিততম নদী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল । বছর দুয়েক আগে রাজ্যের দূষিতদের তালিকায়, এবং সাম্প্রতিক দেশের দূষিত নদীগুলির মধ্যে মহানন্দা স্থান পেয়েছে ।

পুরবার্তা ২০২১

''মহানন্দা'' , মাত্র কয়েক বছর আগেই যে ছিল রাজ্যের অন্যতম 'সুন্দরী' নদী ।

মহানন্দা ও তার দুটি সহনদীকে বাঁচানোর বেশ কয়েকটি ব্যর্থপ্রচেষ্টা হয়েছে ।এমনকি মহামান্য আদালতকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। 'অ্যাকশন প্ল্যান ' থেকে শুরু করে যে কয়েকটি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে গোড়ায় গলদ , সদিচ্ছা ও স্বচ্ছতার অভাবে যা হবার তাই হয়েছে ।

উন্নয়ন ও পাশাপাশি তার পরিবেশগত দিকটা সমগুরুত্ব দিয়ে না দেখলে পরবর্তীকালে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ অনেক কঠিন হয়ে যায় ।এছাড়াও ক্ষমতাসীন ও বিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছা ,তারপর ভোটের বালাই তো রয়েইছে । পরিবেশগত কোন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে পুজো ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলির অজুহাতে সময় দীর্ঘায়িত হয়েছে ।একটি পুজোর পর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঠিক হোল, তারপর সেই পুজো শেষ হলে পদক্ষেপ নিতে নিতে আরেকটি পুজো সামনে চলে এলো । সেই পূজো শেষ হোল তো ভোট পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। বারে বারে আমাদের শহরের এমনটাই হয়ে চলেছে ।

যেমনটা খাটাল উচ্ছেদ থেকে শুরু করে ,নদীগুলি থেকে অপরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বালি -বজরি উত্তোলন বন্ধ করা , অথবা শহরে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ থেকে শুরু করে নিষিদ্ধ ডিজেলচালিত অটোগুলিকে পুরোপুরি ভাবে বন্ধ করা , কোনটাই করা যায়নি । আরও যেমন করা যায়নি শহরের সুন্দর ফুটপাথগুলিকে পথচারীদের ব্যবহারের জন্য দখলদারদের অন্যত্র সরানো ।

শহরের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ কমানো যায়নি । হাজার হাজার টোটোর জন্য কোন ব্যবস্থাও কার্যকরী হয়নি ।যানজট কমাতে বিশেষজ্ঞ সংস্থা ও ব্যক্তির পরামর্শ কার্যকরী করতে সময় বিলম্বের কারণে প্রতি বছরে নতুন করে দশ হাজার গাড়ির চাপ শহরকে নিতে হয়েছে ।এর মধ্যে চার চাকা , তিন চাকা , দু চাকা সবেরই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে । আনুপাতিক হারে রাজ্যের সবচেয়ে বেশি যানবাহনের সংখ্যা আমাদের এই শহরটিতে ।আর শহরে বড় কোন কলকারখানা না থাকা সত্বেও শুধুমাত্র যানবাহনের কারণেই শহর বায়ুদূষণের শিকার হয়ে শিরোনামে পৌঁছেছে ।রাস্তা বাড়েনি এক শতাংশ , কিন্তু যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে ১০০ গুণ ।

শহরের চলমানতা কমতে কমতে কোন কোনও সময়তো ঘণ্টায় ৮- ১০কিমি তে দাঁড়ায় । নিত্যনৈমিত্তিক যানজটের কারণে শহর রুদ্ধ হয়ে যাওয়াই শুধু নয়, তীব্র হর্নের আওয়াজে মারাত্মক শব্দ দূষণের শিকার এই শহর । বেআইনি ও নিষিদ্ধ এয়ার ও ইলেকট্রিক হর্নের দাপট থেকে হাসপাতাল , নার্সিং হোম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সাইলেন্স জোনও বাদ যায়নি ।

আর কয়েকটি কারণে শব্দ দূষণ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।' ডিজে' যার মধ্যে অন্যতম।

সারা রাজ্যে উন্মুক্ত স্থানে ' ডিজে' নিষিদ্ধ । আমাদের শহরে তা ব্যবহারে কোন লাগামই নেই । যে কোন

অনুষ্ঠানেই আইনকে পাত্তা না দিয়ে ' ডিজের" হৃদকম্প বাড়িয়ে দেওয়া শব্দে অসুস্থ বয়স্ক মানুষদের কথা ছেড়েই দিলাম ; শহরের সাধারণ মানুষও এই যন্ত্রণায় তিতিবিরক্ত।

শব্দবাজি নির্দিষ্ট মাত্রার ও সময় মেপে ফাটানোর নির্দেশিকা থাকলেও সারারাত ধরে উপদ্রব সইতে হয় শহরবাসীকে । আর একটি নতুন সমস্যা দিন দিন বাড়ছে , উৎসব অনুষ্ঠানে রাস্তা আটকে তারস্বরে , ডিজে বা লাউড স্পিকারের তালে রাস্তা আটকে নৃত্য এবং সাথে আতশবাজি ও শব্দবাজির দাপট এখন প্রতিটি পাড়ায় । কেউ দেখার নেই যে নিজের ''আনন্দ'' যেন অপরের ''নিরানন্দের'' কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবেশ রক্ষার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই সরকার ও তার প্রশাসনিক দপ্তর গুলির । সাথে অবশ্যই নগরবাসীকে পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। জাতীয় পরিবেশ আদালত ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের নির্দেশ মতো শিলিগুড়ি শহরে সমস্ত ধরনের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে তৎকালীন মন্ত্রী শ্রী গৌতম দেবের উদ্যোগে দ্রুততার সাথে ''জনশুনানি'' করা হয়েছিল এবং দলমত নির্বিশেষে শহরবাসী একবাক্যে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ দূষণের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। রাজ্যের একমাত্র শহর হিসেবে সমস্ত ধরনের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ

(যেখানে কোন ''মাইক্রনের'' কথা নেই) উৎপাদন করা , মজুত করা , বিক্রি করা এবং বহন করা নিষিদ্ধ হোল পুরো শিলিগুড়ি মহকুমা জুড়ে এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে থাকা সংযোজিত শিলিগুড়ি পুরসভার ওয়ার্ড গুলিতে।

শহরের সর্বস্তরের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে ছাত্র- ছাত্রী , শিক্ষক , অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক কর্মী থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পথে নেমেছেন , বাজারে গেছেন, ক্রেতা , বিক্রেতাদের অনুরোধ করেছেন । বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উদ্যোগ নিয়ে মিটিং , মিছিল সংগঠিত করেছে । সামিল হয়েছেন তৎকালীন মন্ত্রী , মেয়র থেকে শুরু করে সবাই। পরিবেশ নিয়ে লাগাতার দেড় বছর এই আন্দোলন রাজ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। শহর ৮০ শতাংশর ওপর প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ মুক্ত হয়েছিল । এর আগেও একবার ক্যারিব্যাগ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়েছিল । পুরনিগম পুরস্কৃত হয়েছিল । তারপর অজ্ঞাত কারনে আবার যে কে সেই । শহরে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ছড়াছড়ি ।এমনকি অতিমারিতেও দরিদ্র মানুষের হাতে ত্রাণের প্যাকেট পৌঁছেছে সেই প্লাস্টিক ব্যাগে।

সম্প্রতি পুরনিগমের নতুন প্রশাসকমণ্ডলী আবারও প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর ঘোষণা করেছে। শহরবাসীকে আবারও আবেদন - শহরকে এই প্লাস্টিক দৈত্যের হাত থেকে বাঁচাতে পুরনিগম, প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করুন ।

১০-১২ লক্ষ মানুষের চাপ বহন করার ক্ষমতা শহরটার থাকলেও পরিবেশের ওপর তার প্রভাব প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে । প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ নানা প্রয়োজনে শহরে আসেন । পর্যাপ্ত সাধারন ''শৌচালয়'' না থাকার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়ে চলেছে ।

শহরের যত্রতত্র আবর্জনা একটি বড় পরিবেশ সমস্যা । শিলিগুড়ির মতো আর কোথাও গোটা শহর জুড়ে এত

বাজার নেই । নির্দিষ্ট বাজারগুলি ছাড়াও পাড়ার রাস্তা , ফুটপাথ , ব্রিজ , ওভারব্রিজ সহ মাঠ থেকে শুরু করে , পাইপ লাইন কোথায় বাজার বসে না ! পুর নিগমের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার যে পুরো শহরকে ঝেটিয়ে , প্রতিদিন এতো বাজারের আবর্জনা সংগ্রহ করে ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে নিয়ে ফেলা । স্বাভাবিক ভাবেই পড়ে থাকা আবর্জনার কারণে শহর ময়লা হচ্ছে এবং দূষণ ছড়াচ্ছে । শিলিগুড়ির ভাগার বা ‘‘ ডাম্পিং গ্রাউণ্ড’’ শহরের দীর্ঘদিনের একটি জ্বলন্ত পরিবেশ সমস্যা । অনেক প্রতিবাদ ,আন্দোলনের পর অনেকটা হলেও সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি । তবে পুরনিগমের উদ্যোগে এবং সহযোগিতায় বর্তমানে পুরোদমে কাজ চলছে ।

অনেকদিন ধরে দৃশ্য দূষণও স্বস্তি দিচ্ছে না শহরকে । পুরনিগমের উদ্যোগে উন্মুক্ত মাংসের দোকানগুলিতে ঢাকা দেবার ব্যবস্থা হলেও বর্তমানে বেশিরভাগ দোকানে তা আর পরিলক্ষিত হচ্ছে না । উত্তরের নীল পাহাড় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা শহরের ল্যান্ডস্কেপের সাথে সেই সৃষ্টিকাল থেকেই মিলেমিশে ছিল । এখন শহরের ‘‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে ‘‘ । অনিয়ন্ত্রিত নানা রকম ‘‘বিজ্ঞাপন আর হোর্ডিং’’ দৃশ্যদূষণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । পুরনিগম থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হোক কোন কোন জায়গায় বিজ্ঞাপন হোরডিং লাগানো যাবে না । তাহলে শুধু শহরবাসীরাই নন , দেশ- বিদেশ থেকে আগত পর্যটকরাও দৃশ্য দূষণের কবলে পড়বেন না ।

শহরের সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যর জন্য সবুজের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই শহরের ‘‘জীববৈচিত্রের’’ শরিক অন্যান্য প্রাণীকুলকেও থাকতে হবে । পাখি , প্রজাপতি , ফড়িং সহ যত প্রাণীকূ ল এখনও শহরের বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাদের সংরক্ষণটাও ভীষণ জরুরি । আরেকটি জরুরি বিষয়কে পুরনিগমকে সত্বর করা প্রয়োজন , সেটি হোল - ‘‘পিপলস বায়োডাইভারসিটি রেজিস্টার’’ বা ‘‘জন জীববৈচিত্র নথি’’ । রাজ্যের বেশিরভাগ পুরসভা তাদের এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এই নথি তৈরি করে ফেলেছে ।

এই করোনা কালে শহরের পরিবেশ দেখে নগরবাসী স্বস্তিতে রয়েছেন । অনেক পাখির দেখা মিলেছে । বায়ু দূষণ , শব্দ দূষণ নূন্যতম মাত্রায় রয়েছে । কিন্তু সাময়িক এই স্বস্তিতে আমাদের যে ভাললাগা তৈরি হয়েছে তা ধরে রাখতে হলে ব্যক্তিগত ভুমিকাও থাকতে হবে ।

যানজট , বায়ুদুষণ , শব্দদূষণ কমাতে সরকার , প্রশাসনের উদ্যোগের পাশাপাশি নিজের গাড়ি বা স্কুটার বাইকের ব্যবহার শুধুমাত্র যদি ‘‘প্রয়োজন ভিত্তিক’’ করতে পারি তবেই অনেকাংশে আমরা ‘‘দূষণ দৈত্যকে’’ বশে রাখতে পারব ।

আমাদের এই প্রিয় শহরের পরিবেশকে সুস্থ , নির্মল না রাখতে পারলে কেউ কোন ভাবেই ভাল থাকতে পারবো না । শহরের সামাজিক , রাজনৈতিক , ও ধর্মীয় পরিবেশ নিয়ে আমরা যেমন গর্ববোধ করতে পারি তেমনই একজন সুনাগরিকের মতো ছোট ছোট ভুমিকা পালন করলেই শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করতে পারব । যেমন , একটি গাছ লাগিয়ে , প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করে বা অপচয় রোধে রাস্তার খোলা জলের কলটা বন্ধ করে দিয়ে .... ।।

শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগাজিন চর্চা অর্বাচীনের আউটলুক

পঙ্কজ ঘোষ, শুভ্রদীপ রায়, সন্দীপন দত্ত

''A magazine- a relevant one should be a sound– not an echo.''

–Tina Brown (The Vanity Fair Diaries)

লিটল ম্যাগাজিন! বহুল প্রচলিত বানিজ্যিক পত্র-পত্রিকার বিপরীতে দঁড়িয়ে থাকা এক আন্দোলন, একটি দ্রোহ, একটি প্রতিবাদ, একটি রেজিস্টেন্স। ''এক থেকে বহুত্বের মধ্যে নিজেকে যে খোঁজা সেখানেই রয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের সারবস্তু'' (গৌতম বাড়ই)। বিভিন্ন সময়ে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর হাত ধরেই উঠে এসেছে অসামান্য ও বিচিত্র বিষয়ের এক সাহিত্যিক রূপরেখা- একথা অস্বীকার করা যায় না। 'লিটল' শব্দটির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় 'বৃহৎ' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার স্পর্ধা।

শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগ চর্চার ইতিহাস অর্বাচীন নয়- সত্তর বছর পুরোনো। সেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখনও শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগ চর্চা সমুজ্জ্বল। শুরুর দিকের দিনগুলির কথা বললে প্রথমেই আসে সত্যরঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংবাদ' (১৯৫০) এবং 'শিলিগুড়ি' (১৯৫২) নামে পত্রিকা দুটির কথা। এছাড়াও অরুণ মৈত্র সম্পাদিত 'মহানন্দা', বিমল কুমার ঘোষ (চোমংলামা) সম্পাদিত 'শতাব্দী', প্রদ্যোৎ সরকার সম্পাদিত 'সংযোগ', বসন্ত করের 'সংঘর্ষ', বিজন চৌধুরীর 'কথা ও কলম', অরবিন্দ করের 'সৈকত', সুধীর বিশ্বাসের 'উত্তরবঙ্গ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সময়ের যুগমানস হিসেবে এই সমস্ত পত্রিকাগুলি যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু তারা কেউই দীর্ঘায়ু হয়নি। ছয়ের দশককে বলা যায় এই শহরের লিটল ম্যাগ চর্চার অন্ধকার যুগ, উল্লেখযোগ্য কোনও পত্র-পত্রিকার সন্ধান সেই সময় পাওয়া যায় না।

সাতের দশক ছিল শিলিগুড়িতে বাংলা লিটল ম্যাগ চর্চার এক জাজ্বল্যমান অধ্যায়। এক বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো শিলিগুড়ির সাহিত্যের ঊষর প্রান্তরে ফসল ফলানোর পলির জোগান দেয় অসংখ্য প্রতিশ্রুতিমান পত্রিকা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ষষ্ঠী বাগচী সম্পাদিত 'বালাসন', প্রবীর ঘোষ রায় সম্পাদিত 'এই সময়', সমর চক্রবর্তীর 'প্রমিথিউস', রাজা সরকার ও মনোজ রাউত সম্পাদিত 'ধৃতরাষ্ট্র', হরেন ঘোষ সম্পাদিত 'ঋক', নির্মল চক্রবর্তী

পুরবার্তা ২০২১

সম্পাদিত 'আজকের কবিতা', গীতাংশু কর, নিখিল বসু, বিপুল দাস ও পুন্যশ্লোক দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'পাহাড়তলী', বীরেন চন্দ সম্পাদিত 'উত্তরধ্বনি', রতন বিশ্বাস সম্পাদিত 'গদ্য পদ্য এবং', রঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'ঝিনুক', নারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আসমুদ্র হিমাচল', আনন্দ সরকার সম্পাদিত 'সাম্প্রত', প্রদীপ রায় সম্পাদিত 'রক্তবীজ'। এছাড়াও অসংখ্য পত্র-পত্রিকা শিলিগুড়ির সাহিত্য প্রাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছিল।

এদের মধ্যে 'উত্তরধ্বনি' পত্রিকাটি ১৯৭৮ সাল থেকে বর্তমানেও স্বমহিমায় প্রকাশিত হচ্ছে। সত্তরটির মতো সংখ্যার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল- ১২১টি উপন্যাস নিয়ে বাংলা উপন্যাস সংখ্যা, রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে সংখ্যা, ময়মনসিংহ জেলা সংখ্যা ইত্যাদি।

সাতের দশকের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগ চর্চায় এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় আটের দশকে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাগুলি হল- প্রকাশ শাসমল সম্পাদিত 'একলব্য', সঞ্জীবন দত্ত রায় সম্পাদিত 'সতর্ক', প্রবীর শীল সম্পাদিত 'অশনি', অলোক গোস্বামী সম্পাদিত 'নবজাতক', মলয় মজুমদার সম্পাদিত 'চৌকাঠ', নৃপেন বর্মণ সম্পাদিত 'সত্তা', নৃপেন বর্মণ ও নিখিলেশ রায় সম্পাদিত 'দিশারি' ইত্যাদি। তবে এই সময়ে শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত যে পত্রিকাটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব ফেলেছিল তার নাম হল 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প'। বস্তুত 'শব্দ চেতনা', 'সমকালীন চিরকালীন', 'নবজাতক', 'জাতক', 'অশনি', 'কুরুক্ষেত্র', 'ধৃতরাষ্ট্র'- এই কয়েকটি পত্রিকার কনসেনট্রেটেড রূপ ছিল 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প'। এই পত্রিকাটি আটের দশকের শুরু থেকে নব্বইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। আটের দশকে আমরা রেবা মৈত্রের সম্পাদনায় 'চমচম' নামে একটি শিশুদের পত্রিকাও পাই। 'চৌকাঠ' পত্রিকাটি ১৯৮৭ সাল থেকে শুরু করে বর্তমানেও প্রকাশিত হচ্ছে মলয় মজুমদার ও অলোক গোস্বামীর সম্পাদনায়।

নয়ের দশকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল- স্বর্ণেন্দু সরকার সম্পাদিত 'ক্যাকটাস' (১৯৯৩), বিমল ঘোষ সম্পাদিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', গৌতম রায়ের 'বৈতানিক', গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের মুখপত্র 'সংবর্তিকা', নিখিলেশ রায় সম্পাদিত 'অন্যকাগজ', শুভময় সরকার সম্পাদিত 'মল্লার', পার্থপ্রতিম মিত্র সম্পাদিত 'সৃজনপত্র' নৃপেন বর্মণ সম্পাদিত 'কবিতা এখন', 'আর্তনাদ' ও 'জন্মভূমি'। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সংবর্তিকা', 'অন্যকাগজ', 'মল্লার' এবং 'সৃজনপত্র' বর্তমানেও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমানে শিলিগুড়িতে যেসব তরুণ-তরুণী সক্রিয়ভাবে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত তাঁদের অনেকাংশেরই প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ২০১০-এর উত্তরবঙ্গ বইমেলায় 'বৈতানিক'-এর 'অনামী কবির কবিতা' সংখ্যায়। সেই সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন জয়দীপ চক্রবর্তী। নয়ের দশকে শুরু হয়ে বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেলেও এই সময়ের শিলিগুড়ির তরুণ সাহিত্যকর্মীদের এক আত্মপ্রকাশের মঞ্চ দিয়েছিল এই পত্রিকাটি- সেকথা অনস্বীকার্য।

পুরবার্তা ২০২১

নয়ের দশকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা যা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে রাজ্যব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে তা হল 'মল্লার' (১৯৯৫)। প্রথম দিকে পত্রিকাটি 'মেঘমল্লার' নামে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে 'মল্লার' নামেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। শুভময় সরকার সম্পাদিত এই পত্রিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল- নারীবিশ্ব ক্রোড়পত্র, অমিয়ভূষণ মজুমদার ও নবারুণ ভট্টাচার্যের শেষ সাক্ষাৎকার, রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ক্রোড়পত্র, বাংলাদেশের স্বাধীনতার চল্লিশ বছর উপলক্ষে তরুণ প্রজন্মের কবিদের কবিতা সংখ্যা ইত্যাদি।

শিলিগুড়িতে নাট্য চর্চা বিষয়ক প্রথম পত্রিকা সম্ভবত বিপদভঞ্জন সরকার সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গ নাট্যজগত'। এই পত্রিকায় উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যেত। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি ঋত্তিক নাট্যংস্থার পক্ষ থেকে রতন নন্দী ও প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় দীর্ঘ প্রায় আট বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'ঋত্তিক নাট্যপত্রিকা'। এই পত্রিকায় সারা রাজ্যের নাট্য সংবাদের পাশাপাশি প্রচুর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ২০১৩ সালে এই পত্রিকা নবপর্যায়ে আবার প্রকাশিত হয়। তবে বর্তমানে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। ১৯৯৫ থেকে এই শহরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে পার্থপ্রতিম মিত্র সম্পাদিত নাট্যচর্চা বিষয়ক পত্রিকা 'সৃজনপত্র'। থিয়েটার, নন্দনতত্ত্ব, কবিতা ও চিত্রকলা এই পত্রিকার মূল কাজের জায়গা।

নৃপেন বর্মণ আটের দশক থেকে নিয়মিত অন্তরালে একাধিক ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন। 'জন্মভূমি' (২০০০) ছিল একটি সংবাদ-সাহিত্য পত্রিকা।

শূন্য দশক অর্থাৎ ২০০১-২০১০-এর মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল- রিমি দে সম্পাদিত 'পদ্য' (২০০১), সোমনাথ গাঙ্গুলী সম্পাদিত 'দিনান্তের আলো' (২০০১), নিখিলেশ রায় সম্পাদিত 'ডেগর' (২০০৩) ও 'মাসকিয়া উত্তরবঙ্গ' (২০০৩), গৌতম চক্রবর্তী সম্পাদিত 'গদ্যে পদ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে' (২০০৬), উমা মাজী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলার মুখ' (২০০৬), সদ্যপ্রয়াত বিবেক কবিরাজ সম্পাদিত 'সাহিত্য অঙ্গন' (২০০৭), রথীন্দ্রনাথ সাহা সম্পাদিত 'কবিতার লাইটহাউস' (২০১০), সুদীপ চৌধুরী (বর্তমান সম্পাদক) সম্পাদিত 'ফুলেশ্বরী নন্দিনী' (২০১০), নিখিলেশ রায় সম্পাদিত 'মাগুরমারী' (২০১০)।

রিমি দে সম্পাদিত 'পদ্য' পত্রিকাটি বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিন চর্চায় শিলিগুড়ির অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। কবিতা ও কবিতা বিষয়ক কথাবার্তা নিয়েই এই পত্রিকার কাজ। পত্রিকার কিছু উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হল- রাধা সংখ্যা, কূটকচাল সংখ্যা, ছবি সংখ্যা, গণিকা সংখ্যা, মা সংখ্যা ইত্যাদি।

নিখিলেশ রায় সম্পাদিত 'ডেগর' পত্রিকাটি খুব সম্ভবত শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত রাজবংশী ভাষার একমাত্র পত্রিকা। অন্যদিকে বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'মাসকিয়া উত্তরবঙ্গ' ছিল নিখিলেশ রায়ের সম্পাদনায় একটি

পুরবার্তা ২০২১

সাহিত্য-সংবাদের মাসিক কাগজ। নিখিলেশ রায় শিলিগুড়ি থেকে নিয়মিত একাধিক পত্রিকা একক বা যৌথভাবে প্রকাশ করে আসছেন সেই আটের দশক থেকে। 'অন্যকাগজ', 'ডেগর' ও 'মাগুরমারী'- এই তিনটি পত্রিকা নিখিলেশ রায়ের সম্পাদনায় বর্তমানেও সক্রিয়। 'মাগুরমারী' পত্রিকাটি শিলিগুড়ির অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র। পত্রিকাটি সম্পূর্ণরূপে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ নিয়ে কাজ করে থাকে।

গৌতম চক্রবর্তী সম্পাদিত 'গদ্যে পদ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে' পত্রিকাটি শূন্য দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা যা বর্তমানেও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হল- উত্তরের চা বাগান সংখ্যা, স্মরণ সংখ্যা, লালান-মুকুন্দদাস সংখ্যা, নবারুণ-মলয় স্মৃতি সংখ্যা ইত্যাদি।

রথীন্দ্রনাথ সাহা সম্পাদিত 'কবিতার লাইটহাউস' পত্রিকাটি তরুণ ও অতি তরুণদের নিয়ে সব সময় কাজ করেছে। লিটল ম্যাগাজিনের লিটল অথচ বিস্ফোরক ধর্ম এই পত্রিকার রক্তে। আনন্দ সরকারকে নিয়ে পত্রিকার একটি সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে।

'ফুলেশ্বরী নন্দিনী' পত্রিকাটি ২০১০ সাল থেকে এখনও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হল- রবীন্দ্র সংখ্যা, গল্প সংখ্যা, অনুগল্প সংখ্যা ইত্যাদি।

শিলিগুড়ির কাব্য মানচিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয় ২০১০ পরবর্তী সময়ে। এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী হাতে হাত মিলিয়ে অনেক নতুন পত্রিকার সূচনা করে। স্রেফ সাহিত্যের পথে বাঁচতে চেয়েই তাদের এই সহাবস্থান। এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল- সদ্যপ্রয়াত সঙ্গীতা পাল সম্পাদিত 'মেঘ বৃষ্টি রোদ্দুর' (২০১২), পঙ্কজ ঘোষ ও শুভ্রদীপ রায় সম্পাদিত 'উত্তরের কবিমন' (২০১৩), পার্থ প্রতিম পান সম্পাদিত 'কথা ও কবিতা' (২০১৪), রাজা সম্পাদিত 'প্রাসঙ্গিক' (২০১৫), মহুয়া চৌধুরী সম্পাদিত 'ন হন্যতে' (২০১৫), সৌভনিক চক্রবর্তী ও দেবজিৎ সম্পাদিত 'ঋ৯' (২০১৫), সদ্যপ্রয়াত বিবেক কবিরাজ সম্পাদিত 'জলপিপি' (২০১৫), নীহার রঞ্জন দাস সম্পাদিত 'ঘোড়সওয়ার' (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ সালে হলেও, ২০১৭ সাল থেকে শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে), অরিন্দম ঘোষ সম্পাদিত 'কবিতা আনলিমিটেড' (২০১৭), সুদীপ চৌধুরী সম্পাদিত 'ডাংগুলি' (২০১৯), সুমন মল্লিক ও সুভান সম্পাদিত 'শিলিগুড়ি জংশন' (২০২০), স্নেহা সাহা সম্পাদিত 'সাহিত্য সহবাস' (২০২০)।

পঙ্কজ ঘোষ, শুভ্রদীপ রায়, সুভান ও সুমন মল্লিক সম্পাদিত 'উত্তরের কবিমন' পত্রিকাটি ২০১৩ সালে উত্তরবঙ্গ বইমেলায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন পঙ্কজ ঘোষ ও শুভ্রদীপ রায়। শুরুর দিন থেকেই পত্রিকাটি শিলিগুড়ির তরুণদের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে এসেছে। শিলিগুড়িতে বর্তমানে যেসকল তরুণ-তরুণী দাপিয়ে লেখালেখি করছেন তাঁদের অধিকাংশেরই আত্মপ্রকাশ এই পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে। পত্রিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল- শহর সংখ্যা, সম সংখ্যা, পুন্যশ্লোক দাশগুপ্ত সংখ্যা, শিলিগুড়ির সত্তর দশক

পুরবার্তা ২০২১

সংখ্যা এবং সমর চক্রবর্তীর শেষ দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। বর্তমানে পত্রিকাটি উত্তরবঙ্গের প্রথম দশকের কবি ও কবিতা চর্চা বিষয়ক একটি গবেষণাধর্মী কাজ করছে, যার প্রকাশ আসন্ন।

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের একমাত্র বাচিক শিল্প বিষয়ক পত্রিকা হল পার্থ প্রতিম পানের 'কথা ও কবিতা'। বাচিক শিল্প নিয়ে আলোচনা ও কিছু কবিতা নিয়ে সংখ্যাগুলো সজানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের হাতে গোনা কয়েকটি বাচিক শিল্প সংক্রান্ত পত্রিকার মধ্যে 'কথা ও কবিতা' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম।

মহুয়া চৌধুরী সম্পাদিত 'ন হন্যতে' শিলিগুড়িতে বর্তমানে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই পত্রিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হল- গৌতম বুদ্ধ সংখ্যা, উত্তরবঙ্গের কবিদের কবিতা সংখ্যা, লকডাউন সংখ্যা।

রাজা সম্পাদিত 'প্রাসঙ্গিক' একটি বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা। অন্য প্রেম বিষয়ক সংখ্যাটি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা। না-লেখা চিঠি, মৃতু উপত্যকা লাইভ- এরকম চমকপ্রদ বিষয় নিয়ে পত্রিকাটি কাজ করেছে। এই পত্রিকাটি আরও বেশ কিছু পত্রিকার মতো অনলাইন মাধ্যমেও কাজ করছে। শিলিগুড়ির অনলাইন পত্রিকাগুলো নিয়ে এই লেখায় পরবর্তীতে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শিলিগুড়ির সাম্প্রতিকতম পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম সুভান ও সুমন মল্লিক সম্পাদিত 'শিলিগুড়ি জংশন'। এই পত্রিকাটিও মূলত তরুণদের নিয়ে কাজ করছে। দার্জিলিং জেলার কবিতা সংকলন পত্রিকাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সুদীপ চৌধুরী সম্পাদিত 'ডাংগুলি' শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত একটি শিশু-কিশোর পত্রিকা। শিলিগুড়িতে সম্পূর্ণ শিশু-কিশোর পত্রিকার শূন্যস্থান পূরণে 'ডাংগুলি' আশা জাগিয়েছে।

শিলিগুড়ির প্রথম দশকের লিটল ম্যাগাজিন চর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'উত্তুরে দাবানল'। 'উত্তরের কবিমন', 'কবিতার লাইটহাউস', 'প্রাসঙ্গিক' ও 'ঋ৯' পত্রিকার সম্মিলিত উদ্যোগে 'উত্তুরে দাবানল' নামক একটি দৈনিক বুলেটিন ২০১৫ ও ২০১৬ সালের উত্তরবঙ্গ বইমেলায় দশদিনব্যাপী প্রকাশিত হয়। এই উদ্যোগের ফলে শিলিগুড়ির স্কুল-কলেজ পড়ুয়া প্রচুর লেখক ও অন্য মাধ্যমের শিল্পীরা বইমেলা প্রাঙ্গণে নিজেদের প্রকাশের সুযোগ পায়। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বইমেলায় যে পৃথক লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন হচ্ছে তার কৃতিত্ব অনেকাংশেই 'উত্তুরে দাবানল' নামক উদ্যোগটি দাবি করতে পারে।

২০২১ থেকে যে নতুন দশক শুরু সেই দ্বিতীয় দশকে এসে আমরা ইতিমধ্যেই অনুশ্রী তরফদার ও আশিস চক্রবর্তী সম্পাদিত 'দ্রোহকাল' (২০২১), শঙ্খদীপ মাহাতো সম্পাদিত 'প্রহরণ' (২০২১) পত্রিকাদুটি প্রকাশিত হতে দেখেছি।

পুরবার্তা ২০২১

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে বহু পত্রিকার নতুন সংখ্যার কাজ আটকে রয়েছে এবং নতুন পত্রিকা প্রকাশের কাজও পিছিয়ে যাচ্ছে। যেমন সুদীপ চৌধুরী সম্পাদিত 'কথাশিল্প' পত্রিকাটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে। প্রকাশিতব্য পত্রিকাটি সম্পূর্ণরূপে কথাসাহিত্য নির্ভর। বিশ্বজিৎ রায় সম্পাদিত 'পুলি' নামক আরেকটি পত্রিকাও খুব শীঘ্রই শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক- বাংলা ও রাজবংশী দুই ভাষার লেখা এখানে পাওয়া যাবে।

করোনা পরিস্থিতি লিটল ম্যাগাজিন চর্চায় বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছে। বর্তমানে প্রচুর লিটল ম্যাগ অনলাইন মাধ্যমে নিজেদের কাজ পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করছে। এই প্রসঙ্গে যে সব পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল- 'উত্তরের কবিমন', 'কবিতার লাইটহাউস', 'প্রাসঙ্গিক', 'মল্লার', 'পদ্য', 'ন হন্যতে', 'শিলিগুড়ি জংশন', 'হালফিল', 'ঘোড়সওয়ার', 'প্রহরণ', 'চৌকাঠ', 'শব্দের ক্যানভাস' ইত্যাদি। এদের মধ্যে অগ্রদীপ দত্ত সম্পাদিত 'হালফিল' (২০২১) নামক অনলাইন পত্রিকাটি বিক্রি করে পাওয়া অর্থ করোনাকালে দুস্থদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়েছে এবং এই সাধু উদ্যোগকে মাথায় রেখেই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবজিন, ব্লগজিন বা বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে তরুণদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলাই বাহুল্য। মুদ্রিত পত্রিকার পাশে ভার্চুয়াল পত্রিকাগুলির সুষম সহাবস্থান আখেরে শিলিগুড়ির সাহিত্য চর্চাকে সমৃদ্ধ করবে বলেই ধারণা করা যায়।

২০২১ সালটি শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিন চর্চায় একটি গুরুত্বপুর্ণ সময়। এই বছরই আত্মপ্রকাশ করে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি' নামে একটি বেসরকারি অরাজনৈতিক সংগঠন। উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত লিটল ম্যাগ কর্মী, লেখক, কবি, শিল্পীরা একত্রিত হন 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি'-এর মাধ্যমে। এই বছরের মার্চ মাসের ২০, ২১ তারিখ শিলিগুড়িতে একটি লিটিল ম্যাগাজিন মেলার আয়োজন করে এই আকাদেমি। উত্তরঙ্গের সমস্ত জেলার থেকে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু লিটল ম্যাগাজিন এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। বেসরকারি উদ্যোগে এটিই শিলিগুড়িতে আয়োজিত প্রথম লিটল ম্যাগাজিন মেলা। দুদিনব্যাপী এই মেলায় নবীন ও প্রবীনদের সমাবেশ সমগ্র রাজ্যজুড়ে এক অভাবনীয় সাড়া জাগিয়েছিল। এই মেলার উদ্বোধক ছিলেন 'কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত মহাশয় এবং শিলিগুড়ির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্রাবন্ধিক সঞ্জীবন দত্ত রায় মহাশয়।

অন্যদিকে এই বছরই আমরা শিলিগুড়ির দুজন সাহিত্যিক তথা লিটল ম্যাগ কর্মীকে হারিয়েছি। সঙ্গীতা পাল

এবং বিবেক কবিরাজের অকালপ্রয়াণ শিলিগুড়ির সাহিত্য চর্চায় একটি বড় ধাক্কা। 'বুকস' নামে যে দোকানটি দীর্ঘ সময় শিলিগুড়িবাসীর লিটল ম্যাগ চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল, সেই 'বুকস'-এর কর্ণধার তপন মজুমদারের মৃতু ও ঘটেছে এই বছর। তাঁদের স্মরণ না করে এই লেখা সম্পূর্ণ হত না।

একটি লিটল ম্যাগাজিন সব সময় টিকে থেকেছে তরুণ লেখকদের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। লিটল ম্যাগাজিনগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল ক্ষণস্থায়িত্ব, তবে শিলিগুড়ির অনেক লিটল ম্যাগাজিনই দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, যা প্রশংসনীয়। তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে তাদের সাহিত্য চর্চা ও চর্যার প্রকাশভূ মি হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন। শিলিগুড়ির প্রায় সমস্ত লিটল ম্যাগাজিনগুলিই সময়ে সময়ে নতুন লেখক-লেখিকাদের উন্মুক্ত স্পেস দিয়েছে। বর্তমানে শিলিগুড়ির যে সমস্ত তরুণ-তরুণীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লিটল ম্যাগ ও বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় লিখছেন তাঁরা প্রায় সকলেই শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগগুলি থেকেই তাঁদের যাত্রা শুরু করেছেন।

বর্তমান যন্ত্র সভ্যতা ও মোবাইল অ্যাডিকশনের সময়েও অনেক তরুণ-তরুণী সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য পাঠের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এ খুব আনন্দের বিষয়। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই শিলিগুড়ি ও তৎসংলগ্ন লাইব্রেরিগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে লিটল ম্যাগাজিনের অভাবের কথা। আমাদের মনে হয়েছে সরকারি তথা স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিগুলিতে লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহের একটি সুব্যবস্থা করলে সকলের জন্যই উপকার হবে। এবং একথাও অনস্বীকার্য যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিটির সংস্কারকার্য শিলিগুড়ির পাঠক সমাজের কাছে এক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই গ্রন্থাগারে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য একটি পৃথক বিভাগ বর্তমান। এই বিভাগটির প্রচার আরও সুদূরপ্রসারী হলে লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ে আগ্রহী তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তা আরও গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগাজিন চর্চার ক্ষেত্রে 'বুকস' নামের বিপণিটির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 'বুকস'-এর কর্ণধার সদ্যপ্রয়াত তপন মজুমদার মহাশয়ের কাছে শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগাজিন পাঠকেরা সদাকৃতজ্ঞ। শিলিগুড়ির মতো বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহরে এমন একটি বই তথা লিটল ম্যাগাজিনের দোকানের অভাব আমরা ভীষণভাবে অনুভব করি। এই প্রসঙ্গে রিমি দের 'শিলিগুড়ি ম্যাগ' ও 'আড্ডাগলি' এবং মহুয়া চৌধুরীর 'উত্তরা' বর্তমানে কতিপয় সাদর্থক উদ্যোগের অন্যতম। বিগত কয়েক বছরে শহরের বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট ও ক্যাফে সাহিত্যিক তথা শিল্পীদের নিয়মিত প্রকাশের মঞ্চ করে দিচ্ছে যা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। 'মৌতাত', অভয়া বসুর 'ইচ্ছেবাড়ি', সায়ন সেনগুপ্তের 'ওপেন টি হাউস', সুজয় মিত্রের 'আর্ট ও আড্ডা', শুভ্রনীল দত্তের 'কাপস অফ আর্ট'- এরকম কিছু পজিটিভ ডেস্টিনেশনের নাম। এইরকম উদ্যোগের প্রসার যত বৃদ্ধি পাবে ততই শিলিগুড়ি বাণিজ্যিক শহরের সঙ্গে

সঙ্গে সাংস্কৃতিক শহর হিসেবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করবে।

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা শিলিগুড়ির লিটল ম্যাগাজিন চর্চার সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করলাম। এই আলোচনা মূলত তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম থেকেই আমাদের অভিপ্রায় ছিল এই সময়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র শিলিগুড়ির অতীত ও সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকাগুলির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার। এর সাথে লিটল ম্যাগাজিনগুলির প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র এবং পরিসরগুলিও আমরা আমাদের আলোচনায় তুলে ধরতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের এই কাজ যে ত্রুটিবিহীন ও যথার্থ তথ্যবহুল সেই দাবি আমরা করছি না। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে চেয়েছি এবং পাঠকরা আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধিত করে বাধিত করবেন এই আশা রাখি। 'পুরবার্তা'কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শেষত বলতে চাই কোনও তরুণ কলম যদি এই আলোচনা পড়ে উপকৃত হন, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুভময় সরকার, রিমি দে, নিখিলেশ রায়, সুদীপ চৌধুরী, পার্থপ্রতিম মিত্র এবং শ্যামলী সেনগুপ্ত।

মধুমঙ্গল বিশ্বাস ও দীপিকা বালা বিশ্বাস সম্পাদিত 'দৌড়' পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত পায়েলী ধর, আশিস চক্রবর্তী ও শবরী শর্মা রায় কর্তৃক লিখিত তিনটি প্রবন্ধ।

নভেম্বর ২০১৮-এর 'উত্তরের কবিমন' পত্রিকার সত্তর দশক ও শিলিগুড়ির সাহিত্য বিষয়ক সংখ্যা।

'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি'-এর তথ্যভাণ্ডার।

একটি ভালো বই এক শত ভালো বন্ধুর সমান, কিন্তু একজন ভালো বন্ধু একটি লাইব্রেরির সমান।
— ড. এ পি জে আব্দুল কালাম

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রদান ঃ একটি পরিকল্পনা

ড. শান্তনু দাস

১. ভূমিকা

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, ডাক্তার, উকিল, বৈজ্ঞানিক বা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তি অবসর বিনোদন, সাধারণ জ্ঞান আহরণ, পাঠক্রম বিষয়ক পঠন-পাঠন বা পেশাগত কারণে গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয়। এক কথায় বলা যায় যে, ''ভালোভাবে বাঁচতে গেলে তথ্য ব্যবহার করেই বাঁচতে হবে''। আবার একথাও বলা যায় যে তথ্যই জীবন মৃত্যুর মধ্যে ফারাক করে দেয় কারণ ঠিক সময়ে সঠিক তথ্য একজন মুমূর্ষু রোগীকে নতুন জীবন দান করতে পারে। আর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রত্যেকটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই যে তথ্যের চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদা পূরণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করতে পারে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লবের ফলে একটি মাউস ক্লিক-এর ছোঁয়ায় মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া যায় বিপুল তথ্যের ভাণ্ডার। কিন্তু এই সুবিধা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই কারণেই তৈরি হয়েছে ডিজিটাল ডিভাইড নামে এক নতুন প্রতিশব্দ। আজ উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের, একই দেশের আর্থসামাজিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির সঙ্গে দরিদ্রের মধ্যে তৈরি করেছে তথ্যসমৃদ্ধির এক বিপুল ফারাক। বিশেষ করে এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কাছে সরকারের জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলোর বেশির ভাগেরই কোনরকম তথ্য থাকে না। যার ফলে এরা এই সমস্ত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে চলেছে যা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে[১]। এই কঠিন পরিস্থিতির সুরাহা করতে গিয়ে গবেষকরা মতামত দিয়েছেন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ এই জনকল্যাণ মূলক পরিষেবাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাদের মতামত অনুযায়ী এর ফলে মানুষের গ্রন্থাগার বিমুখতা এর ফলে অনেকাংশে লাঘব হবে ও ধুঁকে পড়া সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারবে।

২. গ্রন্থাগার বিমুখতা

নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার এর সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ধ্যান-ধারণা বা পদ্ধতিকে পিছনে রেখে নতুন প্রযুক্তিকে রপ্ত করতে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। অন্যান্য পরিষেবার ন্যায় গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রেও এসেছে তথ্যপ্রযুক্তির প্রাচুর্য। গ্রন্থাগারে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে এসেছে কম্পিউটার ও গ্রন্থাগার সফটওয়্যার, মোবাইল প্রযুক্তি, ওয়েব ৩.০ ইত্যাদির ব্যবহার, যার মাধ্যমে গ্রন্থাগারে নথি আদান-প্রদান পরিষেবা যেমন দ্রুত হয়েছে তেমনি বাড়িতে বসেই মোবাইল পরিষেবা পাওয়াও সম্ভব হয়েছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তথ্য পাওয়া খুবই সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এই তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে উঠতে পারছেনা, যার ফলে এখনো সেই প্রাচীন ধাঁচের পরিষেবাই তারা দিয়ে চলেছে।স্বাভাবিকভাবেই এই ইন্টারনেটের যুগে যেখানে নিমেষের মধ্যে তথ্যের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় সেখানে সাধারণ মানুষ কেবল কিছু বইপত্র আর খবরের কাগজ পড়ার জন্য গ্রন্থাগারমুখী আর হচ্ছে না। এছাড়াও রাজ্যে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস খুবই অপ্রতুল। গ্রন্থাগার বিমুখতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নভিত্তিক এবং সাজেশন ভিত্তিক পড়াশোনার প্রচলন হওয়ার জন্য সারা পাঠক্রম ব্যাপী পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার ফলে পাঠ্যপুস্তক- এর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সহায়ক বই পড়ার যে প্রচলন ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়াও কর্মসংস্কৃতিহীনতা, উন্নত পরিকাঠামোর অভাব, দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ বন্ধ, সরকারের উদাসীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ বর্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর পাঠকরাও উন্নত পরিষেবা না পাওয়ার কারণে আর গ্রন্থাগারমুখী হচ্ছেন না। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের এই জনকল্যাণমূলক পরিষেবা সম্পর্কিত নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ যদি সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় সাধারণ গ্রন্থাগার এর মাধ্যমে তবে এই ভঙ্গুর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ফিনিক্স পাখির মত পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব।

৩. শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিষেবামূলক বিভাগ ও পরিষেবাগুলি সম্পর্কিত নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্যচাহিদা

তথ্য বিজ্ঞানী জুমা (২০১২) তার গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে - কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের তথ্য এবং খবরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি নাগরিকদের তথ্য চাহিদাকে প্রধানত ১৯ টি ভাগে ভাগ করেছেন সেগুলি হল —

- প্রতিবেশী
- গ্রাহক
- আবাসন
- গৃহস্থালি এবং গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ
- কর্মসংস্থান
- শিক্ষা এবং স্কুল
- স্বাস্থ্য
- পরিবহন
- বিনোদন এবং সংস্কৃতি
- আর্থিক বিষয়
- জনসম্পর্ক এবং সামাজিক সুরক্ষা
- সামাজিক বৈষম্য এবং জাতি
- শিশুর যত্ন এবং পারিবারিক সম্পর্ক
- পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ
- আইনি
- অপরাধ এবং সুরক্ষা
- অভিবাসন
- প্রবীণ সম্পর্কিত এবং সামরিক
- সরকারি বিষয়, রাজনৈতিক এবং বিবিধ

শিলিগুড়ি পুরনিগম শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য ও পরিষেবা দেওয়ার জন্য পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত ২২টি বিভাগের মাধ্যমে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এই বিভাগগুলি বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এই বিভাগ গুলি হল ঃ-

- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ
- কর বিভাগ

- পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ (পি.ডাব্লু.ডি)
- বাণিজ্য লাইসেন্স
- শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- মূল্যায়ন এবং পরিব্যক্তি
- বিদ্যুৎ বিভাগ
- হিসাব বিভাগ
- জল সরবরাহ বিভাগ
- আইন বিভাগ
- ক্রীড়া বিভাগ
- আবাসন বিভাগ
- ক্রয় বিভাগ
- সাধারণ বিভাগ
- জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল
- সংস্থাপন
- ইউপিই বিভাগ
- যানবাহন বিভাগ
- বাজার বিভাগ
- সংরক্ষণ পরিবেশ
- নগদ বিভাগ
- অতিথি নিবাস বুকিং সেল
- আইটি বিভাগ

শিলিগুড়ি পৌরনিগম সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত পরিষেবাগুলো জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু সচেতনতার অভাব ও ঠিক তথ্য না জানার জন্য অনেক নাগরিকই এইসব সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারছেন না। এই অবস্থায় পুরনিগম যদি তার অন্তর্গত এলাকায় যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো রয়েছে সেইগুলিকে ঠিক

পরিকাঠামো প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদের মাধ্যমে এই সমস্ত পরিষেবাগুলো জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে তবে জনসাধারণ এই সুবিধাগুলির সুফল অনায়াসে লাভ করতে পারবে।

৪. শিলিগুড়ি পৌরনিগমের অন্তর্গত এলাকার সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান ঃ

শিলিগুড়ি পৌরনিগম এলাকায় বর্তমানে যে সাধারণ গ্রন্থাগার গুলি রয়েছে তার বিবরণ নিচে টেবিল-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল

ক্রম সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠা বর্ষ	পুস্তকের সংখ্যা	ঠিকানা	জেলা
১	অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার	১৯৯০	৪০৫৭০	কোর্ট মোড়ের নিকটে	দার্জিলিং
২	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার	১৯৪৯	২৭৪০৮	দীনবন্ধু মঞ্চের নিকটে	দার্জিলিং
৩	রবীন্দ্র সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ শহর গ্রন্থাগার	১৯৬৯	৭৫৪৯	রবীন্দ্রনগর	দার্জিলিং
৪	আর্য সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার	১৯৫১	৬৬২৩	দেশবন্ধু পাড়া	দার্জিলিং
৫	বাঘাযতীন পাঠাগার	১৯৭৯	৪৯২৮	বাঘাযতীন কলোনী	দার্জিলিং
৬	দেওকোটা সংঘ গ্রামীন গ্রন্থাগার	১৯৭৮	৮৯৬১	প্রধান নগর	দার্জিলিং
৭	জ্ঞানদাসুন্দরী গ্রামীণ গ্রন্থাগার	১৯৬৪	১১৫৩৬	রথখোলা	দার্জিলিং
৮	সৌগত স্মৃতি গ্রন্থাগার	১৯৮৩	১০৪৮২	পূর্ব মিলনপল্লী	দার্জিলিং
৯	উদয়ন মেমোরিয়াল স্পোর্টস লাইব্রেরি	১৯৬৮	৩৫১৪	কলেজপাড়া	দার্জিলিং
১০	শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার	১৯৫২	১২৯৮৭	শক্তিগড়	জলপাইগুড়ি
১১	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পাঠাগার	১৯৭৮	৪৫৬৭	ঘোঘোমালি	জলপাইগুড়ি
১২	লেকটাউন পাবলিক লাইব্রেরি	১৯৮০	৩৪৪৩	লেকটাউন	জলপাইগুড়ি

(তথ্যপ্রাপ্তি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার হাল-হকিকত, ২০১৮)

৫. পৌরনিগমের পরিষেবা প্রদানে সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্ভাব্য ভূমিকা ঃ

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন (১৯৭৯) প্রণয়নের ব্যাপারে অগ্রণী ভূ মিকা পালন করে থাকলেও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ পরিষেবা (Library Extension Service) দেওয়ার ব্যাপারে সর্বদাই উদাসীন

রয়েছে। সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকলে সাধারণ গ্রন্থাগার এর উন্নতি সাধন কখনোই সম্ভব নয়। পৌরনিগমের উচিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে কমিউনিটি লাইব্রেরী কাম ইনফরমেশন সেন্টার (CLIC বা Community Library cum Information Centre) রূপে গড়ে তোলা। এই CLIC- মাধ্যমে পৌরনিগম যে পরিষেবাগুলি জনসাধারণকে প্রদান করতে পারবে তার সম্ভাব্য একটি পরিকল্পনা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ-

১. বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট একটি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। প্রতিটি গ্রন্থাগারে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে পাঠক-পাঠিকারা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।এছাড়াও বিভিন্ন অনলাইন আবেদন ও অনলাইনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে পাঠকরা।

২. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়াটি বর্তমানে অনলাইন করে দেওয়ার ফলে সাধারণ জনগণ গ্রন্থাগারে গিয়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদন জমা করে এই পরিষেবার সুবিধা লাভ করতে পারবে।

৩. পৌরনিগম যে সমস্ত করগুলি আদায় করে থাকে, সাধারণ মানুষ তাদের নিকটবর্তী গ্রন্থাগারে গিয়ে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে সেই করের মোটমূল্য জমা করতে পারবে।

৪. পৌরনিগমের অন্তর্গত অঞ্চলে বৈষয়িক কাজের জন্য যে অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় তা প্রাপ্তির জন্য সাধারণ জনগণ আবেদনপত্র সাধারণ গ্রন্থাগার এর মাধ্যমে জমা করতে পারে। পরবর্তীকালে অনুমোদনপত্রটির বন্টনও গ্রন্থাগার এর মাধ্যমে হতে পারে।

৫. পৌরনিগম জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক যে সমস্ত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকদের অবগত করা যেতে পারে। এছাড়াও জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের আবেদনপত্র নাগরিকরা তাদের নিকটবর্তী সাধারণ গ্রন্থাগার জমা করতে পারে।

৬. শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের টিকাকরণের সঠিক সময় ও তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সাধারণ গ্রন্থাগার এর মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে প্রচার করা যেতে পারে।

৭. জমি সংক্রান্ত যেকোন মূল্যায়ন ও আবাসন সংক্রান্ত যেকোনো অনুমতির জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে

৮. জল-সরবরাহ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক সাফাই সংক্রান্ত আবেদনগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার-এর মাধ্যমে পৌরনিগমের কাছে পৌঁছতে পারে।

৯. যানবাহন নথিভুক্তিকরণ বিষয়ক আবেদনপত্রও সাধারণ নাগরিকবৃন্দ গ্রন্থাগারে জমা দিতে পারে।

১০. সাধারণ গ্রন্থাগারে বিপর্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে সাধারণ মানুষকে আকস্মিক বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো পারদর্শী করে তোলা যেতে পারে।

১১. পৌরনিগমের আওতায় পড়ে এইরকম যে কোন বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগ সাধারণ নাগরিকরা তাদের নিকটবর্তী সাধারণ গ্রন্থাগারে জানাতে পারে।

৬. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, সাধারণ গ্রন্থাগারকে কমিউনিটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে সবার প্রথমে যেসব গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক বা অন্যান্য পদ শূন্য রয়েছে সেগুলোতে অবিলম্বে নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন নইলে নিয়োগের অভাবে যেভাবে বহু গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে আগামী দিনে আরও বহু সংখ্যক গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যাবে এবং এলাকার মানুষের শিক্ষা, পেশা ও অবসর বিনোদনের উৎকৃষ্টতম কেন্দ্রগুলি অবলুপ্তির পথে চলে যাবে।

বুকার পুরস্কার বিজয়ী ব্রিটিশ লেখক হাওয়ার্ড এরিক জ্যাকবসনের মতে পড়াশোনা বন্ধ করে এইভাবে ফেসবুক, টুইটার ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া জনসাধারণ ব্যবহার করতে থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে আমরা একটি মূর্খ প্রজন্ম উপহার পাবো যে প্রজন্ম আর পড়তে পারবে না এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন প্রজেক্ট, অ্যাসাইনমেন্ট, ডিজারটেশন এর জন্য ইন্টারনেট থেকে কপি-পেস্ট না করে যদি গ্রন্থাগারে বসে একটু পড়াশোনা করে কিছুটা নিজে লিখতে পারা যায় তাহলে অন্তত জ্ঞানের পরিধি কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. Das– C. S2012V. People– Governance and Development A Study of Siliguri Municipal Corporation Area. Phd Thesis. University Of North Bengal. (Unpublished)

২. Khanchandani– V. S2021V. Role of Public Libraries in the Evolution of Digital Bharat into Atmanirbhar Bharat. Public Library Quarterly– 1-15. https//doi.org/10.10-/01616-46.2021.1-/3115

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি
--শিলিগুড়ির সংস্কৃতি চর্চায় যেভাবে প্রতিশ্রুত

প্রদীপ নাগ

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি, শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক জগতে একটি পরিচিত নাম। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র প্রেমীদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে।

শিলিগুড়ি পুর নিগমকে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির কথা শিলিগুড়ির মানুষের কাছে ' পুরবার্তা' র মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রথমেই উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি আজ ছাব্বিশ বছর ধরে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করে চলেছে। এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শিলিগুড়ির মানুষ পরিচিত। তবু একটু ধরিয়ে দিতে চাই যে, সারা বছর ধরে ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছাড়াও, বছরে একবার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ও তথ্য চিত্র প্রতিযোগিতা ,শিলিগুড়ির বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ও শহরের চলচ্চিত্র প্রেমীদের নিয়ে ফিল্ম এপ্রেসিয়েসন কোর্স,, চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা সভা ইত্যাদি সংগঠিত করে এসেছে । বর্তমান এই লেখাতে সেই আলোচনা বিস্তৃত করতে হলে স্থানাভাব প্রকট হয়ে উঠবে। তাই সেই দিকে না গিয়ে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির আহ্বানে যে সব ভারতীয়, বিদেশী বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা, অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র চিন্তকরা এসেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে পরিচিত করানোই বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য। শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি ১৯৯৯ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলচ্চিত্র উৎসব সংগঠিত করে এসেছে। প্রতি বছর নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখ থেকে উৎসবের শুরু। উদ্‌বোধন হতো সাধারণতঃ নভেম্বরের ১৯ তারিখ , চলতো কখনো ২২ তারিখ কখনো ২৮ তারিখ পর্যন্ত। কারণ কোলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হতো নভেম্বরের ১০ তারিখ থেকে , চলতো নভেম্বরের ১৭ তারিখ পর্যন্ত। এটা নির্ভর করত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য কটা চলচ্চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তার ওপরে। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত চলচ্চিত্রর একটা অংশ, সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান ও শিলিগুড়ি শহরে প্রদর্শিত হোত। এই উৎসবে নানা সময়ে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে চলচ্চিত্র পরিচালক এসেছিলেন। যেমন জার্মানি, কানাডা , মেক্সিকো, বাংলাদেশ, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, ইরান এবং ভারতবর্ষের মুম্বাই,

কোলকাতা, কেরালা, আসাম প্রভৃতি রাজ্য থেকে।

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যারা এসেছিলেন তাদের কাছে শিলিগুড়ি পরিচিত ছিল না । বাংলাদেশ ব্যতিক্রম। দার্জিলিং তাদের কাছে পরিচিত ছিল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর পাহাড়ি জায়গা রূপে। কিন্তু শিলিগুড়িতে চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহনের পর দেশে ফিরে তাঁরা যখন আলোচনা করেছেন,তাতে শিলিগুড়িতে যে আথিতেয়তা তাঁরা পেয়েছেন , শিলিগুড়ির মানুষদের চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ যে তাঁদের মূগ্ধ করেছে; তাদের বক্তব্যে তার প্রকাশ ঘটেছে। কোলকাতার উৎসব কমিটির কাছে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে এই মত প্রকাশ করেছেন, চিঠি লিখে জানিয়েছেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুজয় ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, তরুন মজুমদার, কৌশিক গাঙ্গুলি, বেদব্রত পাইন, সোহিনী দাসগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, কমলেশ্বর মুখার্জী প্রমুখ। নবীন পরিচালকদের মধ্যে শিবপ্রসাদ মুখার্জী, সুদেষ্ণা রায়, অভিজিত গুহ, প্রদীপ্ত দে, ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী আসামের ববি শর্মা বড়ুয়া প্রমুখ। বাংলাদেশের তনভীর মোকাম্মেল, নূর ইসলাম মিঠু এবং আরো অনেকে। চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের মধ্যে অংশগ্রহনকারী উল্লেখযোগ্যরা হলেন অনিল চ্যাটার্জী, সব্যসাচী চক্রবর্তী,ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত , সোহিনী সরকার , শাশ্বত চ্যাটার্জী, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, তুহিনা দাস, গার্গী রায় চৌধুরী, রাহুল, ইন্দ্রাশীষ প্রমুখ। খালি প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলির মান সম্পর্কে তাঁরা প্রশংসা করেননি, সেই সাথে উদ্যোক্তাদের এবং শহরের মানুষের উষ্ণ আন্তরিক ব্যবহারেও মুগ্ধতা জ্ঞাপন করেছেন। চলচ্চিত্র উৎসবের সুর তো খালি প্রেক্ষাগৃহেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বাইরের সামাজিক আদান প্রদানেও তা সজীবতা লাভ করে। প্রশ্ন ছিল, শিলিগুড়ি শহরের চলচ্চিত্র তৈরির সম্ভাবনা কতটুকু ? সবাই একই সুরে বলেছেন, শিলিগুড়ি এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা যা অবশ্যই চলচ্চিত্রের পক্ষে উপযোগি। এবং এও উল্লেখ করেছেন, অভিনয়ের ক্ষমতার প্রেক্ষিতে শহরের নবীন প্রজন্মরা পিছিয়ে নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ভালো studio, ভালো camera, নানা যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে এগুলি শিলিগুড়ির বাইরের থেকে আনতে হবে, যা অনেক খরচ সাপেক্ষ , সেই টাকা এখানে কেউ সহজে বিনিয়োগ করতে পারবে না। এঁদের অনেকেই শিলিগুড়িতে film studio 'র কথা বলেছেন। শিলিগুড়িতে যাঁরা চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন তাঁরাও কোলকাতা শহরে বসেই করেন।

এছাড়া শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি আয়োজিত শিলিগুড়ি শহরের ছাত্র ছাত্রী ও চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষদের নিয়ে যে film appreciation course গুলি করা হয়েছিল তাতে বরেণ্য চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচকরা ও শিক্ষকরা অংশ নিয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, মৈনাক বিশ্বাস, বীরেন দাসশর্মা, সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায়, নবীনানন্দ সেন, শিলাদিত্য সেন ,জয়া মিত্র, রীতা দত্ত,

Fedaration Of Film Society Of India 'র সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ ঘোষ ও সহ-সভাপতি প্রেমেন্দ্র মজুমদার। তাঁদের আলোচনায় উঠে এসেছে শহরের নবীন প্রজন্মদের চলচ্চিত্র মাধ্যমটির প্রতি উৎসাহের কথা এবং সেই সাথে তাঁরা বলেছেন যোগ্যতার নিরিখে তারা পিছিয়ে নেই। প্রশ্নোত্তর পর্বে নবীন শ্রোতারা যেভাবে অংশগ্রহণ করেছে, তাতে তাদের চলচ্চিত্র মাধ্যমটির প্রতি অপার কৌতূহল এবং অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এই আগ্রহ সৃষ্টির পেছনে 'শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি'র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সাধারণভাবে অল্প কথায় এই শহরের মানুষদের কিছু পুরানো কথা মনে করিয়ে দিলাম। শিলিগুড়ি শহরের সাংস্কৃতিক জগতে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি কিছু কাজ করতে পেরেছিলো । এখন অবশ্য অতিমারির কারণে কিছু করা যাচ্ছে না। অতিমারি কেটে গিয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরে এলে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি আবার তার কর্মকাণ্ডে ফিরে যেতে পারবে শহরের মানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে।

—০—

শিক্ষা বিস্তারে চা উদ্যোগপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ঃ প্রসঙ্গ ঔপনিবেশিক শিলিগুড়ি

সুব্রত বাড়ই

চা বাগান গড়ে ওঠার পর এবং তরাই অঞ্চল যখন ব্রিটিশদের অধীনে আসে তখন থেকে এই অঞ্চলে শিক্ষার প্রশ্ন দানা বাঁধতে থাকে। খ্রিস্টান মিশনারিরা এ ব্যাপারে সব থেকে বেশি উদ্যোগী হয়, মূলত তাদের উদ্যোগে কিছু স্থানে পাঠশালা গড়ে ওঠে। ১৮৭৮-৭৯ সালে একজন স্কচ মিশনারি ম্যাকফারলেন উল্লেখ করেন, শিশুদের যেখানে বিপুলভাবে চাপ দিয়ে কাজ করানো হয় সেখানে শিশুদের দ্বারা পাঠশালা চালানো কঠিন। সেটেলমেন্ট রিপোর্টেও বলা হয় তরাই ও ডুয়ার্স পড়াশোনায় যথেষ্ট পিছিয়ে। তখনকার তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু জোতদারের ছেলে-মেয়ে ছাড়া চা বাগানের একটা শিশুও পড়াশোনা করত না বা আসতে পারত না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ছিল শুধু দার্জিলিং শহরে। আর দার্জিলিং পর্বতের পাদদেশ তখন ছিল বনাঞ্চলে পরিপূর্ণ। তরাই এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাধীনতার আগে দু-একটি পাঠশালা ছিল। সেখানে জোতদার ও বাগানের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতেন। এ জে ডাঁশে বলেছেন কিছু বাগান নিজে ও যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল। তবে বাগান কর্তৃপক্ষ চা বাগানের শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করুক সে ব্যাপারে উদাসীন ছিল। ১৯৪৮ সালে জাতীয় সরকারের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় সমগ্র দার্জিলিং জেলায় ব্রিটিশ আমলে মাত্র ২ শতাংশ শ্রমিকের সন্তান শিক্ষিত হতে পেরেছিল। তরাই এর বাগানগুলিতে প্রচন্ড শ্রমিক এর অভাব, আর যেহেতু শ্রমিকের সন্তানরা বাগানের কাজে যুক্ত থাকে তাই বাগান কর্তৃপক্ষ সেভাবে চাইতো না ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করুক। পাশাপাশি শিশুরাও পড়তে যাবে কী করে? মা-বাবার অনুপস্থিতিতে তারা সাংসারিক কাজ করতো, বাচ্চা সামলাতো। ফলে তাদের নিজেদের জীবনে শৈশব ছিল অবহেলিত, শিক্ষা অর্জন তো অনেক দূরের কথা।

দেশ বিভাজনের পর তরাই অঞ্চলের গুরুত্ব ভৌগোলিকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। উত্তরের চা বলয়কে যদি আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করি তবে তা হল- দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল, দার্জিলিং পর্বতের পাদদেশ ও সমভূমি যা তরাই নামে পরিচিত এবং আরেকটি অঞ্চল হল ডুয়ার্স। ১৮৩৫ সালে সিকিমের রাজা দার্জিলিংকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ইংরেজদের কাছে দান করেছিলেন। তবে ইংরেজদের দার্জিলিং যেতে হলে সিকিমের মধ্যে দিয়ে যেতে হত এই

অবস্থার নিরসনের জন্য ১৮৫০ সালে ৬৪০ বর্গমাইলের ভূখণ্ড সিকিম এর কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং পুর্ণিয়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করে। পরে তা তারা রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। আরো পরবর্তীকালে ইঙ্গ-ভূটান যুদ্ধের পর ভূটানের কাছ থেকে অধিকৃত কালিম্পং (যা তখন ডালিংকোট নাম ছিল) নিয়ে নতুন মহকুমা গড়ে ওঠে। ১৮৬৭ সালে ইংরেজরা কালিম্পং মহকুমায় অবলুপ্তি ঘটেয়ে তরাই মহকুমা তৈরি করে। আর এই নতুন তরাই মহকুমার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ফাঁসিদেওয়ার নিকট হাসখোঁয়ায়। এই সদরদপ্তর ১৮৯১ সালে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত হয়। আবার ঐ সালে কার্সিয়াং মহকুমা স্থাপিত হলে তরাই মহকুমার অবলুপ্তি ঘটানো হয়। সেসময় তরাই অঞ্চলকে কার্শিয়াং মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০৭ সালের শেষ দিকে শিলিগুড়ি মহকুমা গঠনের পর তরাই অঞ্চল শিলিগুড়ি মহকুমার অংশ হয়। তরাই একটি ফারসি শব্দ যার অর্থ হলো স্যাঁতস্যাঁতে ভূমি। উত্তর প্রদেশ, নেপাল এমনকি দার্জিলিং জেলাতেও তরাই নামের অঞ্চল রয়েছে। বর্তমানে শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত তরাই অঞ্চলে রয়েছে ছয়টি থানা।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর শিলিগুড়ি। এই শিলিগুড়িসহ সমগ্র তরাই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির একটি রেখাচিত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে, তবে ধারাবাহিকভাবে তরাই অঞ্চলের শিক্ষাচিত্র তুলে ধরা খুবই দুষ্কর। বর্তমানে শহরের আনাচে-কানাচে যেমন গড়ে উঠেছে প্রি-প্রাইমারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, জাঁকজমকপূর্ণ বিভিন্ন বেসরকারি ও মিশনারি ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলেজ। এই অঞ্চলে চা-শিল্প পত্তনের কাল থেকে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার চিত্র সে ভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগ শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি শহরে বেশ কয়েকটি জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছিল। এই স্কুলগুলিতে বিত্তশালী শ্রেণির ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনার সুযোগ পেত। এই সময়ে তরাই অঞ্চল গড়ে উঠেছিল অজস্র চা বাগান কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকদের সন্তানদের সেখানে পড়াশোনার সুযোগ ছিল না।

শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংরেজ সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ১৮৭৯ সালে বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ। যার ফলস্বরূপ তরাই অঞ্চলের দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৩ টি বিদ্যালয় হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬৬ জন থেকে ২১৭ জন হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলির সরকারি অনুদান ছিল মাসিক ৫ টাকা। জোতদাররাও মাসিক এক আনা করে বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নকল্পে টাকা দান করতেন। আলোচ্য সময়কালে জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট উকিল ডাক্তার মোক্তাররা চা-বাগানের কাজে যুক্ত হলেও রাজবংশী সমাজের জোতদাররা তাদের কৃষি অর্থনীতির বাইরে নিজেদের সেভাবে নিয়ে যেতে পারেনি। তবে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের জন্য অন্যান্য শিল্পপতি শ্রেণির মত রাজবংশী জোতদাররা কিন্তু মহতী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তরাই অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের দান করা অনেক জমিতেই বিদ্যালয় গড়ে

উঠেছিল। তারা শিক্ষার প্রসারের জন্য আর্থিকভাবেও সাহায্য করতেন। বর্তমানকালের মত শিলিগুড়িতে তখন শিক্ষাব্যবস্থা তেমন গড়ে ওঠেনি। এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৬৫ সালে ফাঁসিদেওয়াতে প্রথম প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।[১] হান্টারসাহেব অবশ্য ১৮৭৭ সালে বাগডোগরার নিকটবর্তী স্থানে একটি স্কুলের কথা স্বীকার করেছেন তাঁর স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্টে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, সেই বিদ্যালয়ে ২১ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করত। তৎকালীন বাগডোগরা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আবাসস্থল। জনবসতি সেখানে খুব একটা ছিল না। তবে ডক্টর সুদীপ খাসনবীশ তথ্য-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন হান্টারের উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মনে হয় বাগডোগরা না হয়ে ফাঁসিদেওয়াতেই হবে।[৪] তবে তিনি এটা বলতে পারেননি যে, বিদ্যালয়টি কোন মহৎ ব্যক্তির উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। কেদার নাথ সাহা, ভাতৃ গোপ, গজল সিংহ, ভোজ নারায়ণ চৌধুরীরা বিদ্যালয়ের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন ঘনশ্যাম চক্রবর্তী। চল্লিশের দশকের শেষে স্কুলটি হাই ইংলিশ স্কুল হিসেবে উন্নতি হয়েছিল। তখন ফাঁসিদেওয়ার হাসখোঁয়া ছিল তরাই মহকুমা সদর দপ্তর। ফলে এই এলাকার গুরুত্ব ছিল বেশি। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মহকুমা গঠিত হবার পর থেকে এই অঞ্চলের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তরাই অঞ্চলের চল্লিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। যেখানে ৬৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করত।' এই অঞ্চলের লোক সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। চা বাগান গড়ে ওঠার ফলে একাধারে জনবিন্যাস-এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তথাপি জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি গড়ে ওঠে নি, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। চা বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য শিশুদের শিক্ষার আঙ্গিনায় সেভাবে দেখা যায়নি। আদিবাসী নেপালিরা সেসময় চা-বাগানের কাজে ব্যস্ত ছিল। ঠিক তেমনি রাজবংশী, মেচরা কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাই শিক্ষার ব্যাপারে তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। তাতেও কিন্তু সমাজের বিশিষ্টজনেরা হাল ছাড়েননি, তারা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে। তথাপি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি অনেক দেরি করেই শুরু হয়েছিল। শিলিগুড়িতে রেলের জমিতে ১৮৯০ সালে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক রেভারেন্ড ফাদার প্রথম অস্থায়ীভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৮ সালে শিলিগুড়িতে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। শিলিগুড়িতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেরিতে গড়ে ওঠার কারণ হিসেবে অনেক কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, এই অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, তাছাড়া মহানন্দা নদীর পূর্ব পাড় ছিল রায়কত রাজাদের সম্পত্তি। সেখান থেকে তারা খাজনা সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন না। অপর পাড়ের বিরাট অংশ ছিল সিকিমের অধীন। ফলে সে সময় তরাই এর কোন ভৌগলিক স্থিরতা ছিলনা। সর্বোপরি জনবসতির ঘনত্ব কম, জঙ্গল ঝোপঝাড়, চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকা

হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল। যে সকল লোকেরা শিলিগুড়িতে বসবাস করতেন তাদের মধ্যে ছিল কিছু রেলের কর্মচারি কিছু ব্যবসায়ী পরিবার এবং স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা। ১৯০১ সালে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৮৪ জন। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে তৎপর হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ শিলিগুড়ি মাইনর স্কুল যা বর্তমানে শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয় গঠিত হয়।[১২] শিক্ষানুরাগী রায়সাহেব সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১৮ সালে তা মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। সে সময়কালের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তরাই টি গার্ডেন ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েশনও গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা নিয়েছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩৫ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৩ জন। স্কুল পরিচালনার জন্য সাধারণের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করা হত। ১৯১২ সালে শিলিগুড়ির জনসংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায় প্রায় ২০০০ জন। ১৯২২ সালে এই বিদ্যালয় থেকে ৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সাতজন পাস করেছিল। পরীক্ষা দিতে তাদের জলপাইগুড়ি শহরে যেতে হতো। ১৯৪৩ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ২৯২ জন, যার মধ্যে ৬ জন সাঁওতাল ছাত্রও ছিল।[১৪] তবে তারা চা-বাগানের শ্রমিক সম্প্রদায়ের সন্তান ছিল কিনা তা ঠিক করে বলা মুশকিল।

এরপর বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে খড়িবাড়িতে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। তৎকালীন দার্জিলিংয়ের আধিকারিক তরাই অঞ্চলের যে স্কুলের পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় একটি হাই স্কুল, দুটি ইংলিশ স্কুল, ৩৬টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, আঠারোটি সান্ধ্যকালীন বালক বিদ্যালয় ও মুসলিমদের জন্য ৬টি মক্তব এর উল্লেখ রয়েছে। তবে এই তথ্যের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে বলে গবেষকরা মনে করেন। খড়িবাড়ি অঞ্চলে যখন বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় তখন সেখানকার লোক সংখ্যা ছিল খুবই কম, সেই তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল আরো কম। ত্রিশের দশকের কাছে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হয়েছিল ৪০ জন এর কাছাকাছি। বদ্রীনারায়াণ সিংহ এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি ১৯৫৫ সালে জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক হন। বলাবাহুল্য তিনি তরাই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মধ্যে প্রথম স্নাতক ছিলেন। পরবর্তীকালে নীরদবিহারী রায় সরকার, চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী, বরুণ কুমার ভৌমিক , অমৃতলাল রায় সরকার, মেঘনাদ নাথ আরো অনেকের প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরেজি স্কুল থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খড়িবাড়ি বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য কৃতী শান্তি রায় সিনহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম এ পাশ করেছিলেন ১৯৬১ সালে। তরাই অঞ্চলের প্রথম মহিলা রাজবংশী স্নাতক হিসেবে তাকেই মনে করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে রাজবংশী আদিবাসী নেপালি ভাষাভাষী ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা করে। এই অঞ্চলে যথেষ্ট রাজবংশীও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা চল্লিশ বছরে আটান্ন শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনতার পরে তেমন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

১৯২৯ সালে আনন্দময়ী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে শিলিগুড়ি বেঙ্গলি গার্লস স্কুল নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাস হয়। ঠিক হয়েছিল তৎকালীন জমিদার হরিপদ মজুমদারের কাছারিবাড়িতে প্রথম এই বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু হবে। পরিচালন সমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন প্রদ্যোৎ কুমার বসু। প্রথমদিকে দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার, হরিপদ মজুমদার প্রমুখ অনেকেই সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে জমিদার নরসিংহ রায় বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেন। এই বিদ্যালয়টি ১৯৪০ সালে মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুল হিসেবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৬৩ সালে হায়ার সেকেন্ডারি মাল্টিপারপাস স্কুল হিসেবে পরিণত হয়। শিমূলবাড়ি চা-বাগানের কর্ণধার তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী জ্যোৎস্নাময়ীর নামে[১৬] স্কুলটির নাম করণ করা হয়।

১৯৩৩ সালে বাগডোগরার গোঁসাইপুরে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ডুমরিগুড়ি প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৪৪ সালে রাজশাহী বিভাগের ডি আই বিদ্যালয়টিকে মিডল ইংলিশ স্কুল হিসেবে অনুমোদন দেন। দেশভাগের ফলে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কমে যায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ায়। পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে জলহরি সরকারের সভাপতিত্বে, শ্রী নরসিংহ, রজনীকান্ত সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়টি গোঁসাইপুর থেকে আঠারখাই শিবমন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। শ্রী নরসিংহ-এর পুত্র ১৯৫৭ সালে প্রাইমারি স্কুলের জন্য নামমাত্র মূল্যে ছয় বিঘা জমি দান করেন। ১৯৭৩ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে শ্রী নরসিংহ মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হাই স্কুলের নাম পাল্টে রাখা হয় শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ।[১৭]

নকশালবাড়িতে ত্রিশের দশকে স্কুল স্থাপিত হলেও ১৯৪৩ সালে অনুমোদন লাভ করে নকশালবাড়ি ইংরেজি স্কুল। সেসময় মাত্র পাঁচ শতাধিক লোক এই অঞ্চলে বসবাস করত। নন্দ প্রসাদ, অতুল বিশ্বাস, ফকিরচাঁদ বিশ্বাস, হিতেন সিংহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণায় একটি পাঠশালা দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল। এরপর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা জিতেন সিংহের গোয়ালঘরে স্থানান্তরিত হয়। নন্দ প্রসাদের নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে তা থানাসংলগ্ন পতিত জমিতে স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নন্দ প্রসাদ হাজার টাকা ফটিকচাঁদ বিশ্বাস চারশত টাকা এবং ক্ষ্যাপা বিশ্বাস পাঁচশত টাকা দান করেছিলেন। বর্তমানে যে স্থানে স্কুল ভবন গড়ে উঠেছে সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি কর্মী আব্দুল গফুর মিয়ার বাড়ি ছিল। ১৯৫৩ সালে বিদ্যালয়টি স্কুল ফাইনাল বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত হয়। ১৯৭৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর মর্যাদা লাভ করে।

আগেই বলা হয়েছে শিলিগুড়িতে শিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল অনেক পরে। জলপাইগুড়ি যখন শিক্ষার দিক দিয়ে মধ্যগগনে বিরাজ করছে শিলিগুড়ি তখন ছিল শৈশবে। জলপাইগুড়ির অনেক শিল্পপতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

গঠনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে অনেকেই সহযোগিতা করতে দেখা গেছে কিন্তু তরাই অঞ্চলের ক্ষেত্রে সেভাবে কেউ এগিয়ে আসেনি। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে শিলিগুড়িতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। হরসুন্দর লাইব্রেরি নামে পরিচিত স্থানে শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়।[১৮] পঠন-পাঠন শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীযুক্তা নিভা দাশগুপ্ত। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিজয় চন্দ্র ঘোষ গোপাল চন্দ্র দত্ত, জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, মিত্র সম্মিলনীর সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যবসায়ী চা-কর এবং নকশালবাড়ি অঞ্চলের জোতদারবৃন্দ অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নেতাজি গার্লস হাই স্কুল।[১৯] প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ললিত কুমার মুখোপাধ্যায়। দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনে জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রভাস চন্দ্র রায়, প্রদ্যোৎ কুমার বসু, ব্রজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় বাবুপাড়া পাটগুদামে প্রায় ২০০ জন ছাত্র নিয়ে তরাই আদর্শ বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। রামেশ্বর পরিবার দেশবন্ধু পাড়ায় বর্তমান স্থানে স্কুলটির জন্য জমি দান করেন। শিমূলবাড়ী চা বাগানের মালিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য মোট চল্লিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার নামেই তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়[২০] এর নামকরণ করা হয়।

এরপর বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভব হয়। শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অবনী নাথ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট শিল্পপতি সতীশচন্দ্র কর, সমাজসেবী বীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় শিলিগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের কক্ষে ১৯৫০ সালে শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়-এর প্রাথমিক সূচনা হয়। পরবর্তীকালে উদ্বাস্তুদের জন্য অধিগৃহীত একুশ বিঘা জমিতে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে এটি গভর্মেন্ট স্পন্সরড কলেজ স্কিমের আওতায় আসে। ১৯৬৬-৬৭ সালে এর ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০৭৫ জন, ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪০৫ জন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষেরা পাড়ি দিয়েছিল এই বাংলায়, বিশেষত শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম কলোনির বর্তমানে সূর্য নগরে বস্তুহারা মানুষেরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের ১৯৫৪ প্রতিষ্ঠিত নেতাজী স্কুলে ভর্তি করে শিক্ষার সমাধান করত। মিত্র সম্মিলনীর পাশে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জমিতে নীলনলিনী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে রামকৃষ্ণ সমিতির জমিতে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয় এবং বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় নীল নলিনী বিদ্যামন্দির।[২১] ১৯৫৬ সালে শিলিগুড়ি হিন্দি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দিভাষীদের জন্য দার্জিলিং জেলায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৩৬ সালে পার্বতী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক একটি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে এর সুচনা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে কলেজ পাড়ার একটি বাড়িতে হাকিম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা ১৯৯৬ সালে হাকিমপাড়া বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়।[২২] কৃষ্ণমায়া

মেমোরিয়াল নেপালি হাই স্কুল দার্জিলিং তরাই এর প্রথম নেপালি বিদ্যালয়।[২৩] ১৯৩৮ সালে সেবক রোডে কোন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে এর সূচনা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে তা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হয়।

উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র তরাই অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বছর হল ১৯৬২ সাল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। যার প্রথম উপাচার্য বিনয়েন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত।[২৬] অতুল চন্দ্র রায় উপাচার্য থাকাকালীন ১৯৬৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নতুন পালক যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ।এই কলেজটি ১৯৭২ সালে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

শব্দবন্ধ সীমিত হবার কারণে তরাই দার্জিলিং অঞ্চলের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হল না। যদিও দেখা যায় এই অঞ্চল স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে যতটা পথ অতিক্রম করেছিল স্বাধীনতার পরবর্তী কালে তা দ্রুত গতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। এখন প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। বিশেষ করে চা বাগান অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিবাসীরা যেমন পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে মেচ, রাজবংশীরাও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে এই অঞ্চলে।[২৫] বর্তমানে শিলিগুড়িতে আরও বেশকিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Chakraborty Chhanda - 'The role of the Christian missionaries promoting Education among the people of Darjeeling District in the 19th century'– occasional paper no-1– Department of History– University of North Bengal– 1986– p.7.

2. Ibid. p.3.

3. Rai P.P. - 'Trade union problems and prospects vis-a-vis socioeconomic Development of the Laborer– (A paper submitted in a seminar on Labor Market Development– The Eastern Himalayas– Gangtak–) 1987– p.2.

4. De Barun - ' West Bengal District Gazetteers' Darjeeling District– p. 94

5. Dash A J - ‘ West Bengal district Gazetters– Darjeeling, Calcutta, 1980– p.94

6. ঘোষ ডঃ আনন্দ গোপাল - ‘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের রূপান্তরের ধারাবাহিকতা’, কিরাত ভূমি, শীত সংখ্যা, জলপাইগুড়ি, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-৯

7. Visitor Book– Phansidewa M. E. school.

8. খাসনবিশ ডঃ সুদীপ- ‘শতবর্ষের আলোকে দার্জিলিং তহ রাই এর শিক্ষা বিস্তারের রুরেখা(১৮৬৭-১৯৬৭)’, ভারত তীর্থ উত্তরবঙ্গ, সম্পাদনা- আনন্দ গোপাল ঘোষ ও অন্যান্য, সংবেদন, মালদা,২০১১, পৃ- ৯৭

9. Maley L.S.S.O- ‘Bengal District Gazetters– Darjeeling :Logos press, New Delhi– 1907– p.35

9. গঙ্গোপাধ্যায় অশোক-‘ বাংলার চা শিল্প এবং শ্রমিক অবস্থা’ রক্তকরবী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ- ১৬১

10. Das Rajani kanta- ‘ Plantation Labour in Indiaó Calcutta– 1931– p.165

11. বসু শ্রী প্রদ্যোত কুমার- একটি জনপদের কাহিনী, প্রকাশক শ্রীমতী উমা বসু পৃষ্ঠা- ১১-১২

12. ‘সবুজের কথা’- স্মরণিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ১৯৬৯

13. প্রাগুক্ত

14. Babu Jogesh Chandra Mitra- ‘Final Report on the survey and settlement operation in Darjeeling Terai (1919-1925)– Calcutta, 1927, p.19

15. 'মুকুলিকা', স্মরণিকা, প্লাটিনাম জুবলি সংখ্যা, জ্যোৎস্নাময়ী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি ।

16. ' কোরক' বার্ষিক পত্রিকা, শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ, অষ্টম বর্ষ, ১৯৯২

17. স্মরণিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ (১৯৯৬-৯৭), শিলিগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

18. চট্টোপাধ্যায় শিবপ্রসাদ- ' শিলিগুড়ির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' শিলিগুড়ি, ২০০০, পৃ-৯৩

19. স্মরণিকা, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ (১৯৯৯-২০০০), তরাই তারাপদ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

20. বিশ্বাস ডঃ সুপম - ' শিক্ষার প্রসারে বাঙালি চা- করদের ভুমিকাঃ প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা', উত্তরবঙ্গে বাঙালি চা উদ্যোগপতিদের বিকাশ ও বিলয়, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১১১

21. স্মরণিকা, কাকলি, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, হাকিম পাড়া বালিকা বিদ্যালয়, ২০০৪, শিলিগুড়ি

22. Daily student Dairy– Krishna Maya memorial Napali High School– Siliguri

23. Reflection-Golden jubilee celebration 1962-2011– University of North Bengal – May– 2011

24. খাসনবীশ সুদীপ- ঔপনিবেশিক পর্বে দার্জিলিং তহ রাই বিশেষত চা বলয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা (১৮৫০-১৯৪৭) , ইতিহাস অনুসন্ধান- ২৮ ,সম্পাদক- সব্যসাচী চট্রোপাধ্যায়, ২০১৪, পৃ- ৫৪২

শিলিগুড়ির হরিপদ ভট্টাচার্য - এক বিস্মৃত দেশপ্রেমী ঃ An unsung Hero……

সুদীপ চৌধুরী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে কত শত দেশপ্রেমী জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান কিন্তু নেই। এমন অনেক বিপ্লবী ছিলেন যাদের কথা আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। যেমন ধরা যাক শিলিগুড়ির হাকিম পাড়া (পরবর্তীতে দেশ বন্ধু পাড়ার) হরিপদ ভট্টাচার্য। আমার মনে হয় শিলিগুড়ি তথা বাংলার বেশীরভাগ মানুষ তাঁর কথা ভুলে গেছেন। সেই 'unsung Hero'র কথাই আজ বলব। আমার সৌভাগ্য তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতি বীণা ভট্টাচার্য আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের বীরত্বের কাহিনি। আর সে শিহরণ জাগানো সাহসিকতার কথা আজ এই 'পুরবার্তা'য় লিখে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

'হরিপদ ভট্টাচার্য' ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে, অত্যাচারী বৃটিশ পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের এক নাম। ঘটনার সূত্রপাত মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী অধ্যায়। তৎকালীন পুলিশের ডেপুটি সুপার রায় বাহাদুর আসানুল্লা খানের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাথে জড়িত বিপ্লবীদের পরিবারের উপর অকথ্য অত্যাচার। পলাতক সূর্য সেনের খোঁজে তার নির্দেশে এই অত্যাচার চরমে উঠেছিল। যে ক'জন ধরা পড়ল তাঁদের উপর জেলের অন্ধকার কুঠরিতে আসানুল্লা নিজে ভয়ংকর অত্যাচার চালাতেন। পিপাসিত বিপ্লবীরা জল চাইলে আসানুল্লা তাঁদের মুখে প্রস্রাব করে দিতেন। এই অত্যাচারের খবর মাস্টারদার কানে পৌঁছালে তিনি ঠিক করলেন আসানুল্লাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ কাজটি ছিল বড়ই কঠিন, কারণ আসানুল্লাকে সবসময় ঘিরে রাখত তার দেহরক্ষীরা। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হল আসানুল্লাকে হত্যা করবার। কিন্তু বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত মাস্টারদার নির্দেশে আসানুল্লাকে হত্যা করার দায়িত্ব পড়ল পনেরো বছরের কিশোর হরিপদ ভট্টাচার্যের উপর। ১৯৩১ সালের ২৭ আগষ্ট সূর্যোদয়ের আগে হরিপদ বাড়ি ছেড়ে বের হলেন এই 'মহান পবিত্র' কর্তব্য পালনের জন্য। বিপ্লবী সরোজ গুহ, যার কাছে হরিপদ শিখেছিলেন বন্দুক চালানো, হরিপদর হাতে তুলে দিলেন আগ্নেয়াস্ত্র জার্মান মাউজার। ২৮ আগষ্ট আর এক বিপ্লবী

নির্মল সেন তাঁর সঙ্গী হলেন। ২৯ আগষ্ট হরিপদ আসানুল্লাকে হত্যা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুবিধাজনক অবস্থানের অভাবে তাঁর প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিশোর হরিপদর রক্ত তখন প্রতিশোধের আগুনে জ্বলন্ত লাভার মতো ফুটছে। তিনি শিকারি চিতার মতো ওঁত পেতে থাকলেন। শিকারের সুযোগ এসেও গেল।

তারিখ ৩০ আগষ্ট, ১৯৩১। চট্টগ্রামের নিজাম পল্টন মাঠে চলছে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা। বিশিষ্ট অতিথি হয়ে উপস্থিত থাকবেন আসানুল্লা খান। তিনিই পুরস্কার প্রদান করবেন। এই খবর হরিপদর কাছে ছিল। যথা সময়ে আসানুল্লা এলেন। এবার সেই পুরস্কার প্রদানের পালা। পুরস্কার প্রদানের সময় উৎসাহিত জনতা আসানুল্লাকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়ালেন। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নির্ভীক লক্ষ্যে অবিচল, দেশপ্রেমী হরিপদ ভিড় ঠেলে আসানুল্লার একেবারে সামনে পৌঁছে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন, এই জন-অরণ্যে এখন মাত্র তারা দু'জন- তিনি এবং তাঁর টার্গেট- তাঁর 'শিকার' আসানুল্লা। হরিপদ তখন ব্যস্ত তাঁর টার্গেটকে 'আইসোলেট' করতে। তাঁর শ্যেনদৃষ্টিতে তখন মাছের চোখ সেই আসানুল্লা। হরিপদ অস্ফুট স্বরে 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করে সন্তর্পণে কোমর থেকে বন্দুকটা বের করে তার ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে সবার সব কিছু বুঝার আগে আসানুল্লার বুক ফুঁড়ে গুলি চালিয়ে দিলেন। আসানুল্লা মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার বুকের উপর চেপে বসে বন্দুকে যতগুলো গুলি ছিল সব চালিয়ে দিলেন। ঝাঁজরা হয়ে গেল আসানুল্লার নির্মম নিষ্ঠুর বুকটা। হরিপদ পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু মাস্টারদা বলেছিলেন ''তুই পারবি তো?'' হরিপদ মাস্টারদার চোখের উপর চোখ রেখে বলেছিলেন - ''পারব''। হরিপদ তাই আসানুল্লার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তার বুকের উপর উঠে বসে বাকি গুলি চালিয়েছিলেন। এভাবেই সেদিন ব্রিটিশ পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন এক তরুণ কিশোর হরিপদ।

হরিপদ ধরা পড়লেন। তার কপালে জুটল অবর্ণনীয় অত্যাচার। তার মাথায় ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছিল। সিগারেট ও চুরুটের ছেঁকা দেওয়া হয়েছিল সারা শরীরে। বেত্রাঘাতে চামড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাঁর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বাবা ভাইদের এমন কি তাঁর মাকেও পুলিশ মারধোর করেছিল। বিচারে তাঁর ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু না-বালক হওয়ায় তাঁর ফাঁসি হয় নি বটে, তবে তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলসহ অন্যান্য জেলে জীবনের ১৭টা বছর জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। তবু ব্রিটিশ সরকার তাঁর মুখ থেকে মাস্টারদা বা বিপ্লবী কর্মসূচী বা সে প্রসঙ্গে একটি শব্দও বের করতে পারে নি। বরং অত্যাচার যত হয়েছে ততই তিনি শ্লোগান দিয়েছিলেন - ''মাস্টারদা সূর্যসেন জিন্দাবাদ। বিপ্লব জয়ী হবেই। বন্দেমাতরম''।

এই হল হরিপদ ভট্টাচার্য। স্বয়ং নেতাজী প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে অভিনন্দিত

করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তার বীরত্বকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

সেই হরিপদ ভট্টাচার্যের সাথে ঘটনা প্রবাহে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বীণাপাণিদি, মানে আমাদের বীণা ভট্টাচার্য। তারা শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার আট ফুট বাই দশ ফুট কাঠের এক জীর্ণ ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে সংসার পাতেন। শিক্ষক সাহিত্যিক গৌরী শংকর ভট্টাচার্য স্মৃতি রোমন্থনে বললেন - তাঁদের 'দেড়খানা' ঘরের বাড়িতে আমি পড়াতে গেলে তাঁরা বাইরে বারান্দায় বসে থাকতেন। বীণাদি শিলিগুড়ি পৌরসভাতে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে আমার সহকর্মী হিসেবে পরিচয় এবং ক্রমশ আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। বীণাদিও ছিলেন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন আদর্শ মহিলা। কম কথা বলতেন। কিন্তু প্রতিটি কথার একটা অদ্ভুত গুরুত্ব ও ওজন থাকত। বীণাদি ও তাঁর স্বামী হরিপদ মিথ্যে কথা বলতেন না। তাঁদের দু'জনেরই ছিল একই আদর্শ- simple living high thinking. বীণাদির উপর দিয়ে অনেক ঝড় গিয়েছে, কিন্তু তিনি লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, বীণাদিই ছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রথম বাংলা টাইপ রাইটার। তাঁর স্বামীর প্রতি এ শহরের উদাসীনতা নিয়ে কিছু চাপা দুঃখ তাঁর মধ্যে ছিল। একদিন মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন-''উনাকে এ শহর সেভাবে..'' বলেই থেমে গিয়েছিলেন। সেদিন আমার মনে হয়েছিল, সত্যিই তো,ইন্দিরা গান্ধীর হাত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর সম্মান স্বীকৃতি হিসেবে তাম্রপত্র পেয়েছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালি তাকে কি মনে রেখেছে? এই শিলিগুড়ির মানুষ বা শিলিগুড়ি শহরের দন্ডমুন্ডের কর্তারা কি তাঁর প্রতি সেই সম্মান কখনো জানিয়েছেন? Street Naming Committee তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু পৌরসভার পক্ষ থেকে তাঁর নামে একটি রাস্তারও নামকরণ হয়নি। ১৯৯৩ সালের ৩০শে নভেম্বর হরিপদ ভয়ংকর অসুস্থতায় দেহত্যাগ করেন। ভাবতে অবাক লাগে তাঁর মৃত্যুর ২৮ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাঁর একটি মূর্তি এই শহরে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হল না। শিলিগুড়ির কাছ থেকে এই কি তাঁর প্রাপ্তি ছিল?? তাঁর ঘনিষ্ট স্বজন সেদিন শোনালেন মর্মস্পর্শী এক ঘটনা। হরিপদ ভট্টাচার্য তখন গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে শিলিগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। বেড পেলেন না। মাটিতে একটা নোংরা ম্যাট্রেসে তাঁকে ফেলে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছান সেই স্বজন। তিনি তখন ডাক্তারকে বলেন - জানেন ইনি কে? ডাক্তার নার্স (বাঙ্গালি) তাঁকে চেনেনই না, তাঁর নামও শোনেন নি। শেষে তাঁর পরিচয় দিলে তখন তাঁর ভাগ্যে একটা 'বেড' জুটল। ভাবুন! আরও অবাক করা কথা তিনি শুনালেন - সেদিন এ শহরে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের রাজ্য সম্মেলন চলছে। মতানৈক্যের জন্য হরিপদবাবু এ দল ত্যাগ করেছিলেন। সে দলের ছোটো বড় সব নেতারা শিলিগুড়ি শহরে ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন। অথচ তারা কেউ একবারের জন্য হরিপদবাবুর খোঁজ করেন নি, হাসপাতালে দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা। তাই অতি দুঃখে তাঁর সহধর্মিণী বীণাদি হরিপদবাবুর মৃত্যুর পর এদের কাউকে খবর দিতে দেন নি। নীরবে সেদিন তাঁর মৃতদেহ আর দশটি সাধারণ মানুষের মৃতদেহ সৎকারের মত জ্বালিয়ে দেওয়া হল। হরিপদবাবুর কন্যা সেদিন বললেন - ''এক পৌরকর্তা আমাদের বলেছিলেন বাবার নামে আমাদের দেশবন্ধুপাড়ার বাড়ির সামনের রাস্তাটার নামকরণ করা হবে। আজও হয়নি। তবে আপনি এসব লিখবেন না। কোনো দরকার নেই আর।'' কিন্তু আমি মনে করি এ এক পাতালপুরীর রুদ্ধ যন্ত্রণার সময়ের দাবী - শিলিগুড়ির শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে একজন লেখকের তথা এই শহরের নাগরিক হিসাবে আমার এ সব কথা তুলে ধরা- যদি বোধোদয় হয়। শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বিগত বোর্ড শিক্ষা- সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'পৌর সম্মান' প্রদান চালু করেছিলেন। আশা করব সেই ধারা অব্যহত রেখে হরিপদ ভট্টাচার্যের প্রতি দেরীতে হলেও বর্তমান প্রশাসক বোর্ড বা আগামীতে যারা বোর্ড গঠন করবেন তারা তাঁকে যোগ্য সম্মান প্রদান করবেন, কারণ 'মরণোত্তর পৌর সম্মান' তো প্রদান করাই যায়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক চোমঙ লামাকে (বিমল ঘোষ) ''মরণোত্তর পৌর সাহিত্য সম্মান'' প্রদান করা হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী,২০১৬ । এত না পাওয়ার

মাঝে একটাই আনন্দের কথা যে হরিপদ ভট্টাচার্যকে নিয়ে চোমঙ লামা লিখেছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ''চট্টগ্রামের অগ্নি কিশোর''।

এ লেখা শেষ করব হরিপদ ভট্টাচার্যের আর একটি দিক উল্লেখ করে। সেটি হল তিনি কিন্তু সাহিত্যের অনুরাগীও ছিলেন। ষাটের দশকে এই শহর থেকে প্রকাশিত হত 'সৈনিক' নামে একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা। সেই পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য সেই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভারও গ্রহন করেছিলেন। পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক চোমঙ লামা।

এরকম একজন মানুষ, এত বছর শিলিগুড়ি শহরে কাটিয়ে এই শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, অথচ এ শহর তাঁকে চিনতে পারল না। যাদের জন্য আজ আমরা স্বাধীনতার স্বাদ লেহন করছি তাঁদেরকেই আমরা যোগ্য সম্মান দিলাম না - এ বড় আক্ষেপের বিষয়...thy hath the right to forget me– Oh! Man….

কৃতজ্ঞতা ঃ
১) স্বর্গীয়া বীণাপাণি ভট্টাচার্য
২) দেবাশীষ চক্রবর্তী
৩) শুভ্রা চক্রবর্তী
৪) গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করাটা আমাদের কর্তব্য।
যে স্বাধীনতা, আত্মত্যাগ ও শারীরিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে অর্জন করা যাবে
তাকে আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে রক্ষা করার মতো স্বাবলম্বী হব।
— নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস

মহামারির আপনজন

প্রণব ঘোষ

শিলিগুড়ি হাসপাতাল তখন সিভিল হাসপাতাল। হাসপাতালে ঢোকার মুখে ডান হাতে সাদামাটা এক খাওয়ার ক্যান্টিন। সেখানেই কিছু তরুণের আড্ডা। এই আড্ডার মাঝেই হাসপাতালের রোগীর পরিজনদের নানান অসুবিধার কথা কানে আসে। কারো রক্তের প্রয়োজন, কারো রক্ত পরীক্ষা করা খুব প্রয়োজন,কারো আবার ঔষধ কেনার ক্ষমতা নেই, কারো আবার শব দাহ করার টাকা নেই। হাসপাতালের রোগীর এই ছোট ছোট অভাব দুঃখ ঐ সব বেকার তরুণ ও যুবকদের মন নাড়িয়ে দিয়ে যায়। তারা একত্রিত হয়ে বেওয়ারিশ লাশ এর দাহ শুরু করল নিজ খরচে, নিজেদের স্বল্প আয়ের থেকে টাকা বাঁচিয়ে গরিব রোগীকে ঔষধ কিনে দিল, স্বেচ্ছা রক্তদান শুরু করলো শুরু করল রুগীর প্রয়োজনে। এভাবেই একদিন গোষ্ঠিগত ভাবে কাজ করার ভাবনা থেকেই শুরু হল শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামনে মানব সেবার নতুন সংগঠন শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ১৯৭৭ সালে নির্ভীক চিত্তে, নিঃস্বার্থ ভাবে সাধারণ মানুষের জন্য যে কাজ শিলিগুড়ির বুকে. শুরু করেছিল এই সংস্থা, তা অনুরণন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় নামের পরে ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন নাম দিয়ে শুরু হয়ে ছিল স্বেচ্ছাসেবা। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুদূর আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে ইসলামপুর পর্যন্ত প্রায় ছোট বড় শহর ও গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। এ ধরনের সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। বিপদে মানুষের পাশে থাকে, বন্যা, ঝড়, ধ্বস-এ ত্রাণ বিলি করে, বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, মুখে অন্ন তুলে দেয়। অবৈতনিক চিকিৎসা শিবির চালায়। সাধারণ মানুষের স্বার্থে স্বল্প মুল্যে প্যাথলজি পরীক্ষা এক্সরে করে অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করে। এরা নিজের মত কাজ করে। স্বেচ্ছাসেবা এদের ধর্ম, মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াকে এরা কর্তব্য মনে করে। এ ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ির বুকে তৈরি হল আরো অনেক সংগঠন, যেমন ভক্তিনগর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, ঘোঘোমালী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, যুব ভারতী,বিবেকানন্দ রোভার্স ক্লু, শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা প্রভৃতি।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুব ভারতী,ঘোঘোমালী ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা যারা এখনো নিঃস্বার্থ ভাবে অনেক কাজ করে যাচ্ছে।

শিলিগুড়ির সূর্যনগরে পলিটেকনিক কলেজ তখন তৈরি হয় নি। খেলার মাঠে মাধ্যমিক পাশ করা কতিপয় তরুণ ফুটবল, ক্রিকেট খেলে খেলে, সন্ধ্যায় আম গাছের নিচে আড্ডা দেয়। এমনি করে এক দিন, উদ্‌ভ্রান্ত এক লোক আসেন তার প্রসূতি স্ত্রীর জন্যে রক্তের খোঁজ করতে। তরুণেরা চলল রক্ত দিতে। ১৯৮৯ সালে শিলিগুড়িতে

পুরবার্তা ২০২১

শুরু হল সমাজ সেবার এক নতুন অধ্যায়। স্থানাভাবে সূর্যনগর স্পোর্টিং ক্লাবঘর থেকেই চলল স্বেচ্ছাসেবা। পরিবর্ত রক্তদাতা হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বিনামূল্যে গ্রামে গঞ্জে চিকিৎসা শিবির শুরু হল। এই সংগঠন আজ স্বেচ্ছাসেবা কাজের নিরিখে শিলিগুড়িসহ পশ্চিমবঙ্গে এক অনন্য অন্যতম নাম।।

পৃথিবীতে যত কাজ হয়, তা সাধারণত তিনটি ক্ষেত্র থেকে হয়। প্রথম ক্ষেত্র সরকারি, দ্বিতীয় ক্ষেত্র বেসরকারি, তৃতীয় ক্ষেত্র স্বেচ্ছাসেবা। সারা পৃথিবীতে এই স্বেচ্ছাসেবা কাজে পরিমান সমগ্র কাজের প্রায় ১৪%। এই ক্ষেত্রে মানুষ কখনো ব্যক্তিগত ভাবে, কখনো গোষ্ঠীগত ভাবে, কখনো সমষ্টিগত ভাবে কাজ করে। শিলিগুড়ির পৌর এলাকায় বেশ কিছু সংগঠন বিগত বহু বছর ধরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে, শিশু ও মহিলা কল্যাণে, পরিবেশ রক্ষার্থে নিরলস কাজ করে চলেছে।

এই কোভিড অতিমারির সময় এইসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির পাশাপাশি প্রচুর নতুন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানুষের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। যাদের মধ্যে অনন্য অন্যতম ইউনিক ফাউন্ডেশন, হেল্প সোসাইটি-ফাড়াবাড়ি, ফোরাম ফর হিউম্যানিটি, শিলিগুড়ি স্নেহ, ইউনিক ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি, মনীষা নন্দী ফাউন্ডেশন, সানরাইজ ফাউন্ডেশন, উত্তরের অগ্রদূত, শিলিগুড়ি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম,ঘোঘোমালী সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, রথখোলা ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন, শিলিগুড়ি প্রচেষ্টা ইত্যাদি ।

২০২০ সালের প্রথম দিকে যখন কোভিড বা সার্স -২ ভাইরাস এর বিষয়ে ধীরে ধীরে অবগত হচ্ছিলাম, তখন ধারণাটা ছিল শিলিগুড়ির মারণ জ্বরের মত। কিন্তু যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগকে অতিমারি ঘোষণা করলো তখন এর গভীরতা বুঝতে পারা গেল। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যখন কীভাবে কাজ করা উচিত এই ভাবনায়, ঠিক তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী এবং শিলিগুড়ি পৌর নিগমের বর্তমান প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী গৌতম দেব মহাশয়ের আহ্বানে এবং পৌরোহিত্যে শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্বেছাসেবী সংগঠনদের নিয়ে এক সভার মাধ্যমে শুরু হয় যৌথ সংগঠন 'শিলিগুড়ি ফাইট করোনা'। যেখানে পূর্বে উল্লেখিত সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর নতুন অনেক সংগঠন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিগাল এইড ফোরাম, শিলিগুড়ি সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটি, আমরা কজন ইত্যাদি। এই যৌথ সংস্থার যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে ছিলেন শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের শ্রী পুলক গাঙ্গুলি এবং শিলিগুড়ি ন্যাফ এর শ্রী অনিমেষ বোস।

এই সংস্থার মূল কাজ ছিল মানুষের মন থেকে ভয় দূর করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সেই কাজ প্রথম দিকে প্রায় সব সংগঠন নিজ নিজ এলাকায় করে চলেছিল। শিলিগুড়ির শান্তিনগর বৌবাজার থেকে শুরু করে, নবগ্রাম, শিলিগুড়ি জংশন, চাম্পাসারি, হায়দর পাড়া, ফুলেশ্বরী, রবীন্দ্র নগর, রথখোলা, ঘোঘোমালী, গেটবাজার প্রভৃতি জায়গায় এ ধরনের সচেতনতা শিবিরগুলি চলছিল যার প্রায় শিবিরের মুল বক্তা হিসেবে ছিলেন উঃ বঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ কল্যাণ খান। এছাড়াও ছিলেন ডিন ডাঃ অনির্বান রায়, ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত (তিন জনই কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক এর সদস্য)। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার সদস্যগণ এই সব শিবিরে বক্তব্য রেখে মানুষজনকে অনেকাংশে সচেতন করে সাহস যোগাতে পেরেছিল।

পুরবার্তা ২০২১

এদের পাশাপাশি দেশ জুড়ে লকডাউন চলাকালীন শিলিগুড়ি লায়ন্স ক্লাব, শিলিগুড়ি লায়ন্স ক্লাব গিভার, মারোয়াড়ি যুব মঞ্চ, সি.সি.এন, আমরা কজন, ফোরাম ফর হিউম্যানিটি, সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা, শিলিগুড়ি স্নেহ সহ শিলিগুড়ির ছোট বড় ক্লাব, বিভিন্ন নাগরিক সমিতি শহরের নানা স্থানে সামাজিক রান্নাঘর করে দুবেলা খাবার তুলে দিয়েছে নিরন্ন মানুষের মুখে।

মানুষ মরে কিন্তু মানবিকতা মরে না- জীবনানন্দ দাশের এই উক্তি শিলিগুড়ির মানুষের কাছে সত্যি হয়ে ফিরে এল। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল বেশি বললে মৃত্যুভয় তৈরি হয়েছিল তা এই সব সংগঠনেরকাজের মধ্যদিয়ে দূর হয়েছিল বেশিরভাগই।

আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, অতিমারির প্রথম দিকে মানুষ এতটাই ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, বাবা, ভাই বোন এমনকি স্ত্রী, স্বামী আক্রান্ত হলে বাড়ির সুস্থ সদস্যরা তাদেরকে বাড়িতে রেখে চলে গেছেন অন্যত্র। এ ধরনের অমানবিকতার ছবি আমরা অহরহ দেখতে পেয়েছি আমাদের এই ভালবাসার শহরেই। সেই সময় সেই সব রোগীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করানো বা আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে খাবার এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌছে মানবতার নিদর্শন রেখেছে আবার এই শহরের ছোট বড় সংঠনের সদস্যরাই। এভাবেই চলল ২০২০ সালের লকডাউনের কঠিন পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে শুধু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিই নয়, বিভিন্ন ওয়ার্ডের ছোট বড় ক্লাবগুলি কোভিড সচেনতায় নিজ নিজ এলাকায় কাজ করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পৌর নিগমের অধীন ২২ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ড এর প্রায় সব ক্লাব। শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই দুই ওয়ার্ডের প্রায় সব গালামাল, ঔষধের, ষ্টেশনারি এমন কি পানের দোকানেও মাস্ক পরা, দুরত্ববিধি মেনে চলা, এর মত তথ্য ভিত্তিক ছোট ছোট ফ্লেক্স লাগিয়ে কোভিড সচেনতামুলক প্রচার করে নজির সৃষ্টি করেছে সংগে পৌর নিগমের ২২ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠে ও নানান স্থানে মাইক ও লাউড স্পিকারের মাধ্যমে কোভিড সংক্রান্ত বিধি নিষেধ লাগাতার প্রচার করেছে যা সমাজের মানুষজনকে যথেষ্ট সচেতন করতে এবং মন থেকে ভয় দূর করতে সাহায্য করেছে।

সে সময় হাজারে হাজারে পরিযায়ী মানুষ ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি শহরের মধ্য দিয়ে যাবার সময়,সেই সব শ্রমিকদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু মানুষ শিবমন্দির, মেডিক্যাল, মাটিগাড়া এলাকায় প্রশাসনের অগোচরে প্রচুর দামে বাড়ি ভাড়া দিয়ে সর্বস্বান্ত করার চেষ্টায় সেই সময় এই খবর পেয়ে শিলিগুড়ি ফাইট করোনার সদস্য এবং শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর সদস্যগণ সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে প্রশাসনের সাহায্যে বাড়িতে বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাতে সাহায্য করেছিল। পাশাপাশি লিগাল এইড ফোরাম সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যগণ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশন এর উপর দিয়ে যাওয়া যাত্রীদের খাবার,পানীয় জল, দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছিল ।

শুধু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়, পৌর নিগমের ওয়ার্ড কমিটি, পাড়ার বিভিন্ন নাগরিক কমিটি, নিজ নিজ খরচে, রাস্তা, ড্রেন,কোভিডে আক্রান্ত রোগীর বাড়ি স্যানিটাইজ করেছে প্রায় প্রতিদিন। অনেক মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজ করেছে কখনো স্বল্প মূল্যে বা কখনো বিনামূল্যে।

পুরবার্তা ২০২১

ভীত সন্ত্রস্ত সমাজে মানুষ যখন দিশেহারা ঠিক তখন ইউনিক ফাউন্ডেশনের এক মহিলা সদস্যা নিজে তিন চাকার টোটো চালিয়ে কোভিড আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে বা নার্সিংহোম পৌছে দিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে । এই ধরনের কাজ শিলিগুড়ির অনেক সংগঠনের অনেক সদস্যই করেছে। আবার 'শিলিগুড়ি স্নেহ' এর সদস্য উত্তম বিশ্বাস বা সঞ্জয় অগ্রবাল নিজে বাইকের পিছনে বসিয়ে রোগীকে হাসপাতাল বা মেডিক্যাল পৌছে দিয়েছে। যে সব সংগঠনের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আছে যেমন শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা, যুব ভারতী,সেন্টজন এম্বুল্যান্স, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি আরো বেশ কিছু সংস্থা কোভিড আক্রান্ত রোগীর জন্য সেই পরিষেবা প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন এই সব সংস্থাগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা, যুব ভারতী নিজেদের অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে যা শিলিগুড়ির বুকে মানব সেবায় এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

২০০১ সালে শিলিগুড়ির অজানা মারণ জ্বর এর সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে শহর পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি আরেকটা কাজ করতে হয়েছিল, তা হল, সে সময় শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ডাক্তারদের ধরতে বিমান বন্দর ও রেলষ্টেশনে পাহারাদারের কাজ করা। এবার এই মহামারিতে কিন্তু ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সেবা মনোভাব, অসুস্থ রোগীদের মনোবল বৃদ্ধি ও দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার সাহস যুগিয়েছে। এই মহামারীর যোদ্ধা হিসাবে নত মস্তকে আমরা এই সকল ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রণাম জানাই।

ধীরে ধিরে স্তব্ধ সমাজ জীবন স্বাভাবিক হতে লাগলো । সামনে দুর্গাপূজা, মহরম, দেওয়ালিতে মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন দুর্গাপূজা কমিটি, ক্লাব পূজা প্যান্ডেলে কোভিড সচেতনার ব্যানার লাগিয়ে কোভিড বিধিনিষেধ মেনে চলার অনুরোধ করে বিনামুল্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণ করে।

মানুষ আবার সুস্থ জীবনে ফিরতে শুরু করল, গাড়ির চাকা চলতে শুরু করল, অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সময়ই আবার আছড়ে পরলো করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যা এখনো বহমান।।

সাল ২০২১ ।আবার চারিদিকে অ্যাম্বুলেন্স এর সাইরেন, কান্নার রোল, সরকার উদ্বিগ্ন, টিকার হাহাকার, নির্বাচনের ভিড়। নার্সিং হোমে বেড নাই, হাসপাতালে জায়গা নাই।মানুষ দিশেহারা।।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে । এবারের সমস্যা একটু আলাদা। এবার মানুষের মনে তেমন ভয় নাই। কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক- এর সৌজন্যে আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে রিবন লাগানো নেই, রোগী নিতে পুলিশ আসে না বাড়িতে ।কিন্তু আক্রান্ত প্রচুর সংখ্যক মানুষ।সমস্যা গুরুতর।প্রায় সব রোগীর ক্ষেত্রেই একই সমস্যা শ্বাষকষ্ট ।শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাসপ্রাপ্ত।

চাই শুধু অক্সিজেন।চারিদিকে হাহাকার এই প্রাণবায়ুর জন্য। যোগান নাই। নার্সিং হোম গলা কাটছে।মানুষ বড় অসহায়।আবার সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়লো মানব সেবায়।

যে সব সংগঠন আগে থেকেই সাধারণ রোগীর প্রয়োজনে অক্সিজেন সরবরাহ করতো, তাদের দায়িত্ব আরো

বেড়ে গেল। পাশাপাশি শহরের ছোট বড় সংগঠন শিলিগুড়ি স্নেহ, ইউনিক ফাউন্ডেশন, ফোরাম ফর হিউম্যানিটি, প্রচেষ্টা, সি সি এন-লায়ন্স ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব গিভার,সেন্টজন অ্যাম্বুল্যান্স, যুব ভারতী, মারোয়াড়ি যুব মঞ্চ, রোটারি ক্লাব, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি নানা সংগঠন নিজের পয়সায় অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে রোগীর সেবায় সরবরাহ করতে শুরু করলো। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের এলাকার বাইরে প্রচুর সংগঠন কাজ করলেও তাদের নাম উল্লেখ করা গেল না। বৃহত্তর শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে অবশ্যই ঐ সব সংগঠনের নাম আসবে।

আরেক উটকো ঝামেলা সামনে এল, প্রচুর রোগী নার্সিং হোমে ভর্তি। নার্সিং হোমের ক্ষেত্রে বেড পাওয়া কঠিন কাজ। বেড পেলেও নার্সিং হোমের অত্যাধিক বিল সাধারণ মানুষকে আরো কঠিন অবস্থায় ফেলে দিল।শিলিগুড়ি ফাইট করোনা এবং বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন এর প্রতিবাদ জানায়। নার্সিং হোমের সঙ্গে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা শুরু হল। কিছুটা কাজ হল।

এই অক্সিজেনের হাহাকারের মধ্যে দেবদূত হয়ে কলকাতা লিভার ফাউন্ডেশন শুধুমাত্র কোভিড রোগীর জন্য শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিলিগুড়িতে বিভিন্ন সংগঠনকে ১৪ টা অক্সিজেন কনসেনট্রেটর দান করলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেবা দেবার জন্য। এই কনসেনট্রেটরগুলি যে সব সংগঠন গ্রহণ করে দিন রাত মুমূর্ষু কোভিড রোগীদের বাঁচিয়ে রেখেছে পৌর নিগমের অধীন সেই সব সংগঠনের মধ্যে ইউনিক ফাউন্ডেশন, সান রাইজ ফাউন্ডেশন,যুব ভারতী, ফোরাম ফর হিউম্যানিটি শিলিগুড়ি স্নেহ।এই পরিষেবা শিলিগুড়ির মানুষের কাছে এক আর্শীবাদ। এখন যার ব্যবহার পূর্ণ মাত্রায়। এক সময় রোগীর সংখ্যা এতই বাড়ছিল যে বাড়িতে রাখাটা বিপদজ্জন মনে হচ্ছে।। দরকার অক্সিজেন সুবিধা যুক্ত সেফ হোম এবং স্বল্পমুল্যে বা বিনামূল্যের হাসপাতাল। সঙ্গে মানুষকে হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের আপডেট বেড এর তথ্য।

কোভিড কেয়ার নেট ওয়ার্ক, সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা, লায়ন্স ক্লাব, অমিত অগ্রবাল ট্রাষ্ট,জনপথ সমাচার পত্রিকা কতৃপক্ষ এবং একটা ধর্মীয় সংগঠন শিলিগুড়ি শহরের বুকে দুটো সেফ হোম বানিয়ে ফেলল। একটা মেডিক্যাল এর কাছে অপরটা শিলিগুড়ি পলিটেকনিক-এ। পাশাপাশি কলকাতা লিভার ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন তিনবাত্তি মোড়ে বিনামুল্যে একটা ফিল্ড হাসপাতাল চালু করেছে। সেখানে এখনো রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট। সেফ হোম এবং ফিল্ড হাসপাতালে চলল রোগী ভর্তি হওয়া এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি যাওয়া ।

রোগীর স্বার্থে হাসপাতালের ও নার্সিং হোমের বেড এর তথ্য সরবরাহ - এর কাজেও সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শিলিগুড়ি ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন। সাধারণ মানুষের মন থেকে ভয় দূর করতে ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেল্‌থ এসোসিয়েশন, শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন শুরু করেছিল Mental Health Support Councilling. এই কাজ খুব নিষ্ঠার সাথে করে গেল।

বর্তমানে, দ্বিতীয় ঢেউ এর সংক্রমণ ও মারণ ক্ষমতা অনেকাংশে লোপ পেয়েছে।তার আর একটা মূল কারণ, কোভিড টিকাকরণ। সরকারেন পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও এই কাজে মুখ্য ভুমিকা পালন করছে।

গেটবাজার যুব ভারতী এবং ইউনিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিনামুল্যে টিকাকরণের ব্যবস্থা করে কোভিড টিকাকরন করে চলেছে।

পঃ বঃ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতায় কলকাতা লিভার ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে, শিলিগুড়ি ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন -এর পরিচালনায় শিলিগুড়ি স্নেহ, ফোরাম ফর হিউম্যানিটি, সান রাইজ ফাউন্ডেশন, ব্যবস্থাপনায় পৌর নিগমের ৪৭ টা ওয়ার্ডে এলাকায় সত্তরোর্ধ্ব মানুষ এবং পয়ঁতাল্লিশ ঊর্ধ্ব বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের টিকাকরণ চলছে। এখন পর্যন্ত ১৪ টা স্থানে এই টিকাকরণ করা হয়েছে।এই বিশাল কর্মকান্ডে শিলিগুড়ি পৌর নিগম এবং অবশ্যই বর্তমান প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম দেব মহাশয়ের অকৃত্রিম সহযোগিতা শিলিগুড়ির মানুষ আজীবন মনে রাখবে।

এই লেখাতে অনেক ব্যক্তি সংগঠন, যারা নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজের জীবন বিপন্ন করে এই অতিমারির মধ্যে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের সবার কথা লিখতে গেলে হয়তো এই লেখা কখনো শেষ হবে না।

একথা সত্যি যে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির মানুষ যতটা আত্মজ হতে পেরেছে তা অকল্পনীয় ।

‘সকলের তরে সকলে আমরা,প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’ তা সব সময় শিলিগুড়ির মানুষ নিজের জীবন বাজি ধরে প্রমাণ করেছে। সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

ভাল থাক বসুধার সন্তান।—

শুধু অনুরোধ, সবাই সরকারি নিয়ম ও করোনা বিধি মেনে চলুন, মাস্ক ব্যাবহার করুন, মাঝে মাঝে হাত সাবান দিয়ে বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ধুয়ে নিবেন। টিকাকরণ করিয়ে নেবেন। অযথা ভয় পাবেন না। করোনার তৃতীয় ঢেউ যেন আমাদের কাছে না আসতে পারে সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে । যদি আসে তবে যেন আমরা তা প্রতিহত করতে পারি সেই শক্তি মনে আনতে শুরু করুন।

শিলিগুড়ির সাম্প্রতিক খেলাধূলা নিয়ে দু'চার কথা

বিশ্বজিৎ গুহ

ফের শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বর্তমান বোর্ড ম্যাগাজিন **'পুরবার্তা'** শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্যে কর্পোরেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেব, প্রশাসনিক বোর্ডের অপর দুই সদস্য রঞ্জন সরকার, অলোক চক্রবর্তী মহাশয়দের কৃতজ্ঞতা জানাই। খেলোয়াড়রা তাদের ক্রীড়া নৈপুন্যে নাম ও ছবি ছাপার অক্ষরে দেখলে খুব উৎসাহিত হবে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে খেলার খবর প্রতিবেদনে রাখাও খুব উৎসাহজনক। শিলিগুড়ি পুরদপ্তরের পরিচালনায় বয়সভিত্তিক অনুর্দ্ধ-১৪, ১৭ ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে শিলিগুড়ি সূর্যনগর কর্পোরেশন, তরাই স্কুল, গেট বাজার রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে শিশু কিশোর খেলোয়াড়দের ভেতর খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা যেত। কিন্তু করোনা মহামারির জন্যে মাঠ ময়দান ২ বছর বন্ধ রয়েছে।

যদিও রাজ্য সরকার স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর সবুজ সংকেত দিয়েছে দর্শকশূন্য মাঠে। বাগানে যেমন ফুল ও ফল ফোটে, দর্শক ছাড়া খেলার মাঠ যেন নুন ছাড়া তরকারির স্বাদের মত হবে। এক সাথে লকডাউনে জমায়েৎ থাকা ভাল লক্ষণ নয়। তাই কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত। অতিমারি, মহামারি শেষ হয়ে গেলে আবার সবুজ ময়দানে ফুটবল গড়াবে। ফুটবলের রোমহর্ষক ম্যাচে দর্শক পরিপূর্ণ মাঠে হবে। ক্রীড়ামোদিরা এই আশায় দিন গুনছেন। খেলা, অনুশীলন বন্ধ থাকায় শিশু, কিশোর, যুবরা হতাশায় ভুগছে। হতাশা খেলা শুরু হলে কেটে যাবে। করোনার আগে শিলিগুড়ি ময়দানে স্টেডিয়ামে কয়েকটি বিখ্যাত ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হত। যেমন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পরিচালিত বয়সভিত্তিক অনুর্দ্ধ-১৪, সাব জুনিয়র খেলা, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ পরিচালিত প্রথম ডিভিশন, সুপার ডিভিসন ফুটবল লিগ, করোনার জন্য লিগের খেলা হতে পারেনি। প্রথম ও সুপার ডিভিশন। সাব-জুনিয়র ফুটবল ছাড়া অন্যান্য খেলা, টুর্নামেন্ট স্থগিত।

এবার ফুটবল নিয়ে শিলিগুড়ি ও আশোপাশের মাঠ ময়দান নিয়ে আলোচনা করছি। জুনিয়র খেলোয়াড়দের সাথে সিনিয়র খেলোয়াড়দের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা উল্লেখযোগ্য। জুনিয়র খেলোয়াড়রা বাড়ি থেকে বেশি না বেরোলেও সিনিয়র অর্থাৎ ভেটারেন্স খেলোয়াড়রা টুর্নামেন্ট ও খেলা নিয়ে মেতেছিল। খেলোয়াড়দের মাঠ সমস্যা, সংস্কার থাকলেও তারা সমস্যা সমাধানে নিজেরাই মেতেছিল। ভেটারেন্স ফুটবল নিয়ে শালুগাড়া, কার্সিয়াং, মিলন মোড়, করোনা কালেও তৎপরতা দেখিয়েছিল। প্রবীণ দলেগুলি যে ভুপেন্দ্রনগর, শালুগাড়া ফুটবল দল, ৩ নম্বর মাইলে আর্মি গ্রাউন্ড মাঠে ফাইনাল ও সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুব মঞ্চ ভেটারেন্স ফুটবল

চ্যাম্পিয়নশীপে প্রধান অতিথিরূপে জাতীয় খেলোয়াড় মনজিৎ সিং উপস্থিত ছিলেন। যুব মঞ্চ ভেটারেন্স ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শালুগাড়া ফুটবল ক্লাব ও লিম্বুবস্তি ফুটবল দল। ভেটারেন্স ফুটবল আসলে বয়স্ক মানুষদের চ্যাম্পিয়নশিপ। বেশিরভাগ খেলোয়াড় (সবাই নয়), কিশোর ও যৌবনের মাঝের প্লেয়াররা মাঠে আসতে আগ্রহী নয়। শিশু কিশোর বয়সী মাঠে আসছেনা কারণ তাদের হাতে সময় খুব কম। সারাদিন ৩/৪টি মোবাইল অ্যানড্রয়েড ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অভিভাবকগণ চান ফুটবল খেলে কি হবে? তার চাইতে পড়াশোনা করুক। এক এক জনের ২/৩ জন প্রাইভেট টিউটর। 'হাম দো হামারা দো', নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। ছেলে ফুটবল মাঠে খেলে হাত পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকবে। তার চাইতে পড়াশোনা করুক। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করুক।

প্রথম বছর সূর্যনগর কর্পোরেশন মাঠে প্রাইজ মানি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েও উৎসাহ ভালই দেখা গিয়েছিল। ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ফুটবলার ও কোচ সুভাষ ভৌমিক ও অন্যান্যরা। কিন্তু বাদ সেধেছে করোনা। বিধি নিষেধের জন্য ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ফুটবল ভগবান বলে কেউ থেকে থাকেন, তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা, করোনা যেন দেশ ছেড়ে চলে যায়। সাথে পুর কর্তৃপক্ষ তৃণমূলস্তর থেকে ফুটবলার বাছাই করার ব্যবস্থা করুন প্রয়োজনে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী খেলোয়াড়দের স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করলে খেলোয়াড়দের অভিভাবকরাও উৎসাহিত হবে। পুলিশ পাবলিক ফুটবল চালু রাজ্য সরকারের ভাল উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান পুলিশের সাথে পাবলিকের সম্পর্ক বাড়াতে। এর ফলে অনেক জটিল কাজ সহজ হয়ে যায়। পুলিশ, অফিস ফুটবল থেকেও অনেক প্রতিভা উঠে আসে। স্পট করতে সুবিধা হয়। ক্যারাটে মারপিটের খেলা নয়। মার্শাল আর্ট যেমন কুডো, আশীহারা, সোতোরিও, সোতোকান স্টাইল খুবই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এটি আত্মরক্ষা ও আক্রমণ দুই শেখা যায়। অনেকে আবার ক্যারাটেকে স্পোর্টস বলে ভাবতে রাজী নয়। কিন্তু কিক বক্সিং, উসু, তাইকোন্ডো অলিম্পিক ইভেন্ট।

সরকারি সাহায্য খেলোয়াড়দের ভাগ্যে জোটেনা। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুত হয়ে টুর্নামেন্টে পদক জিতছে ও গৌরব বাড়িয়ে চলেছে। ক্যারাটেতে যোগ্য প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে। স্কুল, কলেজে ন্যূনতম ফী দিয়ে ক্যারাটে প্রশিক্ষক রাখা হয়। ট্রেনে রিজার্ভেশন কাউন্টারে খেলোয়াড়দের দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়। তারা বিখ্যাত ফুটবলার ক্রিকেটার নয়। সেরকম প্রচারের আলো তাদের মুখের ওপর পড়ে না। শিলিগুড়ি থেকে টুর্নামেন্টে রাজ্য ও জাতীয় গেমসে খেলতে যাওয়া ও গৌরব বাড়িয়ে পদক জেতা এদের কাছে এশিয়ান গেমস ও অলিম্পিকের সামিল। পদক জয় করে রিজার্ভেশন না পেয়ে কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে বাথরুমের সামনে নোংরা, দুর্গন্ধজনক পরিবেশে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়। ক্রিকেটার ছাড়াও ফুটবলার, অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং সব খেলা ও খেলোয়াড়দের সমান

প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

এবার আসছি টেবল টেনিস প্রসঙ্গে। সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের সহ-সম্পাদক সৌমেন মালাকার বললেন, নতুন আঙ্গিকে এবার ক্লাবের ইনডোর হলে টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বিবেকানন্দ ক্লাব কয়েকদিন আগে স্টেট র‍্যাঙ্কিং টেবল টেনিস টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল। পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জয়ব্রত ভট্টাচার্য। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সায়ন্তনী দাশগুপ্ত।

২০০৫ সালের আগে পর্যন্ত ন্যাশনাল ও জোনাল খেলতে কলকাতায় গিয়ে র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হত। দল নির্বাচন নিয়েও বিস্তর অভিযোগ ছিল। ফেডারেশনের ওয়ান স্টেট ওয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সংযুক্তি নর্থবেঙ্গল স্টেট টেবল অ্যাসোসিয়েশনের ঘটেছে। আশা কলকাতায় গিয়ে উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়, কোচদের সমস্যায় পড়তে হবে না। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে টেবল টেনিসের উত্থান একদিয়ে হয়নি। ষাটের দশকে বৈদ্যুতিক আলোয় খেলা হত না। হ্যাজাকের আলোয় খেলা হত। তারপর উত্তরণ ঘটেছে। শিলিগুড়ি পেয়েছে একাধিক অর্জুন ও অলিম্পিয়ানকে।

কথা প্রসঙ্গে সৌমেন মালাকার বললেন, আমরা ক্লাবে খেলার কাঠামো, সারফেস বদল করেছি। কোচ, জাতীয় খেলোয়াড়, রয়েছে অর্ণব অধিকারী, সন্দীপন দে, অমরনাথ দাস। তবে আত্মতুষ্টির কোন জায়গা নেই। করোনার ভয় কাটিয়ে ফের শিলিগুড়ি সিটি অব টেবল টেনিস হয়ে উঠবে।

> গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো
> — স্বামী বিবেকানন্দ

GROWTH OF SILIGURI AS AN URBAN CENTRE: PAST, PRESENT AND FUTURE

Ranjan Roy

Introduction

The world urban population is increasing by leaps and bounds especially in developing countries due to the rapid growth of the population and it is an important issue for the planners, scientists and environmentalists. India is no exception to this hasty growth of the urban population. This growth of importance of the urban areas is so general and it cannot be resisted as every urban centre plays an important role of giving livelihood opportunities to the people. Today, not only a huge numbers of people live in or just adjacent to the towns and cities, but whole segments of the population are completely dominated by urban values, expectations, and life styles. From its origins as a locus of non-agricultural employment, every city or urban centre has become the major social, cultural and intellectual stimulus in modern urban society (Clark, 1982).

After the mid-20th century, developing world showed urban growth as a consequence of a new economic order resulting from the reorganization of production, labour, finance, service provision and competition on a transnational basis. Productions shifted to the developing world basically to penetrate the local market and also to use cheap labor for making goods for sale in the already developed countries.

Evolution of Siliguri

Siliguri, an unauthorized capital of North Bengal is situated in the northern most part of West Bengal at an elevation of 396 feet height on the both sides of river Mahananda. It lies at the base of Himalaya and it is the third largest city in terms of population in West Bengal after Kolkata and Asansol. This city falls on two districts Darjeeling and Jalpaiguri. The name of Siliguri has different meanings to different persons. One group believes that, the two terms of Siliguri that is 'Sili' means 'Sil' or 'Stone' and 'Guri' mean 'Place', So this means 'a place of full of stones'. But other group believes that, 'Sili' means 'heavy rain with hails' and 'Guri' means 'Place', means 'a place of heavy rainfall'.

The present Darjeeling had been created by British Indian Government actually accidentally in the 19th century with the affairs of neighboring Himalayan states. History of Darjeeling can be traced from the treaty of Titaliya in 1817 when the Raja of Sikkim requested to the British Indian Government for mediation of the disputes of Darjeeling and the neighboring states. For this, British Indian Government

deployed Captain Lloyd to deal this situation after the ten years of treaty in 1827. He spent Darjeeling for about six days and got attracted by its natural healing weather and planned to set up a site at this place as a sanatorium for the Britishers. From beginning, this district was administered by Deputy Commissioner with the head office in Darjeeling. Two subdivisions were there for proper administration. One was the Headquarter subdivision, which comprised the hill part and it was the larger part, and the second one is Terai subdivision, which comprised the lower Terai part with headquarter in Hanskhawa of Phansidewa. Hanskhawa served subdivisional headquarter from 1864 to 1880. After that, this headquarter had been shifted to Siliguri with the inclusion of some parts of Jalpaiguri district. So, the administrative history of Siliguri started from the year 1880. But between the year 1891 to 1907, this Terai subdivision was merged to the Kurseong part and the headquarter was shifted to the Kurseong, so upto 1907 in Siliguri there was a deputy magistrate who worked under the subdivisional officer of Kurseong. But after due some reasons the sudivisional headquarter was shifted again to Siliguri and renamed as Terai subdivision.

After the establishments of subdivisional headquarter in 1907, some dakbunglows, some timber cutting and rice mill were created. A sub-post office was established in the year 1907 and in 1968 it was upgraded to head post office. After that, Siliguri hospital was started. Growth was happening in a rapid way but not in a proper direction (Dash, 1947). At the time of independence, Siliguri subdivision had an area of nearly 22% of total district area with a population share of 24% of total district. Population density at that time was 342 in the Siliguri thana area and 366 in the Phansidewa thana and overall Siliguri subdivision was 349. The reason for this low density was unhealthy weather of Terai (Dash, 1947). Despite its unhealthiness, Siliguri experienced a tremendous growth after its origin, as the population which was only 784 in 1907, it jumped to 10487 in the year 1941 with a growth rate of 73% over the year 1931, when it was only 6067 (Dash, 1947). In 1931, it was a class VI town, but within three decades it got the status as a class II town and left behind all other towns of North Bengal. At that time, in 1961 it was the only urban centre that got this status as a class II town. In the year 1981, it named in the list of class I town with a population of 153825 with a growth rate of 57.80%. In 1971, this city had a total ward of 25 which later had been increased into 30 by dividing the previous wards into new wards in the year 1991. After that it annexed some portion from Dabgram of Rajganj block and Mandlaguri (present Mallaguri) of Matigara block and become the Municipal Corporation with a total ward of 47 and an area of 41.90 sq. km.

This region lies in the foothill of Himalaya, so it is highly prone to earthquake. For this, maximum houses in this place were made by wood and houses made with brick or RCC was almost absent. The only buildings made of brick at the time of independence in 1947 were the Siliguri Town Station Building,

adjacent Railway Quarters, Post Office, Court, Treasury Building, Prison Building and the house of Harsunder Majumdar- 'Harhari Kutir' (presently demolished) on the Station Feeder Road. However, on the other side of the Mahananda River in 1947, there stood the most beautiful RCC two storied house of Siliguri called 'Padma Niwas' owned by Santbir Lama (Chattopadhyaya, 2000).

In the post- independence period, Siliguri witnessed very fast growth of urban population due to the burden of refugees and for this, the growth rate of population in this city was more than 100% in the period of 1951 to 1961. Besides this, this city from beginning appeared as a workplace for the surrounding area and due to this in the aforesaid period a huge growth in the workers has seen here. Total numbers of workers had jumped from 2194 in 1951 to 5744 in the 1961 with a decadal growth of 162.6% (Siliguri Planning Organisation, 1965). This immigration was witnessed because Siliguri town was an entrepot market and the most important transport node for the entire north-eastern India. Thereafter, events like the Indo-China war in 1962, Indo-Pakistan war in 1965 and 1971and also the anti-bengali riots in Assam in 1964 contributed in a major way for the inflow of settlers in this city Siliguri.

Due to this unprecedented growth that Siliguri experienced in last decades, a planning organization named 'Siliguri Planning Organisation' was made under the Development and Planning department of West

Table 1: Total population and its decadal change of Siliguri (1931-2011)

Census years	Population	Decadal change	Decadal growth	Remarks
1931	6067			It came into existence as a urban centre.
1941	10484	4417	72.80	Effect of partition of India had changed the population structure in this city.
1951	32480	21996	209.81	
1961	65471	32991	101.57	It got its status as a class II town.
1971	97484	32013	48.90	Influx of migrants in the city. Municipality made into Municipal Corporation in 1994 by adding peripheral areas.
1981	153825	56341	57.80	
1991	216950	63125	41.04	
2001	472374	255424	117.73	Up-gradation from municipality to corporation – inclusion of peripheral areas.
2011	513264	40890	8.66	Future growth is subjected to supportive infrastructure for economic activities. City is rapidly developing in terms of economic activities. However, the residential population is slowly moving towards outskirts of the city (outside municipal boundary).

Source: Census of India, 2011

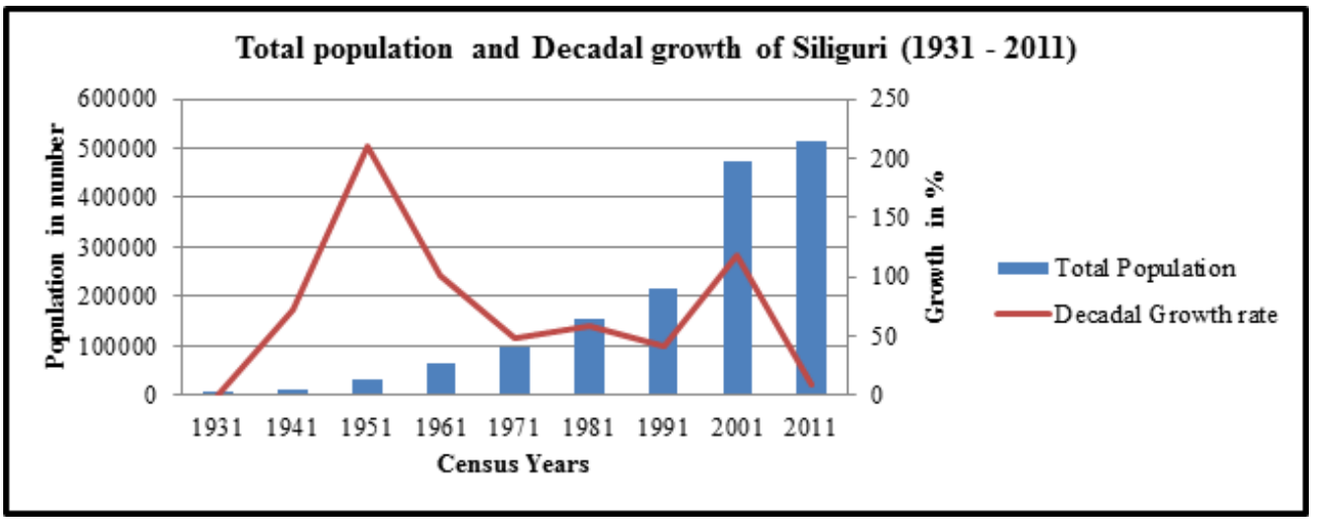

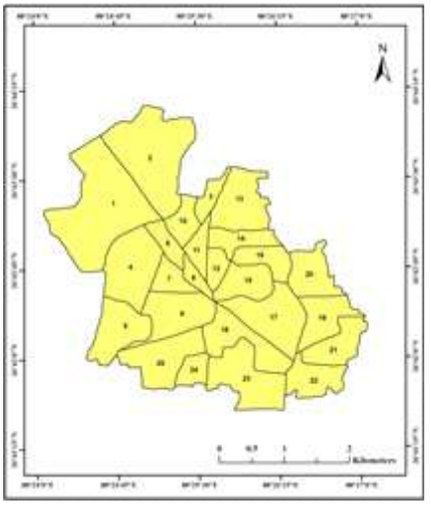

Siliguri Municipality in 1971

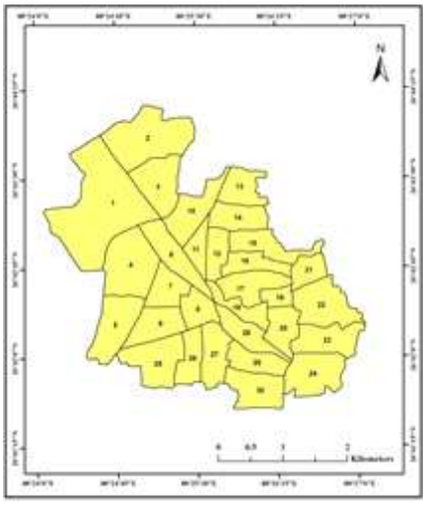

Siliguri Municipality in 1991

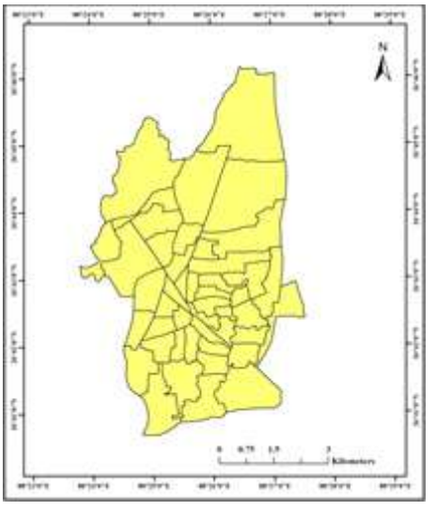

Siliguri Municipal Corporation in 1994

Bengal on 13th June of 1964. This organization in the year 1965 had prepared an 'Interim Development Plan for Siliguri' for the planning of future land use pattern and later on in 1967; this organization prepared a 'Comprehensive Development Plan' for this town. After some years it was felt by the officials that, SPO in many ways were unable to fulfill its work and hence, a new organization, namely 'Siliguri Jalpaiguri Development Authority' was formed on 1st April of 1980 under the Town and Country Planning (Planning and Development) Act, 1979. In 2004, SJDA prepared a 'Perspective Plan for 2025' which mainly focused on the infrastructure development in a planned way.

Demographic profile of Siliguri

Siliguri is one of the urban centres and a fast growing city. According to Census 2011, this city carries a population of 5.13 lakhs. Out of 47 wards, Siliguri has 14 wards in Jalpaiguri district and the remaining 33

wards in the Darjeeling district. The SMC population which falls in the Darjeeling district accounted for 0.32% of the total state's population and SMC population which falls in the Jalpaiguri district accounted for 0.24% of the total state's population. SMC population which falls in the Darjeeling district, accounts for 15.93% of the total Darjeeling population and SMC population which falls in the Jalpaiguri district accounts for 5.53% of total Jalpaiguri district's population. Population o SMC accounts for 1.01% of the urban population of the state in Darjeeling district and 0.75% of the urban population in Jalpaiguri district. The city has a considerable Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) population. As per Census 2011, the SC and ST population accounted for 12% and 1% of the total population respectively.

Population density has grown from 6,331 persons per sq. km in 1971 to 14,088 persons per sq. km in 1991. In the subsequent decade, population density has decreased to 11,274 persons per sq.km. This was due to expansion of SMC's limits to 41.9 sq. km and furthers the city's elevation to the level of a corporation. As per URDPFI guidelines, medium size cities densities may vary between 100 and 150 persons per hectare. As per census 2011, Siliguri city having around 106 persons/ha, this shows the scope for further densification in the city.

Table 2: Comparative population of Siliguri city

Indicator	Population in Lakhs			% of Urban Population to total Population	Urban population comparison	Total population comparison
	Total	Rural	Urban			
West Bengal State	912.8	621.8	290.9	31.9	1.0	0.3
Darjeeling District	18.5	11.2	7.3	39.4	40.4	15.9
Siliguri City in Darjeeling District	2.9	-	2.9	100	100	100
West Bengal State	912.8	621.8	290.9	31.9	0.8	0.2
Jalpaiguri District	38.7	28.1	10.6	27.4	20.6	5.6
Siliguri City in Jalpaiguri District	2.2	-	2.2	100	100	100
Source: Census of India, 2011						

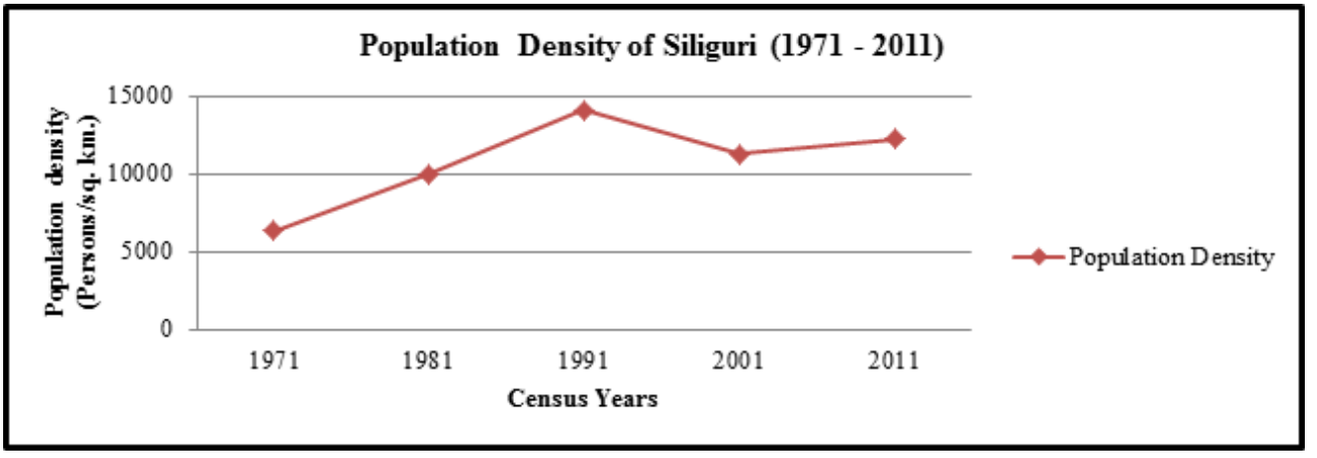

Siliguri has witnessed a constant increase in the total number of household during the past four decades. In 1991, Siliguri had 0.42 Lakh households which increased to 0.98 Lakh household in 2001. During 2001-2011 Siliguri saw an increase in 0.18 lakh households and at present there are 1.16 lakh household in Siliguri. The huge leap in the number of household is primarily due to the increased Municipal Wards in the Siliguri municipal corporation limits. Household size in SMC is 1.16 lakh as per 2011 census which is almost 0.58% the state figure of 200.67 lakh.

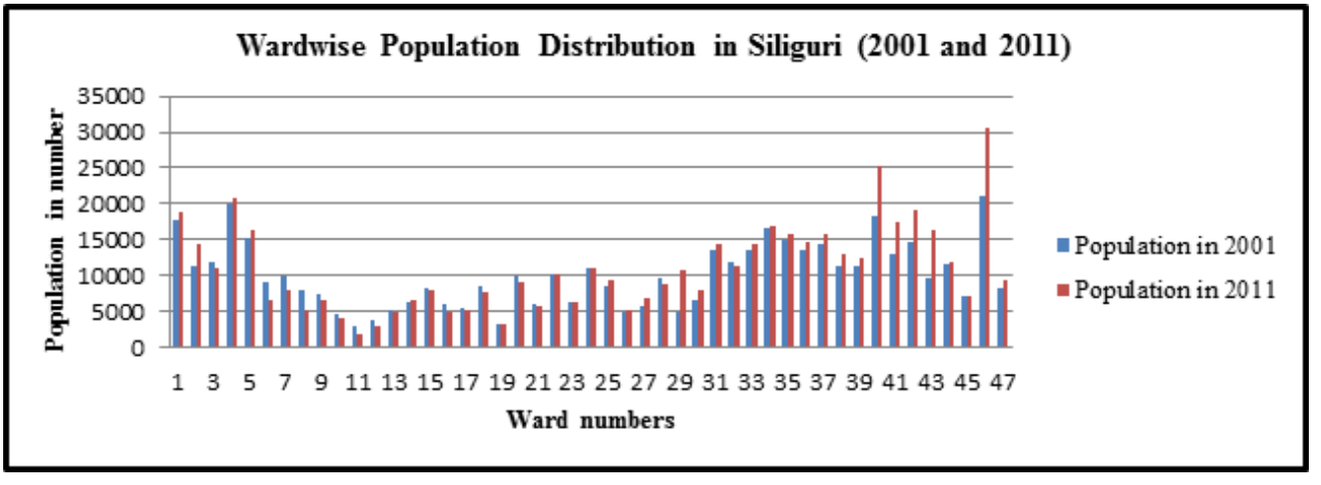

Infrastructural scenario of Siliguri city with special reference to Solid waste management and Transport facilities

This part presents a detailed about solid waste management and transport facilities of this city Siliguri. As this city is growing day by day, so it is necessary to provide different facilities by the Government.

Solid waste management system

Solid Waste Management is handled by the Conservancy Department of SMC. Households and commercial establishments are charged a monthly fee for door to door collection and this fee is utilized for primary collection, street cleaning, transportation and dumping at the disposal ground.

Sources of wastes

Siliguri is a rapidly growing city with a strong trade and commerce based economy. It is a gateway to North East India and to Sikkim, Bhutan and Nepal. Every tourist to Sikkim needs to change mode of travel at Siliguri. In addition, Siliguri draws a significant floating population for business and trade activities. According to SMC, the daytime floating population is almost 2-3 lakhs every day, which is 40%-60% of Siliguri's resident population. The generation of waste due to this is enormous. From 2005, SMC has taken various steps to assess the ground level MSW scenario and measures to tackle it.

Collection of wastes

For primary collection each block has one primary collector and one segregated tricycle that does primary collection from households and commercial establishments. This set-up can cover 250-300 households per day. Every 2 or 3 blocks have one covered van in which the tricycles empty their waste. Each cover van has two units joined together. Each ward has 25-30 staff per ward for street sweeping and drain cleaning. SMC has 45 nos. of dumper-placers on different main roads of the city which are cleared once a day. There are two cover vans (1 owned by SMC and another hired by Rs. 1800 per day for similar services as the tractors) for collecting waste from restaurants and hotels. One covered van is dedicated for collecting wastes (other than bio-medical wastes) from hospitals and nursing homes. The waste collection in markets is not done at individual shop level. Similarly, for parks and other public places, the maintenance team of the place dumps the waste at dumper-placers or at roadside and the conservancy staff collects it from there.

Table 3: Sources of solid waste materials in Siliguri

Sources of waste	MSW generated in Tones Per Day
Domestic source	163
Marriage hall	18
Hotels	10
Markets	55
Commercial establishment	20
Street sweeping	29
Hospitals and Nursing homes (Except bio-medical)	5
Total	300
Source: Siliguri Municipal Corporation, 2013	

Table 4: Infrastructure of waste collection	
Particulars	Number
Covered vans	226
Dumper placers	4
Tricycles	320
Tractors	20
Dumper trucks	60
Total number of vehicles	630
Source: Conservancy department, SMC, 2013	

Dumping of wastes

Solid waste was never treated in SMC except in the period from 2008-2011 as mentioned above. At present, the dumping ground capacity is almost full and it is under litigation due to health hazards to neighboring areas. A new dumping ground of has been purchased by SMC at Putimari in BinnaguriMouja. The area of the dumping ground is 21.7 acres. The approach road and boundary wall has been constructed but no dumping has started. This area is 12 km by road from SMC office.

Estimation of future solid waste generation

For the purpose of SWM projection, the waste generated per capita for the year 2013 has been considered as 377 grams. Accordingly the average per day waste generation has been estimated as 300 tons and annual waste general as 1.09 lakh tons. The per capita waste generation has been projected at 2.2% till 2021 and further it has been projected at 1.9% till 2031 and 1.6% in the year 2041(CDP of Siliguri- 2041). Accordingly, the annual solid waste generation has been calculated till 2041. Based on the solid waste generation estimates, the infrastructure requirement for primary and secondary collection, transportation, landfill, and treatment capacity has been estimated and the same has been discussed in the sector plans.

Table 5: Projected solid waste generation in Siliguri				
Year	Projected population in lakh (A)	Per capita waste generation in grams (B)	Average per day waste generation in tons (A*B)	Annual SW generation in metric tons (A*B*365)
2013	7.96	377	300	1096500
2021	9.38	384	360	133806
2031	11.64	391	455	168791
2041	14.43	397	573	212596
Source: CDP of Siliguri for 2041				

Transport and traffic facilities

Siliguri city is strategically located in terms of connectivity and connects rest of North-Eastern states and also to the neighboring countries of Bhutan, Nepal and Bangladesh. The National Highways NH-27, NH-

10, NH-17 and NH-110, and the State Highways SH-12 and SH-12A are the regional road connectors that pass through this area. Broad gauge railway lines connect rest of India to Assam in the northeast region and a narrow gauge heritage railway line connects Siliguri to Darjeeling traverse through the area.

Road hierarchy

The road network of Siliguri is mostly North-South oriented, Hill Cart road being the most important corridor along this direction followed by Burdwan road. The other important roads are Sevoke road and Bidhan road in the city. As per Siliguri Comprehensive Mobility Plan of 2011, about 4.4% of the road network consists of arterial roads, 3.2% sub-arterial roads and 8.1% inter-city and additional highway corridors. Other roads comprise 84.3 % of the total road network.

Table 6: Length of different types of roads in Siliguri

Types	Lengths in km.	Percentage
Arterial	28.68	4.4
Sub-arterial	20.85	3.2
Sub-arterial collector	52.64	8.1
Local	547.81	84.3
Total	650.0	100.0
Source: Comprehensive mobility plan for Siliguri, 2011		

Characteristics of traffic

Traffic volume data has been taken from CMP report to understand the city networks and major intersections. It is evident that Hill Cart road carries relatively maximum volume, i.e., the average daily traffic (ADT) between 47,639 PCUs and 83,828 PCUs and followed by Sevoke road which carries volume between 42,937 and 54,150 PCUs. The intensity of traffic volume varies from 83,828 PCUs (ADT) on Hill cart road to 16,900 PCUs at Deshbandhu para road.

The peak hour traffic intensity pattern has also been observed to be similar to the traffic intensity pattern for the day. The peak hour traffic ranges from nearly 9000 PCUs on hill cart road to 2700 PCUs at Burdwan road. However, the proportion of peak hour traffic is observed to vary from 6.5% to 17.9%. The peak hour on most of the locations was observed to be during morning hours. This can be attributed to the external traffic which moves into Siliguri from neighboring areas during the morning hours in order to reach around office hours and then moves out of the city as and when their work is finished.

Table 7: Traffic volume on major roads of Siliguri			
Road	Segment	Total PCU	Peak hour PCU
Hill Cart road	Between Venus more to Sevoke more	47639	5105
Hill Cart road	Between Sevoke more to Airview more	63222	8738
Hill Cart road	Between Airview more to Junction more	70072	8226
Hill Cart road	Between Darjeeling more to Junction more	83828	5478
Sevoke road	Between Sevoke more to Panitanki more	54150	4671
Sevoke road	Between Panitanki more to Bhaktinagar more	42937	3647
NH 27		28640	3427
Burdwan road		34500	2758
Bidhan road		16981	2549
Hill Cart road	Between Venus more to Mahabirsthan more	38256	6219
SF road		33560	2907
Katchari road		31442	3882
SH 12	Between Jalpai more to Tinbatti more	23471	3163
Desbandhupara		16946	3028
Source: Comprehensive mobility plan for Siliguri, 2011			

Major problems of Siliguri city

Significant problems have arisen through the extension and growth of this city Siliguri. Some of these are described below which should be given priority to minimize for the betterment of this city.

1. The major problem of this city is that, this city is growing at a very faster rate without any proper plan. Thus, a haphazard and unscientific growth has seen in this city which already converted a considerable amount of forest land and agricultural land into built up area.

2. The air quality in some places is too poor due to the heavy vehicular traffic movement, especially along the major roads in Siliguri. Hill cart road, Sevoke road, Bidhan road and Bardhaman road are the corridors with more air pollution. The air monitoring data shows a high value of SPM near TN Bus stand and SNT Bus Stand; this is due to the fact that the average speed of the vehicles is very low due to frequent congestion and waiting passenger vehicles producing high quantity of hydrocarbons.

3. Water pollution is one of the major threats to the Siliguri city Mahananda, Jorapani and Fuleshwari rivers are the major water bodies of the Siliguri city and is in degraded state. The sources of pollution of Mahananda River and other major streams in the city are, domestic sewage generated from residential areas, commercial areas, hotels discharging into the river, Small scale industries of various types i.e. tea processing and packaging, saw mills, small tanneries, motor repairing shops, etc. generating waste water and discharged into the common drains, Solid waste disposed to the river bank and river bed, Cattle excreta from the cattle sheds along the Mahananda river bank (Gurung Basti) and discharged into the river through drain etc.
4. This city once developed on the basis of transport connectivity, but at present due to the rapid growth of all kinds vehicles, the carrying capacity of roads have drastically reduced resulting huge traffic jam in the city. This city lacks alternative roads which can be used by different vehicles. Though after the improvement of NH 27 and AH 02 from Panitanki to Banglabandha, vehicular mobility has increased. The worst situation can be found in near the Darjeeling more which is the junction point of NH 27 and NH 110, along the Hill Cart and Sevoke road.
5. This city still does not have any proper and dedicated parking places for the commuters and for this SMC has provide a road side parking place along the Hill Cart road, Sevoke road and Bidhan road, which reduces the width of the existing road and create jam in peak times.
6. The urban heat island (UHI) is a phenomenon due to which the pattern of temperatures is higher in urban areas than in the surrounding areas. The major concern related to the UHI is air pollution. Higher temperatures increase ozone (O_3) pollution, because elevated temperatures can trigger the chemical reactions that form ozone. As per the existing land cover analysis of SMC, 74% of land is under developed area and 26% of land is under undeveloped area (green cover and water bodies) in the core city. The central Siliguri area experiences relatively more temperature due to high dense developments. This is followed by medium dense zone with water bodies and green cover. The peripheral areas have low density and experience relatively lesser temperatures.
7. No scientific treatment of solid waste have done in the dumping ground, which pollute the surrounding areas and for this dumping yards become full in a very short period.

Recommended suggestions

Some ways have to follow the stakeholders of this city to overcome these aforesaid problems and these are,

1. The City lacks a good Public Transport System which acts as a backbone for the Sustainable Development Strategies for any city. Due to the lack of good and efficient Public Transport System

the dependency on private modes increases which can be very dangerous as the city has limited available road space. Hence an efficient public transport system should be installed in the city.

2. Being a tourist city and economic centre of the region, there are many autos and taxis plying in the city. So introduction of CNG would reduce the carbon emissions.
3. Conservation and protection of resources like air, land, water, forests, energy and biodiversity, combined with a planned shift to a low or no-carbon economy; maximize uses of renewables for energy production and improving of energy efficiencies at all levels - generation, transmission, distribution and end users.
4. The city must incorporate the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) in its development strategies.
5. Stress should be given on energy conservation in building construction industries and for governmental and Hotel buildings so that the energy could be saved.
6. Dedicated parking place other than road side parking should be made by the authorities and along with this high parking charges should be implemented. Parking policy is clearly mentioned in the National Urban Transport Policy (NUTP) and JNNURM programme. The NUTP clearly spells out the need for high parking fees, which bound peoples to use the public transport.
7. A step can be taken for constructing different long route vehicle stand for different routes at the periphery of city to make such vehicle free in the core area instead of a single stand that located in Junction area. For example, vehicle stand in the Tinbatti area can be made for Cooch Behar, Alipurduar, Jalpaiguri and Assam bound vehicles, Paribahannagar should use properly for the departure and arrival of South Bengal, Bihar, Raiganj, Balurghat, Maldabound vehicles, Champasari area can be used for Sikkim and Darjeeling bound cabs and buses which will bifurcate the central congestion of this city.
8. Flyovers in some places like, over the Darjeeling more, Panitanki more, and Venus more or over the Hillcart and Sevoke road should be constructed. Foot over bridges can be made in some important crossing points which will be useful for peoples to cross the roads.

Beside these, some initiatives like, extend of width of major roads of this city, making ring road around the city, implementation of Intelligence Transport System or ILS, construction of metro rail service for rapid transport connecting important places like NJP, Fulbari, Medical area, Kadamtala, Bagdogra, Airport, Matigara, City centre, Salbari, Champasari, Pradhannagar, main city area etc. can be taken to overcome

the situation.

Different policies for economic development of Siliguri

The State has a low base of the manufacturing sector, as compared to the leading states on this front. Industrial and investment policy in 2013 aims at increasing the growth of manufacturing from 4.7 % (2010-11) to 20% at the end of five years. Policy proposed various infrastructure projects in the State to gear up the industrial growth. The policy proposed few infrastructure projects in and around Siliguri city as follows,

1. Upgradation of Bagdogra customs airport to International airport with a budget of 600 cr. by Airport Authority of India.
2. Development of Gajoldoba Tourism Hub, this site is 25 kilometers from Siliguri and involves development of a mega eco tourism hub with lake resort, 3 star/4 star/budget hotels, Open air theatre, Ayurvedic spa village, Arts and craft village, Retirement home, Golf course, Jungle trail, Picnic gardens, etc. over 208 acres.
3. New Siliguri bypass from Ghoshpukur to Fulbari under Bharatmala project of govt. of India.
4. New cement factory, namely, Star cement has already set up their unit near to the Fulbari area.
5. Setting up a dry dock near NJP railway station on 24.5 acres of land.
6. Siliguri-Jalpaiguri Development Authority has set a world class Tea Park on 50 acres of land near the NJP station for the manufacturing and packaging of tea.
7. Upgradation of four lanes NH 27 (Former NH 31D) from Siliguri to Dhupguri via Jalpaiguri is going on.

References

Clark, D. (1982). Urban Geography: An introductory guide. Taylor & Francis.

Dash, Arther Jules, (1947): Bengal District Gazetteers, Darjeeling, Bengal Government Press, Alipore, West Bengal.

Chattopadhyaya, Shivaprasad, (2000): SiliguriPurnangaItihas, Goodwill Press, Siliguri.

National Encyclopedia of Bangladesh – Railways, Retrieved on 10th February, 2016.

City Development Plan of Siliguri for 2041 (2015): Ministry of Urban Development, Govt. of India.

Siliguri Planning Organisation, (1965): Interim Development Plan of Siliguri.

Snapshots of a City : Claiming Spaces in Man's World

Zinia Mitra

Places thrive by consistent refreshing of two large knowledge pools. The first is made up of information gleaned from the stories we tell about ourselves. This is the understanding of who we are as people, how we got here, what conflicts link us together, what is honourable and what is repugnant to us and what kind of city we dream to construct and live in together. This kind of knowledge is more than objectively factual. It is coloured by subjectivity. It a common lens through which we view the world. Homer, Sappho, Pindar, Sophocles, Euripedes, Aristophanes have contributed towards the formation of what we call the ancient Greek worldview. We derive our emotional ties with Kolkata from books like *The Sleeping Dictionary* (Sujata Massey), *Walking Calcutta* (Keith Humphrey), *Bengal Nights* (Mircea Eliade), *City Of Joy* (Dominique Lapierre), *Walks in Calcutta* (Prosenjit Dasgupta), *The Calcutta Chromosome* (Amitav Ghosh), from the writings of Saradindu Bandopadhay, Satyajit Ray,Sunil Gangopadhay, and from many other writers, poets and painters, whose emotive responses awaken our sleepy vineyards.

In Siliguri, we share the common knowledge that Hill-Cart road, built by East India Company between 1860-69, is so named because people went up the hills in carts! We share the collective knowledge that the present day Pankhabari road was also known as 'pony road' because ponies would carry passengers and loads up the hill, that Lord William Bentinck had commissioned two British representatives Captain George Llyod and J.W. Grant and that the British legally owned Darjeeling since 1835. We have awakened to the colours of our city in the lines of Debesh Roy, Samaresh Majumdar, stumbling with elation at some words employed by Sirshendu Mukhopadhay, in the poetry, painting and short stories that pour out from the heart of the city, have known its history in bits and pieces, from the academic writings and the many researches on North Bengal and Tea gardens as also from conversations.

The second reservoir is empirical knowledge established by carefully collected evidence. It is established through logical proof, reasoning, and constricted analysis. This article builds on the first mentioned approach, since it grows out of personal memories and shared experience of living and believing in a city through the eyes of a non-native who eventually transplanted her sapling and grew her roots in the adaptive soil of Siliguri.

My first communication with Siliguri was grey. I was from Kolkata carrying a backpack of nostalgia and an umbrella of uncertainties. My father had a transferable job. Back then, a man's transfer meant relocating the entire family. Many families then relocated themselves with the servicemen and their shifting locales, along with their crates and cages, cartons and bundles, trucks and suitcases, dreams and aspirations. I was enrolled in Siliguri college. Not that there was much choice. Siliguri college, the oldest college here, was established in 1950. It offered all three streams- Humanities, Science and Bio-Science and honours in almost all subjects. The other colleges available then were Siliguri Commerce College (estd. 1962) which was a night college and therefore had less than a handful of girl students, because it was 'commerce' and 'night'. Siliguri Girls College (estd.1981) taught only pass courses. Bagdogra College came up the next year (1988) a little away from the town. Siliguri College was, talking about infrastructure, not what it is today. The building stood there in faded yellow, sifting the anagrams of my past, trading in my old aches and affections. The tall trees with their vitiligo barks swayed their green tops.

It is from here that I shall flourish the snapshots of the city that have amassed in my mind's attic, talk of the changes I perceive with reference to women and the city.

I had never dreamt that I would fall in love with this city, with the untrimmed trees that defined the roadsides, grew around the unboundaried college, with the tea and the vegetable chops of 'Rakhalda's Canteen', with the English classes of Samar Chakraborty, Pralay Majumdar , Sukla Bose, the very punctual classes of Raju Gupta, with the college library that preserved David Daiches, A. C. Baugh, Graham Hough, *Romantic Image*, *Natural Supernaturalism*, with the personal library of our HoD, Pralay Majumder, where I did most of my reading, with the dim movie halls of 'Urbashi', 'Anadaloke', 'New Cinema', with the pebbled floor of 'Kwality', where we ate dosa and had ice-cream competitions. Multiplex screens had not even figured in the dreams of the city. Girls would generally move round in groups. We could find girls cluster in corridors, in girls' canteen (boys and girls had separate canteens then), in empty classrooms, or sitting in circles with boys on the grassy college ground. After classes we would sometimes work in the college library, or walk to 'Urbashi' or 'Anandaloke' through Mahabirsthan's many shopped lanes, often taking fancy on Kaftaans, or pump shoes, Kolhapuris in fashion only after 'Qyamat Se Qyamat Tak', laced boots not yet in. We mostly window-shopped saving our pocket money for movie tickets and snacks. Our parents were not very generous with pocket money those days but always overtly generous for purchase of books. Collegepara had and still has a series of book- stores – a kind of miniature college street -frequented by students. There was 'Books' run by Samresh

Majumdar's brother, Tapan Majumdar that later shifted along with 'Ananda' to Subashpalli.

Talking of Feminism, 1990s saw the third wave. Individualism and diversity was being incorporated into Feminism somewhere, somewhere Riot Grrrl subculture movement combined punk music and politics and women were reaching out to a global audience through e-zines. We, the young college girls, had no clear notion of women's lib or women's empowerment here. Back home along with *Desh* Magazine, which was a compulsory read in every Bengali household, *Sananda* (first pub.1986, Ed.Aparna Sen) began to make occasional appearances. It gave us new information on dress and fashion, interior decoration, recipes, and also carried articles on debates on whether housewives ought to be paid, about child labour and drugs and other areas of women's awareness.

I remember, we watched Aparna Sen's 'Parama' in New Cinema and the long debates that followed in Girl's Common Room. The notions of patriarchy and women's emancipation existed only in books and were not in circulation in our vocabulary so much. Consequently, when we read Virginia Woolf's A *Room of One's Own* or *Mrs. Dalloway* for the first time, it was like a distant reflection in the mirror. We, like the 'Lady of Shallot' wove the patterns we saw on our speculums without interpretation. It was much later that we learned to recognise and interpret and choose to look away from the decorations that our society cast onto our mirrors under garb of different institutions, choose to leave our looms and participate in decision making and action.

We owe the recent developments in the conceptualisation of power to Foucault's works on power and knowledge that have had a significant influence on our contemporary advancements. Foucault has identified a non-economic form of power that, in his opinion, is an integral part of social life's microprocesses. Furthermore, he linked this exercise of power to the mechanisms and procedures that produce knowledge, and thus to knowledge itself.

During the fag end of eighties and early nineties, Siliguri college could, however, boast of 40% girl students in Humanities and 30% in Science streams (approx.) Very few girls took honours in science. Girls wore saris and cotton salwaar- kameez and generally wore their long hair in plaits. Most girls were married off after graduation, some even half way through graduation. In most cases, marriages were decided and/or forced by parents. Love marriages were not very prevalent and generally not accepted by the girl's parents because of caste / class mismatch. A good education for girls was seen as a prospect for a good marriage, which meant affluent and cultured in-laws, a passport into a 'good' household.

Srilatha Batliwala in her book *Empowerment of Women in South–Asia: Concepts and*

Practices (1993), points out that the starting point for women empowerment is women's consciousness. It begins with her self-imaged understanding of how gender and other sociological and political forces are acting on her. It begins with modifications of her beliefs about herself, with awareness of her rights and capacities.

We were gradually changing. From the arena of the quiet submissive we walked towards the arena of quiet rebels. It was noticeable in the daring choices some of us made in outfits and/or in hairstyles, in the choices which some of us made.

We had some wonderful lady professors in Siliguri College. There were Maju Karanjai and M.Mangomurthy in Chemistry, Shanta Dasgupta in Botany, Meena- di- in Geography, Krishna Das and Nibedita Chakraborty in Philosophy, Mithu Mukhopadhay in Political Science, Renu-di in Sanskrit, Gayatri Bhattacharyya in Bangla, Gitashree Bandana Sengupta in History. In English we had Shukla Bose in college and Urmila Chakraborty in the University, who is also a poet. These lecturers and professors instilled in us love and respect for the profession without any classes on women's empowerment. But they were only a meagre percentage when compared to male teachers. Many women were into teaching profession in kindergarten and high schools in the city. Morning in the city always woke up to women hurrying to bus stops, long strapped bags hanging from their shoulders, carrying piled-up copies , surrounded by young children in uniforms.

Siliguri can vaunt of a long list of girl's schools in and around it that includes 'Netaji Girl's School', 'Siliguri Girl's School', 'Jyotsnamoyee Girl's School', 'St.Joseph's (Matigara), Nirmala Convent. The list is non-exhausitve. Some schools founded by women like 'Mahbert High School' (estb.1967) by Mrs. Anne Mahbert, co-founded with her husband, George Mahbert, the Anglo Indian MLA from Darjeeling, was already at its peak in early 90s. 'Dreamland School', (estb. 1973) founded by Biswanath Chatterjee and managed by Chandrani Chatterjee, 'Sarada Sihutirtha' (estb.1993) managed by Jayanti Majumdar, 'Modella Caretaker School' founded and run by Mrs. Reba Bose (estb.1979) were successfully running by then. Preparatory schools like 'Little Scholars', founded by Mrs. Sheli Jain, and many other such schools mushroomed much later.

A large number of women back then saw housework as their whole- time primary duty. In most of the households our mothers here were still tackling Friedan's 'problem with no name'.

A small number of women moving into positions of power cannot be the measurement of women's empowerment. The process in this sense of the phrase is rather assessed as happening from the bottom to up rather than from the top to down.

Although there were a few renowned lady doctors, such as pediatrician Mridula Chatterjee,

and Utsha Mitra, wife of doctor Mitra, Mitra Nursing Home, who managed the administration and was an anaesthesiologist herself, although there were women lawyers in town, Gangotri Dutta stands as an example, teachers and professors, there were many gaps that women needed fill.

In early 90s few women sat at shop counters, and those who did were sari-clad middle-aged women filling in the gaps while their husbands took breaks for lunch. They were inexperienced when it came to handling customers and calculations. There were a few beauty salons run by women though, but no spas or unisex salons. We hadn't even heard of them. 'Hou Fa' in Seth Srilal market was a favourite of my friends. Another popular beauty parlour was 'Two-in-One' on Bidhan Road, which was half a shoe store and half a beauty parlour, and we had to pay the bill to the lady's husband. Ladies boutiques run by women were sprouting up in their impressive way. I recall 'Sananda', which we frequented where the women also kept us up- to- date on fashion and celebrity gossip.

Girls in Siliguri never lagged behind in sports. Mantu Ghosh became a national Table Tennis champion and made us proud. Mantu Ghosh had begun her training in 'Deshbandhu Sporting Union' and worked to win the Sub-Junior National Championship in 1988. She won the single's title at the 55th Senior National Table Tennis Championship in 1993. She was qualified to compete in all events of table tennis at the 2002 Commonwealth Games. She had caused quite an enthusiasm in us. Her student, Soumyajit Ghosh, also made a name. The achievements of Anita Das, Nandita Saha , Richa Ghosh, Poly Saha and Surabhi Ghosh are recent events. Much of the credit of popularizing Table Tennis in North Bengal goes to Bharati Ghosh (Babli di). Bharati Ghosh began playing table tennis at the 'Saigal Institute' in the 1970s and was a revered name by the time we were in college. Her expertise in the game helped her secure a position with the Indian Railways. She later began coaching young dreamers in the city.

Like tennis, trekking and camping, were popular among girls since the 1990s here. Since its inception in 1990, the 'Himalayan Nature and Adventure Foundation' has unfailingly organised treks and camps for both girls and boys. HNAF always had quite a number of female campers and trekkers. In fact, I had met Chanda Gayen at an HNAF camp shortly before she left on her last venture in 2014, and went missing in avalanche.

The city has also witnessed the long journey of theatre in which women's participation was not unremarkable. According to Siboprasad Chattopadhay a group called the 'Friends Union' founded in 1901 and later renamed 'Mitra Sammelani' set up the first theatre stage in the city. The first play they staged was 'Harish Chandra' in 1914. The Kolkata-based group theatre movement,

which developed as an alternative to entertainment-oriented theatres and was defined by experimentation in theme, plot, presentation and production, appears to have had quite an influence in the city. Women have been performing in the theatre here since 1954. Sarbasree, Sabitri Roy, Pari Basu, Devika Bandopadhyay, Swapna Roy, Mukti Karmakar, and Manika Sengupta are some of the names that occur in the writings on history of group theatre here. (cf: Nanu Mitra, (1996) 'Bengali Theatre and Theatrical Culture in Darjeeling', Madhuparni Patrika.) Among notable theatre groups here were 'Katha o Kalam' (1957), 'Milemishe' (1961), 'Karnik' (1969) which had prominent women actors like Chaya Mitra and Krishna Maitra, 'Damama' (1972) , 'Rangan', 'Ingeet' (1977), 'Gana Natya Samgha Uttardhwani Branch' (1977). 'Uttal' was established in 1978 by Bhaswati Chakrabarty, and Gautam Chakrabarty. 'Ritwik' , 'Balaka', 'Spulinga', 'Sreejan Sena','Thoughts Arena' were among the groups who performed original and adopted plays for the city's audiences. Many of these groups still exist. Since most of the stories are male narratives, they necessitated limited casting of women performers. Theatre is one area that is very well documented here. We who regularly visit Dinobandhu Mancha to watch plays and refer to them in classroom teachings, can acknowledge the women who took the extra steps in those days to perform on stage.

There were some privately run music schools where girls could learn to sing and play music. Girls performed both songs and dances formally in school and college programmes. During our college-university days, there were no regular live concerts, jazz, or pub karokes available. Kumkum Mukherjee, Mithu Roy were among notable rabindrasangeet singers, and Malabika Charkaborty was known for classical and Najrulgeeti songs. They were aired in Akashbani. Rajya Sangeet Academy would hold workshops in Dinobnadhu Mancha since mid- 90s. Salwarts like V. Balsara and Amar Pal came here as resource persons. In dance, we had heard of Bithi Dutta, Puspa-di, Chitralekaha Biswas,Meera-di,Maya Basu. Sangeeta Chaki later founded Hakimpara Nritya Malancha. Dance schools too were not as flourishing as they are now.

The Women's Reservation Bill of 9th March, 2010, that proposed to reserve 1/3rd of all seats in the Lower house of Parliament of India, the Lok Sabha and in all state legislative assemblies for women, is seen as a major step towards empowerment of women in India. Politics and women in Siliguri calls for a detailed study and analysis. Mention must be made of Gangorti Dutta who was the mayor of Siliguri from May 2009 to June 2014.

The most salient feature of the term 'empowerment' is that it contains the word 'power' within it. By 2000, Centre for Women's Studies was established in the University. It undertook many awareness camps and gender sensitization programmes, both by itself and in collaboration

with colleges in and around Siliguri. Some NGOs too worked towards the purpose.

Globalisation and the internet have accelerated women's emancipation by bringing the entire world together, first on computer screens and now on cellphones. Girls from impoverished families now have access to education, thanks to the introduction of *Kanyashree Pakalpa*. Parents have gradually moved away from inculcating in their daughters the notion that marriage is the only goal they can pursue. Girls can now cultivate and perceive diverse dreams. Women are now visible in almost every sphere in the city life. They work in government offices, run shops, work in shopping malls, work in and run salons and boutiques, in furniture stores, work as interior decorators, work in departmental stores, run and work in coffee cafes , pubs, and even drive totos. Along with their work and profession, they also pursue their personal hobbies.

While empowerment is seen differently by different theorists, Kabeer N. in *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought* (1994) distinguishes between 'power to', 'power over' and 'power within'. Any discussion of women's empowerment speaks of increased awareness and opportunities, as well as of violence against women. The problems that are sometimes overlooked are the conditions, which disable women to resist any kind of violence against them. How internalised oppressions place internal barriers to women's exercise of power requires a serious investigation.

However, overall, women's conditions have improved and continue to improve. Many women can now speak up about their discrimination and report it to the various cells set up by the West Bengal government as well as the non-governmental organisations (NGOs) that are there to help them. The Siliguri Police Commissionerate (or Siliguri Metropolitan Police), established recently in 2012, has an exclusive page dedicated to women trafficking in their official website. The girls are now more confident than we were, with clear goals and knowledge of career opportunities. Girls cultivate ambitions with specific professional goals. They demonstrate solidarity with women all over the globe with candle marches, blacked out Facebook profile pictures in cases like Nirbhaya or Hathras, and collectively organise Pride parades.

The population of Siliguri Municipal Area was 65,000 in 1961, and it climbed by around 51% every decade until it reached 227,000 in 1991. If we consider the population of Siliguri city alone, the population has more than doubled from 1991 to 2021. The city has exploded! (Ghosh, 2016). Siliguri always had a multilingual population. It is reflected in the programs organised here, in literary meets, little magazine fares, poetry readings sessions, even in the cultural programs on International Mother Language Day.

The city has undergone significant developments. The single dimly lit Hill Cart road has

been replaced by a bifurcated two-way road with neon lights, billboards, traffic lights. Surjyasen Park, Second Mahandnada Bridge, Third Mahananda Birdge, Uttorayan Township (in place of Chandmuni Tea Estate), Shopping Malls - Marda Complex, Cosmos, City Centre, Planet Mall, Vega Circle, Bazar Kolkata- and many other such structures now hang on the city's eyelids. New fashionable apartments have replaced the song of rain on tin roofs. New hotels, clubs, pubs, CCDS, and departmental stores have filled up spaces rapidly between the clock and the promise.

But the old city refuses to leave me. It stubbornly dawdles in the trail of roasted cobs, the whiff of sugarcane juice, in the ribs of unmapped houses that silently watch the Spring arrive under new roofs.

I am a generation that has witnessed significant progress in women's empowerment here. In some ways, I am part of the cohort that brought about the change. It is up to us to tell our pieces of truths as we have witnessed them, our stories rooted in the complexities of our lived experiences, and not from any dogma or ideological abstraction.

I can say with Alberto Ríos:

"…You and I, we are the secret citizens of the city
Inside us, and inside us…".

Acknowledgements:

1. *Atig Ghosh. (2016) The Importance of Being Siliguri, or the Lack Thereof Border-Effect and the "Untimely" City in North Bengal. Kolkata. Mahanirban Calcutta Research Group.*
2. *Deb,Anamika. (2018). 'Darjeeling District : A Significant Summation of Modern Bengali Theatre: A Silent Contribution in Indian Theatrical Culture'. International Journal of Creative Research Thoughts. Vol 6, Issue 1,pp 740-743.*

The impact of Growing Propensity of Threats to Rivers in Siliguri and its Redressal

Dr. Suprakash Roy

Siliguri, a developing city and known as the ***'Gateway of North East India'***, achieves its present existence sharing an area partly belonged to Darjeeling & partly Jalpaiguri districts of West Bengal. It is the third largest urban agglomeration in West Bengal after Kolkata & Asansol. Jalpaiguri town lies 35 k.m. away from Siliguri city and the merging of these two cities will make them the largest metropolis of the region in near future. The urban area of Siliguri comprises 62% of *Darjeeling* & 38% of *Jalpaiguri* districts respectively. Average elevation of the city is 400 ft. and geographical location lies at 26° 71' North and 88° 43' East. The total area of the city is 260 sq.k.m. The location of the city is considered to be a very sensitive geo-strategical region. It is also called ***Chicken's Neck*** or ***Siliguri Corridor*** because it connects four international borders i.e. China, Nepal, Bangladesh and Bhutan and also bridges the North East portion with the main land of India. Mainly it is a trading and transportation hub, over time it has grown from a village to a commercial hub. In 1951, the city had a population of only 30000 people, whereas in 2020 the number has risen to One Million (showing in the latest data) the data itself shows the high population growth within the city in the last seventy years.

Geographically Siliguri is situated not far from the Himalayan margin or to be precise, the city is in the Sub-Himalayan region of West Bengal and endowed with an intensive network of river system. Most of the rivers are considered to be highly notorious for their unpredictable nature, letting loose fury of flood and problems of extensive and regular bank erosion, course shifting, renders thousands of people homeless during the rainy season. The majority of rivers of the ***Terai*** and ***Duars*** originates in the Himalayas and entered from a North to North-Westerly direction and flow South to South-Easterly direction. As many of the rivers originates in the same hill, flood often occurs simultaneously in many rivers and consequently, the rivers coalesce to form a single vast sheet of water during unprecedented rainfall in the hills. The lateral gap between the rivers of sub Himalayan part is 3 to 30 k.m.

The River ***Mahananda***, a lifeline of Siliguri City, flows thereby bisecting the city into two halves. Mahananda originates near ***Chimali*** in the ***Mahalidram*** hills near ***Paglajhora***. River ***Balason*** flows in the Western part of the City and meets river ***Mahananda*** near ***Noukaghat***. Another small tributary of River Mahananda is River ***Panchanoi*** which originates under the Kurseong massif & enters from the Northern part of the city & meets Mahananda just upstream of Ram Ghat. River ***Sahu*** originates in the ***Baikunthapur*** range and flows from the Eastern part of the city. River **Fuleswari** and ***Jorapani*** are the two rivers flowing within the city and ***Fuleswari*** meets ***Jorapani*** near NJP and further at the downstream ***Jorapani*** meets river ***Sahu***. In the *Terai* region some of the small rivers originate from the underground flows of disappearing rivers of terai region, ***Fuleswari*** and ***Jorapani*** are the perfect examples of such origin. In the southern part of the city, the combined flow of *Mahananda & Balason* meets the *Tista Canal* at *Fulbari Barrage*.

Problems of the rivers of Siliguri City:

Unplanned growth of the city not only causes different difficulties within the city but also leaves a striking impact on the rivers of the city. The problems are as follows:

1. Illegal encroachment of the river beds and banks of all the major rivers.
2. Unscientific quarrying of the materials of river-beds badly hampers the natural equilibrium.
3. Rapid deforestation in the upper catchments of the river *Mahananda* leads to soil erosion and results in rapid siltation.
4. Landslides in the upper catchment in the river *Mahananda* and *Balason* cause huge debris flow in the river-beds which ultimately hinder the normal flow of the rivers.
5. The rivers of the city are getting ceaselessly polluted due to the linking of untreated sewage water disposal in all the rivers of Siliguri.

Among the above mentioned problems, the last one is a matter of great concern for the health and hygiene of the city. Due to lack of proper planning, natural river system has become a part of the sewage system of the city. Unplanned sewage network causes water-logging problem in many wards even in meagre rainfall. The total sewage system of Siliguri is connected with the rivers ***Mahananda, Fuleswari, Panchanoi, Jorapani*** and ***Sahu*** which accelerates the water pollution and degrades the quality of water of the rivers.

Polluted stretch of river ***Mahananda*** has been identified from ***Siliguri*** to ***Binnaguri***, which is approximately 15 k.m. Pollution sources in the rivers of the city of Siliguri are as follows:

I) About 94 numbers of Municipal sewage are discharged on the left bank of river

Mahananda and 60 numbers on the right through which the untreated municipal sewage restlessly gets into the river.

ii) *River Jorapani* at *Fulbari* and *Fuleshwari* near NJP road carries the municipal sewage of associated municipal wards.

iii) Indiscriminate dumping of Municipal solid waste contributes to the worsening of the river water quality of the city.

To measure the pollution level as well as the quality of the water of the rivers, ***Biological Oxygen Demand*** (BOD) is very significant parameter which measures the amount of oxygen required to remove waste organic matter from water. It is often used in waste water treatment plants, as an index of the degree of organic pollution in water. Another water quality monitor analysis is based on faecal coliform bacteria count. Contamination of this pollutant may cause different water borne diseases like typhoid, fever, hepatitis, gastroenteritis, dysentery and ear infections etc. The average of the BOD data and FC value data is given below in the table based on the upstream & downstream of river *Mahananda* in Siliguri from January, 2017 to December, 2018.

Average BOD (mg/l) of ***Mahananda*** (2017-2018)

Upstream at *Champasari* 2.98 mg/l

The rivers play an important role in the lives of the people here. They provide irrigation, portable water and livelihood in various ways. They account for the rich the bio-diversity of the place. A deep respect for rivers is rooted in our culture. We can all worked together to create awareness amongst ourselves with a goal to maintain and improve the health of our rivers for they are the veins running through the body of our city.

Peace begins with a smile
- Mother Teresa

LEGAL EDUCATION IN SILIGURI AND SURROUNDING AREAS : A LEGACY TO CARRY FORWARD

Dr. Soma Dey Sarkar

The role of law has always been pivotal in conditioning our society and so is legal education. Legal education, legal profession, law and society have been entwined to each other; so much so that they have become the hallmark of any developed society. To quote Prof. S. P. Sathe, distinguished academician and renowned legal luminary, "Legal education is essentially a multi-disciplined, multi-purpose education which can develop the human resources and idealism needed to strengthen the legal system. A lawyer, a product of such education, would be able to contribute to national development and social change in a much more constructive manner." (http://www.legalserviceindia.com/legal/article-199-legal-education-system-in-india.html)

The development of legal education and legal profession in Siliguri has a chequered history. The sub-division of Siliguri was established on the banks of Mahananda river in the year 1907 with its two blocks Kharibari and Phasidewa (presently, along with these blocks, there are two other blocks; Matigara and Naxalbari). In 1865, the Terai Region was separated from Purnia and merged with Darjeeling and came to be known as the Terai Estate, the Head Quarter of which was established in Hansqua.Hansqua also became the first seat of court of law for the region. Mr. Harsundar Majumdar along with his assistant Mr. Bhagadutta Chowdhury were the first to handle legal disputes in the region. Later on, Mr. Kali Prasanna Bhattacharjee, Mr. Shashti Charan Mallik and BishnuCharan Das joined the former. However, Hansqua was not conducive to carry on the legal profession as it was surrounded by dense forest and wreaking havoc created by the wild animals in that region. As a result, Siliguri, with its strategic location, started developing fast and was thereby raised to the position of sub-division in 1907. In 1909, the Siliguri Sub-Division Court was established in its present location and thus, a new era commenced for Siliguri.*(Haren Ghosh, ItihaserAloke Siliguri, Souvenir, Siliguri Bar Association, 2009)*

With the establishment of a permanent court of justice in Siliguri, the need to set up an institute for legal education was felt time and again. Siliguri is a gateway to the eastern region of India and is surrounded by three international borders of Bangladesh, Nepal and Bhutan. The

development of Siliguri was only a matter of time due to its strategic location. In no time, Siliguri became a business-hub and became an important place for exchange of ideas. The importance of Siliguri Court increased by leaps and bounds due to the increase in legal disputes that started pouring in from its surrounding areas. In order to cater to the legal needs of the people, a legal institute which can produce legal experts and legal professionals became utmost necessary.This need has been further accentuated with the establishment of the Circuit Bench of the Calcutta High Court in Jalpaiguri. The University Law College which was affiliated to the University of North Bengal in 1974 was upgraded to the status of a Department of Law, North Bengal University in the year 2000 with a separate, distinct and prestigious location and has been catering to this need ever since.

The Department of Law, University of North Bengal has been the torchbearer in imparting legal education not only in North Bengal region but also in the Eastern and North Eastern region of India. This Institution has also the reputation of attracting students from the neighbouring countries like Bangladesh, Bhutan and Nepal. Presently, the Department is imparting 5 year integrated B.A. LL. B. (Hons.) Course (under the CBCS mode). The intake capacity of the Department is 96 students. The admission is made strictly on the basis of merit and marks obtained in the Higher Secondary or any other equivalent and recognised examination. The age bar for admission has also been imposed. It has the pride of imparting Post-graduate course in Law (LL. M.) since 1993 with an intake of 20 students (at present there are 25 seats). The Department has a rich Ph. D programme. It was started in 1999 and since then more than 48 Ph. D degrees have been awarded. Presently there are about 25 scholars engaged in doctoral research under various faculty members under the UGC Regulation, 2016.

This premier institute has unmatched contribution in the development of the legal profession in Siliguri and surrounding areas. The institute has kept up with the changing needs of legal education from organising International and National Seminars, Workshops, Symposiums on critical and crucial issues of public relevance, organising National Moot Court Competitions, publishing Journals and Books, organising Legal Aid Clinics and other activities which have helped in making it a vibrant institution of legal education.

Apart from the Department of Law, the Indian Institute of Legal Education, situated in Dagapur, was established in 2010. Affiliated to the University of North Bengal, this institute of legal education offers a spectrum of courses including Five year integrated courses in B.A. LL.B.

(Hons.), BBA, LL.B (Hons.), B.Com, LL.B. (Hons.) and 3 year LL.B. With only 11 years of its establishment, the institution has already started making its mark in the legal profession.

In the present era of information capitalism, economic liberalization and WTO, legal profession in India has to cater to the needs of a new brand of legal consumer/client namely the foreign companies or collaborations. In the changed scenario, the additional roles that the law professionals play are that of policy planner, business advisor, negotiator among interest groups, experts in articulation and communication of ideas, mediator, lobbyist, law reformer etc. Due to expanding role of law professionals the curriculum should be enriched with all interdisciplinary courses which are must to produce the competent law professionals of 4th generation.

The challenge that lies ahead of the institutions imparting legal education in Siliguri region is to promulgate Legal education which aims at furnishing skills and competence, the basic philosophies and ideologies for creation and maintenance of just society. Instead of imparting merely black letters of law, the institutions must evolve innovative curriculum which focusses on practical applications of law and clinical training of the students. Posing the National Law Schools as examples, infrastructure of seats of legal education in this region must be improved without which academic freedom to think and contribute cannot be ensured. Lastly, a concerted action by the Bar, Bench and Law Teachers is called for to improve and uplift the present standards of legal education in Siliguri and its surrounding areas.

Be faithful in small things because
it is a them that your strength lies.
- Dr. APJ Abdul Kalam

सिलिगुड़ी: जिम्मेदार नागरिक समाज की आवश्यकता

- डॉ. बिनय कुमार पटेल

'सिलिगुड़ी' अर्थात पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, सिलिगुड़ी अर्थात पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग का प्रवेश द्वार, सिलिगुड़ी का मतलब है कस्बाई माहौल से रचा हुआ एक ऐसा शहर जहाँ हर धर्म, हर भाषा, हर प्रांत का व्यक्ति शांति से आपसी भाईचारे के साथ वर्षों से रह रहा है। सिलिगुड़ी शहर का महत्व केवल इन्हीं वजहों से नहीं है। भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से भी यदि देखा जाय तो इस शहर का महत्व बहुत ही ज्यादा है। एक ओर पड़ोसी राज्य के रूप में बिहार, असम और सिक्किम अवस्थित है तो दूसरी ओर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसी राष्ट्रों की सीमाएँ भी या तो पश्चिम बंगाल के इस इलाके को छू कर निकलती हैं या बहुत ही नजदीक हैं। ऐसे में सिलिगुड़ी शहर न केवल पूरे देश को पूर्वोत्तर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बल्कि इसकी साँझासंस्कृति भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसे 'मिनी इंडिया' कहा जा सकता है। चाहे होली हो,लोहड़ी हो या दीपावली, ईद हो या रामनवमी, क्रिसमस हो या दुर्गा पूजा इस शहर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हर उत्सव में हिस्सा लिया है।

आज सिलिगुड़ी विकास की जिस दहलीज पर खड़ा है वहाँ से यह कह सकता है कि आने वाले कुछ समय में यह शहर नगर से महानगर में तब्दील हो जाएगा। वर्त्तमान समय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े होने के कारण पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों से आरंभ करते हुए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लिए सिलिगुड़ी शहर एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन चुका है।'सबार उपोर मानुष सत्तो, ताहार उपोर नाहीं रे' अर्थात सबसे बड़ा सत्य मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना है, इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं है। बांग्ला भाषा के सुविख्यात कवि चंडीदास की ये वो पंक्तियाँ हैं जो पूरे बंगाल के वासियों का पथ-प्रदर्शन भी करती हैं और जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करने की प्रेरणा भी देती हैं। आज कोविड-१९ रूपी महामारी के कारण पूरी मानव-जाति का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। सरकारी स्तर पर इस महामारी से डटकर मुकाबला किया जा रहा है। ऐसे में सिलिगुड़ी शहर एवं इसके आस-पास के इलाकों के लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर तो कई गैर सरकारी संगठनों ने एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गरीब, दीन, दु:खी, बेसहारा, असहाय लोगों की सहायता की है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में भी सिलिगुड़ी शहर एक 'हब' के रूप में तैयार हो चुका है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक के साथ-साथ पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के तमाम संस्थान सिलिगुड़ी एवं इसके आस-पास के इलाकों में उपलब्ध हैं। आशा है कि आने वाले दिनों में और भी संस्थानों को यहाँ खोले जाएंगे।हिंदी भाषियों का भी सिलिगुड़ी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी भाषियों की लंबे समय से चली आ रही माँग को सम्मान देते हुए एक ओर माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा में प्रश्नपत्र की व्यवस्था की गई वहीं बानरहाट में एक हिंदी माध्यम महाविद्यालय की स्थापना की गई और उसके कुछ वर्षों बाद ही सिलिगुड़ी-बागडोगरा इलाके से सटे हुए क्षेत्र हाथिघीसा में 'बिरसा मुंडा हिंदी माध्यम महाविद्यालय' की स्थापना की गई है।उच्च माध्यमिक के बाद दूर-दराज के बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'घोषपुकुर महाविद्यालय' की स्थापना की गई जिससे उस इलाके के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम दूरी तय करनी पड़ रही है। इसी सिलिगुड़ी इलाके में मौजूद कई हिंदी माध्यम

के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को आधारभूत संरचना के विकास के लिए आर्थिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा सहयोग किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए बेहतर भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों, मंत्रालयों द्वारा आर्थिक अनुदान राशि भी दी गई है। युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा स्कूलों, महाविद्यालयों में मिनी इंडोर स्टेडियम, खेल-कूद के लिए मैदान निर्माण, आधुनिक व्यायाम शाला(मल्टी जीम) का निर्माण करवाया जा रहा है। उच्च से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में विद्यार्थियों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े इसके लिए कन्या श्री, स्वामी विवेकानन्द छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' की व्यवस्था की है जिसके माध्यम से बेहतर से बेहतर शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी बैंकों से १० लाख रूपये तक का ऋण सामान्य से ब्याज दर पर ले सकेंगे। राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ हर जरूरतमंद विद्यार्थी को मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संस्थान में एक नॉडल अफसर रखा गया है एवं हर जिले में भी एक जिला नॉडल अफसर की नियुक्ति की गई है।पहले पूरे उत्तर बंगाल में केवल एक विश्वविद्यालय मौजूद था जिसके कारण कई विद्यार्थी स्नातकोत्तर की शिक्षा पाने से वंचित रह जाते थे।वर्त्तमान सरकारने हर जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो, इसे सुनिश्चित किया है। आज कूचबिहार, अलिपुरद्वार, मालदा, रायगंज, जलपाईगुड़ी (उत्तर बंग विश्वविद्यालय के द्वितीय कैंपस के रूप में) विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। वहीं बालुरघाट एवं दार्जिलिंग में नये विश्वविद्यालयों का काम द्रुत गति से चल रहा है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की वजह से इन जिलों के बच्चों को अपने ही जिले में मौजूदविश्वविद्यालय में अध्ययन का मौका मिल पा रहा है। वहीं सिलिगुड़ी के बच्चों को अपने ही शहर में मौजूद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर कर पाने की सुविधा ज्यादा मात्रा में मिल रही है।आज सिलिगुड़ी के युवाओं ने केवल शिक्षा, शोध के स्तर पर ही नहीं बल्कि खेल-कूद के स्तर पर भी सिलिगुड़ी का नाम रोशन किया है।

पश्चिम बंगाल की एकसांस्कृतिक परंपरा का लंबा और विशाल इतिहास रहा है। सिलिगुड़ी ने आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी संभाल कर रखा है। केवल धरोहर को संभाल कर ही नहीं रखा बल्किउसके साथ-साथ संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास करने का प्रयास भी किया है। अलग-अलग भाषा-भाषी,अलग-अलग जाति और संप्रदाय के लोगों को एक ही मंच पर लाकर सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए शांति और समृद्धि की नई इबारत गढ़ी है। चाहे रवीन्द्र जयंति हो या प्रेमचंद जयंति या फिर भानुभक्त जयंति हो, या वीर बिरसा मुंडा जयंति, सिलिगुड़ी वासियों ने हर समुदाय की भावनाओं को समुचित सम्मान दिया है और सांस्कृतिक धरातल पर सबके बीच समानता का भाव विकसित किया है। अलग-अलग समुदाय अपना समुचित विकास कर सकें, अपनी कला, संस्कृति और धरोहर को संरक्षित एवं सुरक्षित रख सकें इसके लिए अलग-अलग समुदायों के विकास के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है।

परंतु कुछ वजहें हैंजो चिंतित करती हैं। कुछ सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं जो समाज को टुकड़ों में बाँटकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकना चाहती हैं। एक बार बंगाल को विभाजित करने का कुत्सित प्रयास अंग्रेजों ने किया था। आज फिर बंगाल को विभाजित करने का कुत्सित प्रयास इन सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। तरह-तरह के प्रपंच रचकर, लोगों की भावनाओं को भड़काकर ये सांप्रदायिक शक्तियाँ लगातार सामाजिक समरसता, शांति और सौहार्द की भावना को येन-केन-प्रकारेण छिन्न-भिन्न करना चाहती हैं। ऐसे में चिंता इस बात की होती है कि क्या फिर एक बार बंगाल को विभाजन का दंश को भोगना पड़ेगा ? क्या हमारा आपसी भाईचारा समाप्त हो जाएगा ? क्या ये सांप्रदायिक शक्तियाँ अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगी ?

मेरा दृढ़ विश्वास है कि बंगाल की जनता की तरह ही सिलिगुड़ी की जनता भी इन सांप्रदायिक शक्तियों को कामयाब नहीं

होने देगी। उन सभी सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा रचे जा रहे कुचक्रों को भेदकर सिलिगुड़ी और उत्तर बंगाल की जनता उन्हें माकूल जवाब देगी। बंगाल की जनता इन आधुनिक अंग्रेजों को पहचानेगी और उनके मंसूबों को नेस्तोनाबूद कर देगी।

सिलिगुड़ी शहर को जरूरत है जिम्मेदार नागरीकों की। किसी भी देश, राज्य या शहर का प्रशासन अकेले अपने दम पर सारी व्यवस्थाओं को तब तक चुस्त-दुरुस्त नहीं रख सकती जब तक उस देश, राज्य या शहर के निवासी स्वयं अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को भलिभाँति नहीं निभाते। हमारा पड़ोसी राज्य सिक्किम इसका जीता-जागता प्रमाण है। जितनी जिम्मेदारी के साथ सिक्किम का प्रशासन वहाँ की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखता है उतनी ही जिम्मेदारी के साथ सिक्किम राज्य के निवासी भी प्रशासन का साथ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में भी देते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने शहर को साफ, स्वच्छ और चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करनी होगी। भारत का संविधान भी नागरिकों के अधिकार के साथ-साथ उसके कर्त्तव्यों की बात कहता है। एक क्षण के लिए ठहरकर हमें भी सोचने की आवश्यकता है कि एक सचेत नागरिक के रूप में हम जितना अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं क्या उतना ही हम अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिए भी तत्पर हैं ? क्या हम अपने घरों का कचड़ा प्रशासन द्वारा निर्धारित जगहों पर ही रख आते हैं या इधर-उधर जहाँ मन हो वहीं फेंक देते हैं ? क्या सड़क पर चलते हुए हम इधर-उधर थूकते हैं या नहीं ? चिप्स-बिस्किट इत्यादि के खोल हम कहाँ फेंकते हैं ? क्या सड़क पर वाहन चलाते हुए हम यातायात नियमों का पालन करते हैं ? क्या कहीं पीने का पानी यूँ ही बहा जा रहा है तो थोड़ा रुक कर हम नल बंद करते हैं ? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खुद से पूछने चाहिए।

अक्सर देखा गया है कि ऐसे समय पर हम अपनी जेब से फोन निकालते हैं, तस्वीरें लेते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। यदि बेहतर सुविधाएँ हम चाहते हैं तो हमें जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। वर्त्तमान महामारी के दौर में भी कई लोग हैं जो बिना मास्क लगाए इधर-उधर घूमते नजर आ जाते हैं। प्रशासन तो हर संभव तरीके से लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहा है लेकिन क्या हम जिम्मेदार नागरिक की तरह उस अपील पर अमल कर रहे हैं ? हर वर्ष 'डेंगू' की वजह से हमारे शहर में समस्या उत्पन्न होती है। प्रशासन हर बार नागरिकों को बारिश का मौसम आने से पहले ही सचेत करना आरंभ कर देती है लेकिन क्या हम सचेत नागरिकों की तरह प्रशासन द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल करते हैं ? लगातार सिलिगुड़ी का तापमान बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा दूषित शहरों की सूची में भी शीर्ष १० शहरों में इसका नाम आ चुका है क्या इसके बावजूद हमने कुछ प्रयास किए या लगातार हम इसे और दूषित बनाते रहे ? क्या हर बात के लिए हम प्रशासन को ही कोसते रहेंगे ? क्या हर काम के लिए प्रशासन की ओर ही टकटकी बाँधे हम देखते रहेंगे ? सड़क टूटी-फूटी हो तो भी हम प्रशासन को ही कोसते हैं और बेहतर सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाने की वजह से हुई दुर्घटना के लिए भी हम प्रशासन को ही कटघरे में ला खड़ा करते हैं। वक्त आ गया है कि जितना सचेत हम अपने अधिकारों के लिए हैंउतना ही सचेत हम अपने कर्त्तव्यों को लेकर भी हों। तभी हम एक बेहतर समाज, बेहतर परिवेश और बेहतर भविष्य अपनी आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे।

****

If you fail, never give up because FAIL means 'First Attempts in Learning'
- APJ Abdul Kalam

उत्तर बंगाल में हिंदी : बेहतर भविष्य की ओर

डॉ. अजय कुमार साव

एक राष्ट्र और एक भाषा की परिकल्पना भारत की संवैधानिक संरचना में भले ही संभव नहीं हो पाई, लेकिन विश्व बाजार की रणनीति ने भारत के लिए एक बाजार और एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी को ही सबसे अधिक महत्व देकर यह साबित कर दिया कि हिंदी वर्तमान बाजार की एकमात्र ऐसी भाषा है। भाषा -संस्कृति की दृष्टि से भारत की विविधता को उसके लघु संस्करण के रूप में यदि देखना हो, तो उत्तर बंगाल जैसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिलेगा। भारत में उत्तर बंगाल भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भारत जैसी विविधता धारण किए हुए है। ऐसी स्थिति में उत्तर बंगाल मैं आम नागरिकों की दिनचर्या में एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी ही सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली भाषा बनी हुई है, तो यह आश्चर्य का विषय कम और हिंदी भाषा के लिए राष्ट्रीय महत्व का उदाहरण ज्यादा है। नेपाली, आदिवासी, राजवंशी, बंगाली हिंदी भाषी उत्तर बंगाल मैं सहज ही देखें और सुने जाते हैं। एक बार स्मरण करें कि उनकी दिनचर्या में कौन-सी भाषा सबसे अधिक इस्तेमाल की दृष्टि से सहज और सुलभ है? हम पाएंगे कि हिंदी के अलावा और कोई अन्य भाषा नहीं है। उत्तर बंगाल की भौगोलिक संरचना में भाषा-संस्कृति के विविधता को समेकित करने में हिंदी भाषा और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है और क्योंकि आज भाषा सिर्फ भावना का विषय नहीं रह गई है, बल्कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के ऐतिहासिक परिणाम के रूप में शक्ल धारण कर रही है। उसके संदर्भ नए-नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं, तब सरकार द्वारा परिकल्पित योजनाओं के प्रति हमें अवश्य ही सचेत और विवेकपूर्णअपेक्षाओं को निर्मित करना होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार के बीते ४०-४५ वर्षों के इतिहास को ही लें, तो वर्तमान ममता सरकार का शासन काल उत्तर बंगाल के भाषाईपरिदृश्य के लिए एक नया और जरूरी इतिहास रचने के कारण हिंदी भाषा के लिए एक समृद्ध भविष्य का दौर साबित होगा। उत्तर बंगाल में व्यवसाय की दृष्टि से हिंदी एक कॉमनलैंग्वेज है, तो शिक्षा की दृष्टि से भी विशेषकर तराई डुआर्स के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर भविष्य के दिशा में हिंदी भाषा ही कर्णधार समान दिख रही है। इस दिशा में हिंदी माध्यम में महाविद्यालय की स्थापना ऐतिहासिक परिपेक्ष में हिंदी भाषा के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि है और इस उपलब्धि के पीछे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की भाषाई संवेदना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सच है कि अभी हिंदी भाषा के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन यह भी उतना ही आश्चर्य और सुखद विषय है कि इस सरकार के शासनकाल में हिंदी का इतिहास सुंदर भविष्य की ओर प्रस्थान कर चुका है। यह महज सरकार विशेष के प्रति प्रशंसा का विषय नहीं है, बल्कि उत्तर बंगाल की भौगोलिक संरचना में भाषाई विविधता के बीच एक जरूरी संपर्क माध्यम को प्राप्त करने का गौरव बोध है।

राज्य स्तर पर हिंदी भाषा संबंधी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन लाए गए हैं, उनमें से अधिकांश का प्रेरणा स्रोत उत्तर बंगाल का यही क्षेत्र रहा है। हिंदी माध्यम में प्रश्न पत्र की मांग उठाने का मसला हो या फिर आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम भाषा बनाने की अनिवार्यता, इन सबके पीछे उत्तर बंगाल के शिक्षक समाज एवं बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों की सराहनीय भूमिका रही है।

विशेषकर उत्तर बंगाल के शैक्षणिक परिवेश को सामने रखकर बात करें, तो विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए हिंदी को माध्यम भाषा बनाए जाने की नितांत जरूरत है और हम इस दिशा में सरकारी परियोजनाओं की अपेक्षा करते हैं| ऐसा नहीं कि सामान्य मंचों पर सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में सुगबुगाहट है, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भले ही सीमित दायरे में, लेकिन इसकी चेष्टा भी की जाती रही है। इतना अवश्य कहूंगा कि ममता सरकार द्वारा हिंदी भाषा के प्रति अपनाई गई संवेदना और इच्छा शक्ति को पदाधिकारियों की सक्रिय इच्छा शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है और इस कारण हिंदी को माध्यम भाषा बनाने की दिशा में जो समस्या सामने दिखती है, उसे समाधान की और ले चलने की जगह इसे बहुत बड़ी समस्या के रूप में रख दिए जाने की एक नियति घटित हो रही है। हिंदी भाषी विद्यार्थी और उसका समाज इस दिशा में आशान्वित है कि नेपाली भाषी विद्यार्थियों एवं समाज के लिए जिस तरह से नेपाली भाषा में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है, ठीक उसी तरह से आने वाले दिनों में अवश्य ही सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी प्रावधानों में हिंदी को माध्यम भाषा का दर्जा अवश्य ही प्राप्त होगा।

यह सच है कि लगभग ५०% विद्यार्थी यदि हिंदी माध्यम में उत्तर पुस्तिका लिखने लग जाएं, तो इसके मूल्यांकन की मूलभूत संरचना का अभाव दिखेगा, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि उत्तर बंगाल के इस क्षेत्र के ५०% विद्यार्थी सिर्फ माध्यम भाषा की चुनौतियों के कारण अपने बेहतर भविष्य से भी चूक रहे हैं। समस्याओं के समाधान की दिशा में समस्या को बड़ी समस्या बताकर पल्ला झाड़ लेना पदाधिकारियों के लिए एक आसान रास्ता है, लेकिन इसी रास्ते में ममता सरकार द्वारा अपनाई गई हिंदी भाषी समाज और भाषा के प्रति संवेदना के फलितार्थ होने में नामालूम तरीके से चुनौती भी खड़ी हो जा रही है। माना यह जाता है कि सरकार यदि, अवश्य ही योजना पूरी होगी, भले ही कुछ समय लगे, लेकिन यदि शिक्षा तंत्र में कहीं किसी तरह की इच्छा शक्ति का असंतुलन दिखे, तब योजनाएं विडंबनाओं का शिकार हो जाती हैं। आश्वस्त हूं की शैक्षणिक परिवेश में उच्च शिक्षा के लिए हिंदी को माध्यम भाषा का दर्जा मिलने में आई चुनौतियां अभी तक पदाधिकारियों के लिए चिंता का विषय नहीं बन पाई हैं, जबकि सरकार पूरी संवेदना के साथ हिंदी भाषा के प्रति श्रद्धानत है।

आज उत्तर बंगाल के डुआर्स-तराई क्षेत्र के लिए हिंदी भाषा महज एक भावनात्मक जरूरत नहीं है, बल्कि शिक्षा जगत के भविष्य को तय करने के लिए एक जरूरी संसाधन के समान है। यह संसाधन सरकार की संवेदना से आपूरित नीतियों का सुपरिणाम साबित होगा। दो हिंदी माध्यम के महाविद्यालयों का स्थापित किया जाना हमें अवश्य ही आश्वस्त करता है, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इन संस्थानों के द्वारा सामाजिक पटल पर हिंदी भाषा और संस्कृति को लेकर ऐसी कोई सक्रियता नहीं दिख रही है, जिससे सरकार की हिंदी भाषा संबंधी संवेदनशील परियोजना के लिए जरूरी जागरूकता

संभव हो पाए। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि शिक्षण संस्थान का दायित्व महज एक पाठ्यक्रम को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि बेहतर समाज और उसके वर्तमान-भविष्य के निर्माण के लिए इन संस्थानों की भी जरूरी भूमिकाएं रहती हैं। यदि शिक्षक और विद्यार्थी समाज की राजनीतिक भूमिका सुनिश्चित रहती ही है, तो फिर समाज के लिए भाषा और संस्कृति को लेकर उनकी जवाबदेही वे स्वयं यदि तय नहीं करेंगे, तो अकेली सरकार इस दिशा में भाषाईवैविध्य के बीच हिंदी भाषा को उसका प्राप्य गंतव्य उपलब्ध नहीं करा पाएगी। इसलिए हिंदी भाषी शिक्षण संस्थान विशेषकर हिंदी माध्यम के सर्वोच्च संस्थान इस दिशा में अवश्य ही सक्रिय रहें। बाजार अपनी सफलता के लिए जिस तरह भाषा संबंधी नीतियों को लेकर सदा प्रगतिमूलक रणनीति बनाता रहता है, हिंदी भाषी शिक्षक-विद्यार्थी समाज इस दिशा मैं अपनी जवाबदेही के तहत जरूरी योजनाओं पर विचार करने की शक्ति जुटाने में कहीं ना कहीं फिसल जा रहा है। इसका परिणाम है कि समस्या का समाधानमूलकप्रतिप्रतिपादन नहीं हो पाता है, बल्कि छोटी समस्या को बड़ी समस्या बनाकर रख दिया जाता है। ऐसे में वर्तमान सरकार की हिंदी भाषा के प्रति संवेदना कहीं ना कहीं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के बावजूद प्रतिफलित होने में चूक रही है।

अपेक्षा इतनी ही है कि वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार की भाषाई संवेदना के तहत हिंदी के प्रति जो नीतिगत मान्यताएं हैं, उस के आलोक में उत्तर बंगाल को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षक एवं विद्यार्थी समाज आगे बढ़े और जमीनी हकीकत के साथ-साथ जरूरी समाधान की संभावनाओं को संभव बनाने की दिशा में पहल करें। हिंदीभषाकेप्रति संवेदनशील सरकार के साथ हिंदी भाषी शिक्षक-विद्यार्थी समाज भी संवेदनशील बने। सरकारा के प्रति पूरी आस्था रखे| उत्तr बग़ाल को हिंदीअकादमी एक केंद्र बनाया जाना ममता सरकार कीहिंदीभाषा और समाज्केप्रति गहरी एवं सक्रिय संवेदना की पहचान है।

Try not to become a man of success.
Rather become a man of value.
- Albert Einstein

सिलगढी कलेजको नेपाली विभाग –
अतीतदेखि वर्तमानसम्म

डा. राजकुमारी दाहाल

दार्जिलिङ जिल्लाको सिलगढी महकुमामा स्थापित सिलगढी कलेज यस क्षत्रेको सबैभन्दा पुरानो एउटा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान हो | भारत स्वाधीन भएको तीन वर्षपछि सन् १९५० सालमा स्थापित यस कलेजले सिलगढी लगायत जलपाइगढी जिल्ला र डुवर्स क्षेत्रका विद्यार्थीहरूमा शिक्षाको ज्योति फिजाँउने काम गरेको थियो | प्रथमत: कतिपय विषयहरूबाट शुरू भएको यस शिक्षा-मन्दिरमा आज 'अनर्स' र 'जेनेरल कोर्स' मिलाएर २६ वटा विषय पढने सुविधा रहेको छ | यहाँ नेपाली, बङ्गला , हिन्दी, अङ्ग्रेजी, संस्कृत गरेर ५ वटा भाषा साहित्यको अध्यापन गराइन्छ | यस आलेखको मुख्य विषय हो – सिलगढी कलेज अन्तर्गत नेपाली विभागको इतिहास| पचासको दसकमा शुरू भएको यस कलेजमा सुरूका केही वर्षसम्म अनिवार्य नेपाली (Compulsory Nepali) विषय पढ्ने २/४ जना विद्यार्थीहरू मात्र भएकाले यसलाई स्व अध्ययनको विषय (self taught subject) मानिन्थ्यो | ६०को दसकको अन्ततिर अधिवक्ता नरबहादुर खडकाले सिलगढी कलेज अफ कमर्सका साथै सिलगढी कलेजमा अनिवार्य नेपाली (Compulsory Nepali) विषयमा स्वच्छोले (voluntarily) अध्यापन कार्य गरेको थाहा लागेको छ | उनीपछि लक्ष्मीकान्त शर्मा (उत्तरबङ्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक), मोहनप्रसाद दाहाल (उत्तरबङ्ग विश्वविद्यालयका रिसर्च स्कलर), नरेन्द्रप्रसाद नेपाल (उत्तरबङ्ग विश्वविद्यालयका एम. ए.) आदिले यस कार्यलाई निरन्तरता दिए | त्यससमयसम्म सिलगढी कलेजमा अनिवार्य नेपाली विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङख्या २०/२५ जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ | सन् १९८१ मा सिलगढी कलेजले ऐच्छिक नेपाली (Elective Nepali) विषय पढाउने अनुमति उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको जानकारी पाइन्छ, तर कुनै स्थायी शिक्षकको नियुक्ति नभएसम्मलाई सिलगढी कलेजका तत्कालीन प्राचार्य डा. शीताङ्सु भूषण दास (कार्यकाल ०३.१२.१९६४ देखि ३१.०१.१९८२ सम्म) को अनुरोध र लिखित नियुक्ति पत्रको आधारमा प्रा. नरेन्द्रप्रसाद नेपालले सन्१९८४ सम्म सिलगढी कलेज अफ कमर्सका साथै सिलगढी कलेजमा अध्यापन कार्य गरे | सिलगढी कलेजमा ऐच्छिक नेपाली लिएर पढ्ने पहिलो सत्रमा सनकुमारी यल्मो, निता खनाल र सुशिला खवास गरेर तीनजना मात्र कन्या विद्यार्थीहरू थिए | सन १९८५ मा पहिलो स्थायी प्राध्यापकको रूपमा श्री गोकुल सिन्हाको नियुक्ति भयो | उनी एकलैले केही वर्ष विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरेपछि निता तामाङ अस्थायी प्राध्यापिकाको रूपमा

कार्यरत हुन्छिन् | स्थायी प्राध्यापकको नियुक्ति भएपछि अनिवार्य नेपाली अनि ऐच्छिक नेपाली विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइन्छ | त्यसपछि सिलगढी कलेजमा नेपाली विषयमा अनर्सको अध्ययन प्रारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेर विद्यार्थीवर्गसाथै शिक्षाविद्, साहित्यिक, सामाजिक सङ्घ-संस्था आदिले विभिन्न सकारात्मक कार्यहरू गरेका थिए | नेपाली भाषा पश्चिम बङ्गालको एउटा राज्य भाषा हो अनि साहित्य अकादमी दिल्लीद्वारा मान्यताप्राप्त भाषा हो | नेपाली भाषा २० अगस्त १९९२ का दिन भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त भएपछि त सिलगढी कलेजमा नेपाली विषयमा अनर्सको अध्ययन प्रारम्भ गर्नुपर्ने विषयले जोड पक्रियो | यस महत् कार्यसँग सम्बन्धित सबैमा अझ उर्जा थपियो | सिलगढी कलेजमा चल्तीवर्षको शैक्षिक सत्रदेखि नै नेपाली अनर्स अध्यापन

सुरू गरिनु पर्छ भन्ने दाबी राखेर १३ फरवरी १९९३को दिन भारतको छात्र फेडरेसनको पक्षमा सिलगढी कलेज युनिट कमिटिका सचिवले दुइसय उन्नाइस (२१९) जना विद्यार्थीहरूले नाम, कक्षा, क्रमसङ्ख्या र हस्ताक्षर गरेको एउटा ज्ञापन – पत्र सिलगढी कलेजका प्राचार्य समक्ष पेश गरियो अनि यसका प्रतिलिपिहरू सिलगढी कलेजको व्यवस्थापन समितिका सचिव र उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयका उपकुलपति समक्ष पठाइएको थियो | विद्यार्थीहरूको यस प्रयासलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा समर्थन गर्दै ‘अखिल भारतीय नेपाली भाषा संघर्ष समिति’, सिलगढीका ‘नेपाली साहित्य प्रचार समिति’, ‘देवकोटा सङ्घ’ , दार्जिलिङको ‘नेपाली साहित्य सम्मेलन’ जस्ता कतिपय प्रतिष्ठित साहित्यिक - सामाजिक

संस्थाहरुले पनि सिलगढी कलेजको व्यवस्थापन समितिलाई ज्ञापन – पत्र दिएका थिए | त्यसै वर्ष (१९९३) सिलगढीमा आयोजित भव्य भानु जयन्ती समारोहको अध्यक्षता गर्दै उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय, नेपाली विभागका विभागाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकान्त शर्माले आफ्नो अध्यक्षीय भाषणमा सिलगढी कलेजमा नेपाली अनर्सको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नु भयो | यसरी विद्यार्थीवर्गसाथै शिक्षाविद्, साहित्यिक, सामाजिक सङ्घ- संस्था आदिले लगातार लागिपरेर अन्त: सन् १९९५-९६ को शैक्षिक सत्र देखि नेपाली\ अनर्सको पठन पाठन शुरू भयो | त्यससमय सिलगढी कलेजका प्राचार्य श्री अरविन्द बासु (कार्यकाल ०३. ०६.१९८६ देखि ३१.०१.९९७ सम्म) थिए | सन् १९९७ को फरवरी महिनामा राजकुमारी दाहाल (यस आलेखकी लेखिका) त्यसपछि सन् १९९७ को जुन महिनामा श्री तेजमान बराइली, सन् २००१ को जुन महिनामा श्री पुष्कर पराजुली, सन् २००८ को जुलाई महिनामा श्री

दिनेश शर्मा स्थायी पदमा नियुक्त भएर आएका हुन् | हालमा सिलगढी महाविद्यालयको नेपाली विभागमा तीनजना स्थायी र दुइजना आंशिक स्थायी(SACT) गरेर जम्मा पाँचजना प्राध्यपक/प्राध्यपिका नियुक्त छन् | यस कलेजमा सुरूदेखि आजसम्म स्वेच्छासेवी रूपमा, अवैतनिक र आंशिक स्थायी रूपमा कार्यरत प्राध्यापक / प्राध्यापिकाहरूको सूचि यस्तो रहेको छ – श्रीमती नीता तामाङ, श्री डम्बर बहादुर थापा , श्री मेधनाथ छेत्री (हाल सोनादा डिग्री कलेजमा कार्यरत), श्री दिलकुमार प्रधान (हाल वीरपाडा कलेजमा कार्यरत), , श्री नवीन पौड्याल, (हाल पेदोङ

सरकारी कलेजमा कार्यरत), श्रीमती पार्वती देवान हाल (दिल्ली पब्लिक स्कुलमा कार्यरत), श्री पुष्कर पराजुली (हाल उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयमा कार्यरत), श्री दिनेश शर्मा,(हाल सिलगढी कलेजमा कार्यरत), श्रीमती गीता देवान, (हाल सिलगढी कलेजमा कार्यरत), श्री बिरेन मगर (हाल सिलगढी कलेजमा कार्यरत) | २०१८- १९ को शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित छनौटमा आधारित क्रेडिट प्रणाली (Choice Based Credit System) लागु भएपछि सिलगढी कलेजको नेपाली विभागमा नेपाली अनर्स, नेपाली ऐच्छिक (Programme) अनि सामान्य अन्तर्विषयमूलक नेपाली ऐच्छिक (Generic Elective) को पठन पाठन हुन्छ | पाठ्यचर्यादेखि बाहेक नेपाली विभागमा भानु जयन्ती, नेपाली भाषा मान्यता दिवस, शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (Faculty Exchange Programme) सांस्कृतिक कार्यक्रम,पत्र- पत्रिका प्रकाशन, संगोष्ठीहरूको आयोजना आदि गरिन्छ | नेपाली विभागका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा प्रकाशित भएका पुस्तक र पत्र- पत्रिकाहरू यसप्रकारका छन् –

१. निश्चय – अङ्क १, प्रधान सम्पादक - प्रकाश विप्लव, सन् २००१ |

२. निश्चय – अङ्क २, , प्रधान सम्पादिका - रूपा लिम्बू,सन् २००८ |

३. युगीन स्रष्टाका स्वरहरू –(कविता सङ्ग्रह), सम्पादक - दुष्यन्त रामुदामु, सन् २००८ |.

४. गजल महक - (लीलाबहादुर छेत्री,बलराम सापकोटा,बुद्ध राई ,दोस्रो वर्ष नेपाली अनर्सका विद्यार्थीहरू रचित गजल सङ्ग्रह) प्रकाशक - प्रा. तेजमान बराइली, सन् २००९ |

५. भानु द्विशत जन्मवार्षिकी स्मारिका- सम्पादक मण्डल- मनिष कानु र अन्य, सन् २०१४ |

६. निश्चय – अङ्क ३,. , प्रधान सम्पादक - इन्द्रमान सुब्बा, सन् २०१६-१७ |

७. सृजना (वार्षिक भित्ते पत्रिका) सन् २०१८ देखि लगातार) |

यसरी सिलगढी कलेजमा सन्१९९५-९६को शैक्षिक सत्रदेखी सुरू भएको नेपाली अनर्सको अध्यापनले २०२०-२१ को शैक्षिक सत्रमा २५वर्ष (रजत जयन्ती) पूर्ण गरिसकेको छ | वर्तमान सिलगढी कलेजका प्राचार्य डा. सुजीत घोष हुनुहुन्छ | सिलगढी कलेज नेपाली विभागबाट पश्चिम बङ्गाल राज्य बाहेक सिक्किम राज्य, असम राज्यका विद्यार्थीहरू अनि हाम्रा छिमेकी देश नेपाल, भुटानका विद्यार्थीहरूले पनि सफलतापूर्वक अध्ययन समाप्त गरेर आफ्नो कर्मक्षेत्रमा अग्रसर बनेका छन् | यस विभागका भूतपूर्व विद्यार्थीहरू उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालय, सरकारी ,गैरसरकारी विद्यालय , प्रशासनिक क्षेत्र, ,जनसञ्चार माध्यम , सैन्य-सेवा , व्यङ्क-सेवा , खेल-जगत, साहित्य र सांस्कृतिक जगत आदि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेर जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समाजमा दृष्टान्त बनेका छन्|

FIRST MEMBERS OF UNION BOARD
(SILIGURI MUNICIPALITY)
(24.05.1949 TO 05.05.1952)

Year, Date & Period	Members	Chairman	Vice-Chairman
24.05.1949 to 05.05.1952	Sachindra Mohan Guha, SDO	Sachindra Mohan Guha, SDO, Chairman	Birendra Nath Roy Sarkar
	Bimal Kr. Mukherjee		
	Haripada Majumder		
	Jeorge Mahbert		
	Dr. Gopal Ch. Ghosh		
	Bindeswari Misir		
	Birdendra Nath Roy Sarkar		
	Sarder Karna Bahadur Gurung		
	Rampada Chatterjee		
	Dr. Kshirodenath Chatterjee		
	Digendra Nath Roy Sarkar		
	Manturam Agarwala		
	Pradyut Kr. Bose		
	Abaninath Bhattacharjee		

FIRST MEMBERS OF SILIGURI MUNICIPALITY
(09.08.1958 TO 11.02.1062)

Year, Date & Period	Members	Chairman / Vice-Chairman / Commissioner
09.08.1958 to 11.02.1962	Jagadish Bhattacharya	Chairman
	Panchanan Talukdar	Vice-Chairman
	P.K. Basu	Commissioner
	B. K. Mukherjee	
	A. N. Ghosh	
	B. K. Ghosh	
	K. N. Sen	
	J. C. Ghosh	
	K. C. Das	
	Dr. A. N. Chaki	
	Dr. A. N. Sanyal	
	J. K. Dutta	
	S. N. Sarkar	
	B. B. Gurung	

FIRST ELECTED MEMBERS OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (1994 TO 1999)

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Alderman / Chairman / Councillor
	Prof Bikash Ghosh	Mayor
	Ujjwal Chowdhury	Deputy Mayor
	Partha Sarathi Das	Chairman
	Mukul Sengupta	MMIC
	Santi Chakraborty	MMIC
	Kiran Kumar Anand	MMIC
	Paritosh Das	MMIC
	Dilip Roy	MMIC
	Golap Roy	MMIC
	Munsi Nurul Islam	Alderman
	Debika Chhetri	Alderman
	Mangturam Choudhury	Alderman
	Jogeswar Yadav	Councillor
	Manindra Chakraborty	Councillor
	Jyostna Agarwal	Councillor
	Ashok Goenka	Councillor
	Ram Kumar Agarwala	Councillor
	Nantu Paul	Councillor
	Ram Kumar Agarwalla	Councillor
	Hari Sadhan Ghosh	Councillor
	Gouri Dutta	Councillor
	Goutam Deb	Councillor
	Bhupendra Nath Aditya	Councillor
	Beena De	Councillor
	Manas Ghosh	Councillor
	Krishna Chandra Paul	Councillor
	Pratul Chakraborty	Councillor
	Sushil Kumar Roy	Councillor
	Makhan Chandra Ghosh	Councillor
	Sanjib Sarkar	Councillor
	Saradindu Chakraborty	Councillor
	Sankar Kar	Councillor
	Pulak Sengupta	Councillor
	Santi Ranjan Guha	Councillor

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Alderman / Chairman / Councillor
	Sri Dulal Kanti Das	Councillor
	Sri Samir Dey	Councillor
	Sri Nikhil Das	Councillor
	Sri Mantu Dey	Councillor
	Prof. Kalidas Chakraborty	Councillor
	Smt. Reba Sarkar	Councillor
	Sri Binay Kumar Bose	Councillor
	Sri Atul Chandra Das	Councillor
	Sri Kshudiram Roy	Councillor
	Sri Dilip 'Singh	Councillor
	Sri Balaram nath	Councillor
	Sri Kartik Murmu	Councillor
	Sri Snigdha Hazra	Councillor

LAST ELECTED MEMBERS OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (2015 TO 2020)

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Alderman / Chairman / Councillor
	Sri Ashok Narayan Bhattacharya	Mayor
	Sri Ram Bhanaj Mahato	Deputy Mayor
	Sri Dilip Singh	Chairman
	Sri Munshi Nurul Islam	MMIC
	Sri Mukul Sengupta	MMIC
	Sri Sharadindu Chakraborty (Joy)	MMIC
	Sri Sankar Ghosh	MMIC
	Sri Kamal Agarwal	MMIC
	Sri Parimal Mitra	MMIC
	Smt. Malai Roy	Councillor
	Smt. Singdha Hazra (Halder)	Borough Chairperson
	Smt. Durga Singh	Councillor
	Sri Pintu Ghosh	Councillor
	Smt. Khusboo Mittal	Councillor
	Pradip Kumar Goyel	Borough Chairman
	Smt. Manjushree Paul (Dola)	Councillor
	Sri Nantu Paul	Councillor
	Sri Manik Dey	Councillor
	Smt. Srabani Dutta	Councillor
	Sri Arabinda Ghosh (Amu)	Councillor
	Sri Sujoy Ghatak (Kala)	Councillor
	Smt. Shukla Deb	Councillor

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Alderman / Chairman / Councillor
	Sri Nikhil Sahani	Borough Chairman
	Smt. Mousumi Hazra	Councillor
	Sri Ranjan Sarkar (Rana)	Leader of the Opposition
	Smt. Swapna Dutta (Das)	Councillor
	Smt. Rinki Das	Councillor
	Sri Krishna Chandra Paul	Councillor
	Smt. Seema Saha	Councillor
	Sri Dipeyan Roy	Councillor
	Sri Prasanta Chakraborty	Councillor
	Smt. Sharmila Das	Councillor
	Sri Swapan Das	Councillor
	Sri Dipa Biswas	Councillor
	Sri Tapas Chatterjee	Councillor
	Sri Asim Saha	Councillor
	Sri Golap Roy	Councillor
	Smt. Chandrani Mandal (Bulti)	Councillor
	Sri Alak Bhakta	Councillor
	Sri Ranjan Sil Sharma	Borough Chairman
	Sri Dulal Dutta	Councillor
	Smt. Reba Sarkar	Councillor
	Sri Satyajit Adhikari (Bhaijaan)	Councillor
	Sri Rabi Roy	Councillor
	Smt. Ragini Singh	Councillor
	Smt. Pritikana Biswas	Councillor
	Smt. Rita Oron	Councillor

PRESENT MEMBERS OF THE BOARD OF ADMINISTRATORS OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (07.05.2021 TO TILL DATE)

Year, Date & Period	Members	Chairman / Members of the Board of Administrators
07.05.2021 to till date	Sri Goutam Deb	[illegible]
	Sri Ranjan Sarkar (Rana)	Member, Board of Administrators
	Sri Alok Chakravorty	Member, Board of Administrators
	Sri Vivek Baid	Member, Board of Administrators